# বাংলা সংবাদ পত্রিকা

ম. আ. আওয়াল সম্পাদিত

ম. আ. আওয়াল সম্পাদিত

# বাংলা সংসদ পত্রিকা

সংকলন পরিষদ

পৃষ্ঠপোষক : অধ্যাপক আবদার রশীদ
অধ্যাপক আলাউদ্দীন আল্ আজাদ
ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক : অধ্যাপক আ. ফ. ম. সিরাজউদ্দৌলা চৌধুরী

সম্পাদক : ম. আ. আওয়াল
সহ-সম্পাদিকা : শিপ্রা রক্ষিত

সদস্য-সদস্যা : মুহম্মদ আবুল কাশেম
বনবিহারী বিশ্বাস
আমাতুল বাতুল নাজমা
আতাউল হাকিম

---

প্রচ্ছদ : মাহবুবুল হক
অঙ্গসজ্জা : দীপক কুমার বড়ুয়া
মুদ্রণ : কোহিনুর ইলেকট্রিক প্রেস
ব্লক : প্যারামাউন্ট প্রসেস, ষ্টার ব্লক
শুভেচ্ছা মূল্য : দু'টাকা

বাংলা সংসদ, চট্টগ্রাম কলেজের পক্ষে মাহবুবুল হক কর্তৃক প্রকাশিত

"বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি-চর্চায় পূর্ব পাকিস্তানের তরুণ ছাত্রসমাজকে হাই সাহেব এতদিন উদ্বুদ্ধ ক'রে এসেছেন প্রত্যক্ষে ও পরোক্ষে, শিক্ষায় ও আদর্শে, বাক্যে ও নীরবতায়। আমাদের সাহিত্যের দীনতা এখনও ঘোচেনি, গবেষণার আবশ্যকতা এখনও ফুরায়নি, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সংকট এখনও কাটেনি, তাদের প্রতি অতর্কিত ও ষড়যন্ত্রমূলক আক্রমণ এখনও বন্ধ হয়নি, এমন এক বিপজ্জনক মুহূর্তে আমরা হাই সাহেবের মতো এক সেনাপতিকে অকালে হারালাম। আমাদের আসন্ন সংগ্রামে নেতৃত্ব দান করবে কে? কে আমাদের পাশে এসে ভাবী সংগ্রামে বুক ঠুকে দাঁড়িয়ে যাবে? সত্যই আমরা আজ ভাগ্যবিড়ম্বিত।"

বাংলা সংসদের পক্ষ থেকে এই সর্বপ্রথম একটি পত্রিকা বেরোচ্ছে। পত্রিকা প্রকাশ করা যে কি দুরূহ কাজ তা' এই পত্রিকা প্রকাশনার ব্যাপারেই লক্ষ্য করেছি। সেই দুরূহ কাজ সমাধা করতে পেরেছে বলে বাংলা সংসদের সংগে জড়িত সকল ছাত্রছাত্রীকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

এই রকম একটি পত্রিকা যদি নিয়মিত প্রকাশ করা সম্ভব হতো, তা' হলে ছাত্রছাত্রীদের ভেতরে যে সাহিত্যিক প্রতিভা রয়েছে তার প্রকাশ-পথ সহজ হতো।

এই পত্রিকাটিতে সাধারণ পাঠক আনন্দ পাবেন কি না জানি না, তবে বিভাগীয় ছাত্রছাত্রীদের যে অশেষ উপকার হবে, সে বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই।

আবদার রশীদ
অধ্যক্ষ, বাংলা বিভাগ
চট্টগ্রাম কলেজ

চট্টগ্রাম কলেজের বাংলা সংসদ গঠিত হয় প্রায় সাত বছর আগে। সংসদ গঠনের ব্যাপারে বাংলা বিভাগের ছাত্রছাত্রী এবং শ্রদ্ধেয় অধ্যাপকবৃন্দ আন্তরিকভাবে সচেষ্ট ছিলেন। সংসদের বিভিন্ন কর্মসূচীর মধ্যে একটি সাহিত্য সঙ্কলন প্রকাশ করার প্রয়োজনীয়তা সকলেই অনুভব করেছিলেন। এ' ব্যাপারে তৎকালীন বিভাগীয় অধ্যক্ষ আলাউদ্দীন আল আজাদ যথার্থ সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন। কিন্তু উচ্চতর শিক্ষার জন্য অসমাপ্ত কাজ রেখে তাঁকে বিদেশে চলে যেতে হয়। পরবর্তীকালে বিভাগীয় অধ্যক্ষ আব্দার রশীদ এবং বিভাগীয় অধ্যাপকদের সহানুভূতি ও উৎসাহের জোরেই সংসদ পত্রিকাটি প্রকাশের সব রকম ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

বাংলা সংসদ গঠনে আমাদের কিছু বক্তব্য ছিল। সাহিত্য ও শিল্পের জগতেও আজ যে অসম্ভব রকম বিপর্যয় নেমে এসেছে তাকে প্রতিরোধ করতে এবং আমাদের বিভাগীয় কর্ম প্রচেষ্টার মাধ্যমে, এই সীমিত পরিধির মধ্যেও একটা ছোটখাটো "লেখার স্কুল" গড়ে উঠুক এ' প্রয়োজনটুকু ছাত্রছাত্রী এবং শিক্ষকবৃন্দ সকলেই অনুভব করেছেন। বাংলা যারা পড়তে আসে তাদের পড়াশুনা কেবলমাত্র অধীত বই-এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাক এটা কারোই কাম্য নয়। তাদেরই স্বকীয়দৃষ্টিভঙ্গী এবং মতামত প্রকাশের মুখপত্র হয়ে প্রকাশিত হল 'বাংলা সংসদ পত্রিকা'। বাংলা বিভাগ ছাড়াও ইংরেজী বিভাগের দু'জন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের দু'জন শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক লেখা দিয়ে আমাদের উৎসাহিত করেছেন।

দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিপর্যয়ের দিনে সাহিত্য, সংস্কৃতিরও একটা সক্রিয় এবং স্বতন্ত্র ভূমিকা আমরা অপরিহার্য বলে মনে করেছি। আমরা বলতে পারি যে 'বাংলা সংসদ পত্রিকা' একটি সামান্য প্রচেষ্টা কিন্তু মূল্যবান পদক্ষেপ; বদ্ধমূল আবর্ত থেকে আলোর প্রগতিতে এগোবার সাহস। সংকলনের একটি বিশিষ্ট দিক হলো সবক'টি রচনাই বিভিন্ন বিষয় ভিত্তিক প্রবন্ধ। লেখক লেখিকারা স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিচার করেছেন বিচিত্র বিষয়কে। গল্প, কবিতা, উপন্যাস ও নাটকের

তুলনায় প্রবন্ধ-সাহিত্যের চর্চা বাংলা সাহিত্যে খুবই বিরল। তাই সংসদের প্রথম প্রকাশিত সঙ্কলনটিতে শুধুমাত্র প্রবন্ধই স্থান পেল।

'বাংলা সংসদ পত্রিকা' সম্পাদনা করতে গিয়ে আমাকে বিভিন্ন অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছে। বিভাগীয় অধ্যক্ষ আবদার রশীদের বিভিন্ন উপদেশ ও তত্ত্বাবধান আমার দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে আমাকে সজাগ করেছে। সেজন্যে তাঁকে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। সম্পাদনা ও প্রকাশনার ক্ষেত্রে সার্বিক সাহায্য ও পরামর্শ পেয়েছি পত্রিকার ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক সিরাজউদ্‌দউলা চৌধুরীর কাছে। অধ্যাপক মমতাজউদ্দীন আহমেদের সহায়তা এবং বিভাগীয় অধ্যাপকবৃন্দের অকুণ্ঠ সহযোগিতা না পেলে সংকলন প্রকাশ করা দুঃসাধ্য হতো।

বাংলা সংসদের সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুল হক, সঙ্কলনের সহ-সম্পাদিকা শিপ্রা রক্ষিতের সক্রিয় ভূমিকা ছাড়া 'বাংলা সংসদ পত্রিকা' প্রকাশ করা সম্ভব হতো না। ইংরেজী বিভাগের শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক সৈয়দ মাহতাবউদ্দীন আহম্মদ ও অধ্যাপক রণজিৎ কুমার চক্রবর্তী এবং বাংলা বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে যে আন্তরিকতা পেয়েছি তার জন্যে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করেও সঙ্কলন সম্পাদনায় কিছু ভুলত্রুটি রয়ে গেল। টাইপের অভাবে অনেক যুক্ত অক্ষরকে বিশ্লিষ্ট অবস্থায় হসন্ত যোগে লেখা হয়েছে। ছাপার সময় টাইপ ভেঙে যাওয়ার যে নিত্যনৈমিত্তিক অঘটন তা থেকেও রক্ষা পাওয়া গেল না। অনিচ্ছাকৃত বিলম্বের ত্রুটির জন্যে সকলের সহানুভূতিশীলতাকে আশ্রয় করছি।

সব শেষে বিগত বছরে গতায়ু তিনজন শিক্ষাবিদ ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, প্রফেসর মুহম্মদ আবদুল হাই এবং অধ্যাপক অজিত কুমার গুহের স্মৃতির প্রতি বাংলা সংসদের তরফ থেকে গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

ম. আ. আওয়াল
সম্পাদক

# বলাকা কাব্যে মৃত্যু মহিমা

ডঃ আহমদ শরীফ

রবীন্দ্রনাথ যে বিদ্রোহী-বিপ্লবী-সংগ্রামী-কবি নজরুল ইসলামের পূর্বসূরী ও বিপ্লবমন্ত্রে দীক্ষাগুরু সে কথা আমরা প্রায়ই ভুলে থাকি। বলাকা কাব্য থেকে এখানে বিপ্লবী সংগ্রামী রবীন্দ্রনাথের পরিচয় তুলে ধরছি।

ইন্দ্রনাথ তাচ্ছিল্যে শ্রীকান্তকে বলেছিল, 'মরতে একদিন ত হবেই ভাই'। নৌকোডুবি হয়ে, গাড়ী চাপা পড়ে, ঝড়ে, বন্যায়, মহামারীর কবলে পড়ে' কত কত অপঘাত অপমৃত্যু হচ্ছে। মরণকে এড়ানো আটকানো যায় না।' মরতেই যদি হবে তা হলে অন্য দশ প্রাণীর মতো অসহায় নিষ্ফল মৃত্যুর জন্যে সভয়ে অপেক্ষা করার চেয়ে স্বেচ্ছায় মহৎ মৃত্যু বরণ করাইতো মানুষের কাজ। সক্রেটিস, যিশু, ব্রুনো এমনি মহৎ মৃত্যুই হাসিমুখে বরণ করেছিলেন। এ মৃত্যু বাঁচবার ও বাঁচাবার জন্যেই। এক প্রাণ দিয়ে লক্ষ কোটি প্রাণের নিরাপত্তা দানই এমন মৃত্যুর লক্ষ্য। প্রয়োজন মতো যে মরতে প্রস্তুত, বাঁচবার অধিকার তারই। সময়মতো যে মরতে জানে সেই বাঁচিয়ে রাখে জগৎ সংসারের মানুষকে, মনুষ্যত্বকে। লক্ষ কোটি মানুষের মধ্যেই সে সগৌরবে সার্থক হয়ে বাঁচে। 'নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই'।

যিশু ক্রুসে বিদ্ধ হয়ে রক্ত দিয়েছিলেন, দিয়েছিলেন প্রাণ। তাঁর রক্ত ধুয়ে-মুছে দিয়েছে কোটি কোটি পাপী তাপী খ্রীষ্টানের পাপ তাপ এবং তাঁর এক প্রাণের বিনিময়ে কোটি কোটি প্রাণ পেয়েছে ত্রাণ। তাই যিশু হলেন মানুষের ত্রাণকর্তা (Saviour) এবং যে ক্রুসে যিশু বিদ্ধ হয়েছিলেন, তা হ'ল মানুষের প্রাণ রক্ষক বর্ম। এমনি করেই মৃত্যুর বিনিময়ে জাগে প্রাণ, বিকাশ পায় জীবন। দুনিয়া ব্যাপী মানুষের অগ্রগতির মূলে রয়েছে বীর মুযাহিদের আত্মদান।

স্বার্থপর লোভী নিজেও শেষ অবধি বাঁচতে পারে না, অন্যকেও বাঁচতে দিতে জানে না। তার লোভ ও আত্মরতি তাকে পরস্বে ও পীড়নে প্ররোচিত করে। লোক-হিতার্থে তাকে ঠেকানোর জন্যেই ত্যাগবীরের প্রয়োজন। যে দেশে, যে সমাজে তেমন লোকের অভাব, সে দেশের ও সে জাতির জীবন যন্ত্রণা কেবলি বাড়ে। ভীরুরা আত্মসংকোচন করে ও পালিয়ে বাঁচতে চায়। আত্মসংকোচন ও পলায়ন নামান্তরে আত্মবিলোপ বই কিছু নয় কেননা ওতে লোভীর লোভ ও দুর্বৃত্তের পীড়ন স্পৃহা বৃদ্ধি পায়। মানুষের জীবনে ও জীবিকায় যেখানে যতটুকু নিরাপত্তা রয়েছে তা তো ঐ নির্ভীক ত্যাগবীরের প্রাণের বিনিময়েই লব্ধ। আত্মদানের এবং প্রয়োজনমতো প্রাণদানে সমর্থ কিছু সংখ্যক মানুষের উপস্থিতিই তো লোভী হিংস্রকে সংযত রেখেছে। দুর্বৃত্তের সম্বল বুদ্ধি ও বাহুবল। এগুলোর সীমা আছে। লোক রক্ষক সংগ্রামীর শক্তির উৎস হচ্ছে সদিচ্ছা ও মনোবল। এ শক্তি তাই অসীম ও অফুরন্ত। ত্রাসের ঝড় বিভীষিকাময় কিন্তু ক্ষণজীবী. ত্রাণের বায়ু মৃদু প্রবাহী কিন্তু স্থায়ী ফলপ্রসূ। দুর্বৃত্ত নামে ঝড়ের বেগে, গতিও তার ঝড়ো। জনে জনে হয় জনতা, তার বেগ বন্যার এবং বন্যা বাঁধ মানে না, জনতার সৃষ্টি রক্তবীজে। কেটে মেরে তাকে নিঃশেষ করা যায় না, কেবলই বাড়ে অসংখ্য ও অজেয় হয়ে বাড়ে। বাহুবলে বলীয়ান দুর্বৃত্ত সিংহচর্মের আবরণে শৃগাল। তাই আত্মপ্রত্যয়ী জনতা যখন রুখে দাঁড়ায় তখন সেই দুর্বৃত্তপীড়ক 'পথ কুক্কুরের মতো সংকোচে সত্রাসে যায় মিশে'—কেননা.

কেহ নাহি সহায় তাহার
মুখে করে আস্ফালন, জানে সে হীনতা
আপনার মনে মনে।

মনোবল আসে ন্যায়নিষ্ঠ ও আত্মপ্রত্যয় থেকে। সদিচ্ছা ও কর্তব্যবুদ্ধিই মানুষকে করে নির্ভীক ও আত্মদানে অনুপ্রাণিত। তেমন মানুষই পা বাড়ায় বিপদের মুখে। এগিয়ে যায় নিশ্চিত মৃত্যুর পথে। কেননা সে জানে পরিণামে জয়ী হয় শহীদেরাই। ভয়-সংশয় দলিত করে জীবনমৃত্যু পায়ের ভৃত্য করে যে প্রথম এগিয়ে যায়, সেই দেশ-জাতি-মানুষের ত্রাণকর্তা। পৌরুষ ও কাপুরুষতার মধ্যে ব্যবধান ঐ এক কদমেরই। ঐ বাড়তি কদমেরই নাম বীরত্ব, আত্মত্যাগ, নেতৃত্ব, মনুষ্যত্ব এবং লোকত্রাণ। জগতে ও জীবনে শক্তির ও সংগ্রামী প্রেরণার উৎস ঐ আগে বাড়ানো কদমটিই। এই বাড়তি কদমের মূলে রয়েছে যে জাগ্রতচিত্ত, সে চিত্ত আগেই জীবনের প্রসাদরূপে গ্রহণ করে--

কাল বৈশাখীর আশীর্বাদ
শ্রাবণ রাত্রির বজ্রনাদ
পথে পথে কণ্টকের অভ্যর্থনা
পথে পথে গুপ্তসর্প গূঢ় ফণা, (৪৫)

সে চিত্ত জানে, পীড়ন হবে যত প্রবল যুক্তি আসবে তত দ্রুত। শিকল পরেই বিকল করতে হয় শিকল। এক প্রাণের বীজ বুনে সৃজন করতে হয় কোটি প্রাণ, বুকের রক্তই হয় রক্তবীজ যা সৃষ্টি করে অসংখ্য অজেয় অমর আত্মা। এমন মানুষের নেতৃত্বেই তো দেশ জাত ও ধর্মরক্ষার জন্যে মানুষ চিরকাল অকাতরে প্রাণ দিয়েছে---মরণোৎসবে উল্লসিত হয়েছে। রক্ত আলোর মদে মাতাল ভোরে তুলেছে বিদ্রোহের ধ্বজা। যারা প্রাণের মমতায় প্রাণটা জিইয়ে রাখার জন্যে সদা সতর্ক থেকেও অকালে অসময়ে অকারণে অঘোরে প্রাণ হারায় আর যারা প্রাণের মূল্য বোঝে তারা দেশ-জাত-মানুষের প্রাণের জন্যে প্রয়োজনের মুহূর্তে প্রাণটি দিয়ে প্রাণের মূল্য প্রমাণ করে এবং ধন্য হয় নিজে—ধন্য করে জগৎ-সংসারকে।

'আমরা চলি সমুখ পানে, কে আমাদের বাঁধবে'?
'দিনে দিনে যখন বঞ্চনা বাড়িয়া উঠে, ফুরায় সত্যের যত পুঁজি' (৩৭), তখন বন্ধন-পীড়ন-দুঃখ-অসম্মান ক্ষুব্ধ তরুণেরা

ভীরুর ভীরুতা পুঞ্জ প্রবলের উদ্ধত অন্যায়
লোভীর নিষ্ঠুর লোভ
বঞ্চিতের নিত্য চিত্ত ক্ষোভ
জাতি অভিমান (৩৭)

দূর করবার জন্যে নেমে পড়ে বন্ধুর পথে। ঝড়ো হাওয়ার মতো ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সমুদ্রের মতো তারা প্রতিবাদের রোল কল্লোল জাগায় তখন বিশ্বজগৎ অবাক হয়ে দেখে আর শোনে

'ঝড়ের মাতন, বিজয় কেতন' নেড়ে,
অট্টহাস্যে আকাশখানা ফেড়ে

এগিয়ে চলেছে তরুণেরা এবং

ঝটিকার কণ্ঠে কণ্ঠে শূন্যে শূন্যে প্রচণ্ড আহ্বান
মরণের গান
উঠেছে ধ্বনিয়া পথে নব জীবনের অভিসারে
ঘোর অন্ধকারে। (৩৭)

প্রপীড়িত আত্মার জর্জরতা ঘুচাবার সঙ্কল্পে-দৃপ্ত নির্ভীক তরুণের কণ্ঠে জেগে উঠে মরণ জয়ী গান:

লাঞ্ছিতেরে কে রে থামায়
ঝাঁপ দিয়েছি অতল পানে
মরণ টানে। (২২)

মরণপণ সংগ্রাম তাদের। তারা জানেই :

'বাধা দিলে বাধবে লড়াই, মরতে হবে'।

রবীন্দ্রনাথ কোন সুখের সম্পদের ও কোন খ্যাতি-ঐশ্বর্যের লোভ দেখিয়ে তরুণদের আহ্বান করেননি। গ্যারিবল্ডীর মতোই তিনি সংগ্রামী-সৈনিকদের ডাক দিয়েছেন দুঃখ-যন্ত্রণা ও মৃত্যুর পথে। তাঁর মতে যে প্রয়োজন মতো মরতে ও মারতে জানে, বাঁচবার ও বাঁচাবার যোগ্যতা রয়েছে তারই। দেশ-জাত-মানুষের হিতার্থে আত্মাহুতি দিতে পারে, সমাজে তেমন তরুণের আবির্ভাব তিনি চিরকালই কামনা করেছেন। তাঁর বিশ্বাস জীবনমৃত্যুকে যে পায়ের ভৃত্য করেনি তেমন মানুষ দিয়ে দেশ-জাত-মানুষের কোন কল্যাণ আসতে পারে না, কেননা, সারা দুনিয়াব্যাপী পাশব শক্তিরই দানবীয় লীলা চলছে, তার মোকাবেলার জন্যে দিতে হবে রক্ত ও প্রাণ, দিতে হবে শোণিত ও জীবন। এভাবেই দূর করা সম্ভব---

যতদুঃখ পৃথিবীর, যত পাপ, যত অমঙ্গল
যত অশ্রুজল
যত হিংসা হলাহল। (৩৭)

মানুষের প্রাণে মানুষ যত বিষ মিশিয়েছে সে সব বিষ ধুয়ে মুছে ফেলবার জন্যে চাই মহৎ প্রাণ ব্যক্তির রক্ত। কাজেই রবীন্দ্রনাথ ত্যাগবীর তরুণের রক্ত ও প্রাণ দান কামনা করেছেন নর-দানবের দেয়া দারিদ্র-পীড়ন-যন্ত্রণা থেকে মানুষের মুক্তির জন্যে। এই দানবের সাথে লড়াইয়ের জন্যে ঘরে ঘরে যে লড়িয়ে তরুণ প্রস্তুত হচ্ছে তাও তিনি দেখতে পেয়ে আশ্বস্ত হয়েছিলেন। এবং এও জানতেন :

কোন ভাবী ভীষণ সংগ্রাম
রণশৃঙ্গে আহ্বান করিছে তার নাম। (১৬)

আমরা যারা বাঁচার মতো বাঁচতে জানলাম না, পারলাম না মরার মতো মরতে, এই মৃত্যুঞ্জয়ী বীরদের আত্মাহুতির সহজ প্রবণতা দেখে আমরাও জীবনে হঠাৎ করে খুঁজে পাই শক্তি, গর্ব ও প্রত্যয়। ভাবী সংগ্রামে শহীদেরাই হয়ে থাকে প্রেরণার উৎস ও পথের দিশারী।

রবীন্দ্রনাথের মতে দুঃখ-বেদনা ও মৃত্যুর মধ্য দিয়ে ঘটে নবযুগের ও নতুন জীবনের অরুণোদয়। যে পোষ মানে---সে মরে, যে অতীতকে আশ্রয় করে---সে হয় জীর্ণতায় অবসিত। কাজেই বিপদ সামনে নয়, পশ্চাতে। পশ্চাতই---পুরাতনই মানুষকে গ্রাস করে---

ওরা জীবন আঁকড়ে ধরে
মরণ সাধন সাধবে।
কাঁদবে ওরা কাঁদবে।
রইল যারা পিছুর টানে
কাঁদবে তারা কাঁদবে। (৩)

সম্মুখের বাধার আহ্বানে যে সাড়া দেয়, জীবন যাত্রায় সে-ই হয় জয়ী। জীবন তার কাছেই ধরা দেয়। সে জানে সামনে নতুন দিন। প্রভাত হতে দেরী নেই :

নূতন উষার স্বর্ণদ্বার
খুলিতে বিলম্ব নাই আর। (১৭)

রবীন্দ্রনাথের চিরকালই এ বিশ্বাস ছিল যে কোন মহৎ মৃত্যুই বৃথা যায় না এবং রক্ত ও প্রাণের বিনিময়ে ছাড়া কোন মহৎ কল্যাণ, কোন বৃহৎ মুক্তি আসতে পারে না, কেননা পাপ ও পীড়ন, অন্যায় ও শোষণ দানবীয় শক্তিরই দান। সেই রাক্ষুসে রাহু-গ্রাসই ম্লান করে দিয়েছে---কালো করে দিয়েছে পৃথিবীর আলো। তাই আস্তিক্য বুদ্ধি নিয়ে কবি প্রশ্ন করেছেন :

মৃত্যুর অন্তরে পশি অমৃত না পাই যদি খুঁজে
সত্য যদি নাহি মেলে দুঃখ সাথে যুঝে,
পাপ যদি নাহি মরে যায়
আপনার প্রকাশ লজ্জায়
অহঙ্কার ভেঙ্গে নাহি পড়ে আপনার অসহ্য সজ্জায়,
তবে ঘর ছাড়া সবে
অন্তরের কি আশ্বাস রবে
মরিতে ছুটিতে শত শত
প্রভাত আলোর পানে লক্ষ লক্ষ নক্ষত্রের মতো ?
বীরের এ রক্তস্রোত মাতার এ অশ্রু ধারা
এর যত মূল্য সে কি ধরার ধুলায় হবে হারা ?
রাত্রির তপস্যা সেকি আনিবে না দিন ?
নিদারুণ দুঃখরাতে
মৃত্যুঘাতে
মানুষ চূর্ণিল যবে নিজ মর্ত্যসীমা
তখন দিবে না দেখা দেবতার অমর মহিমা ?

রবীন্দ্রনাথ গান্ধীপন্থী ছিলেন না। তিনি শক্তি দিয়ে শক্তির মোকাবেলায় আস্থা রাখতেন।

# হোমার ও ইলিয়াড

আব্দার রশীদ

ইলিয়াড কাব্য সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে জন কাউপার পাউইস্ বলেছেন—'দান্তের মতো কল্পনার ব্যাপকতা, শেক্স্পীয়রের মতো নাটকীয়তা, মিলটনের মতো উদাত্ত প্রকাশভঙ্গী এবং গ্যেটের মতো দার্শনিকতা ইলিয়াডে নেই, কিন্তু তা সত্ত্বেও ইন্‌ফার্নো কিংবা কিং লীয়ার বা প্যারাডাইজ লস্ট্ কিংবা ফাউস্টের চেয়ে ইলিয়াড মহত্তর কাব্য। কেন?—তার উত্তর হচ্ছে ইলিয়াড অন্য কাব্যগুলোর চেয়ে অধিকতর বাস্তবধর্মী এবং অধিকতর স্বাভাবিক। এক কথায় পৃথিবীতে মানব জীবনের আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত যা কিছু ঘটেছে, ঘটছে এবং ঘটবে তার ঘনিষ্ঠতর সাদৃশ্য ইলিয়াডে পাওয়া যায়।'

ইলিয়াড কাব্যের এই স্বাভাবিকতাই সকলকে মুগ্ধ করেছে। টলস্টয়ও এই দিক থেকে বিচার করেই শেক্সপীয়রকে 'আর্টিস্ট' বলে স্বীকার করতে নারাজ, তিনি বলেছিলেন,—'শেক্স্পীয়রের রচনাবলী পড়ে লোকে যতই মুগ্ধ হোক না কেন, তাঁর রচনায় যত গুণাবলীই আরোপ করুক না কেন, শেক্স্পীয়র 'আর্টিস্ট' ছিলেন না এবং তাঁর রচনাগুলো 'আর্টিস্টিক' নয়। তালজ্ঞান না থাকলে যেমন সঙ্গীতজ্ঞ হওয়া যায় না, পরিমাণজ্ঞান না থাকলে তেমনি আর্টিস্ট হওয়া যায় না। তাই শেক্স্-পীয়র আর যাই হোন না কেন, তিনি আর্টিস্ট নন'।

এবং এই প্রসংগেই হোমারের সংগে শেক্স্পীয়রের তুলনা করতে গিয়ে টলস্টয় বল-লেন,—'হোমার আমাদের থেকে যত দূরেই অবস্থান করুন না কেন, অত্যন্ত সহজেই তাঁর বর্ণিত যাত্রার মধ্যে তিনি আমাদের নিয়ে যেতে পারেন। তার প্রধান কারণ, তাঁর বর্ণিত ঘটনাবলী আমাদের যত অপরিচিতই হোক, তিনি যা বলেন, তা তিনি

বিশ্বাস করেন, এবং যা বর্ণনা করেন তা তিনি অত্যন্ত আন্তরিকতার সংগে গভীর ভাবে করেন, অর্থাৎ তিনি কখনও কোনো কিছু অতিরঞ্জিত করেন না এবং পরিমাণ-জ্ঞান থেকে কখনও বিচ্যুত হন না। কাজেই ইলিয়াড অডেসীর কেবল প্রধান প্রধান চরিত্রগুলোই নয়, সম্পূর্ণ কাব্য দুটোই স্বাভাবিকতার দিক থেকে আমাদের এত কাছের যে, মনে হয় আমরা যেন সেই সব দেবদেবী ও বীর পুরুষদের সংগে বাস করেছি এবং এখনও করছি। কিন্তু শেক্‌স্‌পীয়রে সে রকম নয়। তাঁর প্রথম কথাটি থেকে অতিরঞ্জন শুরু হয়,---ঘটনার অতিরঞ্জন, অনুভূতির অতিরঞ্জন, বাচনের অতি-রঞ্জন। আর তা পড়ার সংগে সংগেই বোঝা যায় তিনি যা বলেন তা বিশ্বাস করেন না,---পাত্রপাত্রীদের দিয়ে তিনি সেই সবই করান যা দর্শকজনের মন ভোলাবে। অতএব তাঁর সৃষ্ট ঘটনাবলী বা কার্যাবলী কিংবা তাঁর চরিত্রসমূহের বেদনা বা যন্ত্রণা আমরাও বিশ্বাস করি না।' ইত্যাদি।

উপরোক্ত উধৃতিগুলো প্রথম দৃষ্টিতে খুব বিস্ময়কর মনে হলেও, ভালো করে তলিয়ে দেখলে শেক্‌স্‌পীয়রের অতুলনীয় প্রতিভা স্বীকার করা সত্ত্বেও কথাগুলো বিশ্বাস না করে উপায় থাকে না।

তা হলে দেখা যাচ্ছে ইলিয়াড কাব্যে যে অতুলনীয় গুণ, যাকে পৃথিবীর আর কোনো শ্রেষ্ঠ কবিই রপ্ত করতে পারেন নি---সেটি হচ্ছে তার স্বাভাবিকতা।

হোমার জীবনকে আদর্শায়িত করে দেখতে চান নি। জীবনকে তিনি যথাযথ রূপে দেখেছেন এবং জীবনের সত্য রূপটিকেই প্রকাশ করতে চেয়েছেন,---তা যতই নির্মম বা নিষ্ঠুর হোক। আর সেই জন্যেই নাটকীয়তা বা করুণ রস তিনি কৃত্রিমভাবে সৃষ্টি করতে চাননি এবং করেন নি। যত ভয়ংকর, যত নিদারুণ, যত মর্মান্তিক ঘটনাই হোক, হোমার তাকে বিধাতার মতো প্রশান্ত নির্লিপ্ততার সংগে দেখেছেন। ইলিয়াডে সর্বত্রই সেই 'ভয়াবহ নিস্পৃহতা' বিদ্যমান। ---হেক্টরের মৃত্যুদৃশ্য তেমনি একটি মর্মান্তিক করুণ দৃশ্য---অথচ কত অল্প কথায়, কি নির্বিকার ঔদাসীন্যে সে ঘটনা বর্ণিত হয়েছে।

প্রায় তিন হাজার বছর আগেকার যে জীবনযাত্রার ছবি ইলিয়াড কাব্যে ফুটে উঠেছে, তিন হাজার বছর পরেকার আজকের মানুষের জীবন যাত্রার সংগে তার মৌলিক কোনো পার্থক্য যেন খুঁজে পাওয়া যায় না। ইলিয়াডের মানুষদের মতোই আজো আমরা ভালোবাসি ও ঘৃণা করি। ইলিয়াডের মানুষদের মতোই আমরাও ভাগ্যের হাতে বারংবার বিড়ম্বিত হচ্ছি, পাপ ও পুণ্যের অদৃশ্য প্রভাবে প্রভাবান্বিত হচ্ছি, চিরকাল

ধরে সেই অমোঘ, অজেয় শক্তি---যাকে বলি মৃত্যু---তারই হাতে আমাদের প্রিয় আত্মীয় পরিজন আত্মসমর্পণ করছে।

ইলিয়াডে পাতার পর পাতা জুড়ে যে যুদ্ধের বর্ণনা আছে, সেটি হয়তো এখন আর নেই। কিন্তু একেবারেই কি নেই? আছে, তবে সে যুদ্ধের রূপ ও উপকরণ বদলে গেছে শুধু। কেন না, মানুষের রাগ, দ্বেষ, প্রতিহিংসাপরায়ণতা---সবই আজো সেই রকমই আছে। ঢাল তলোয়ার ও বর্শার যুদ্ধ না থাকলেও ক্রোধ ও হিংসা প্রকাশের কত বিচিত্র পদ্ধতিই তো আছে।

তাই ইলিয়াডের আগাগোড়া এই যে এত যুদ্ধ,---কখনও দ্বৈরথ যুদ্ধ, কখনও সমবেত আক্রমণ,---তা সত্ত্বেও ইলিয়াড কেবল বীরযুগের বীরদের কাহিনী নয়, ইলিয়াড চিরন্তন মানুষের কাহিনী হয়ে রয়েছে।

ইলিয়াডের কাহিনী যাদের নিয়ে গড়ে উঠেছে তারা সকলেই বীর যোদ্ধা, অথবা বীরমাতা বা বীরজায়া। কিন্তু সে বীরত্ব তাদের রূপকথার অলৌকিক জগতে নিয়ে যায়নি। তাদেরকে আমাদেরই চেনাজানা লোক বলে মনে হয়। তারা সকলেই রক্ত মাংসের জীবন্ত সাধারণ মানুষ। সকলে মিলে এরা যোদ্ধা কিন্তু এককভাবে দেখলে এরা প্রত্যেকেই দোষে গুণে জড়িত স্বাভাবিক মানুষ। ইলিয়াডের যারা শ্রেষ্ঠতম বীর তাদের কথাই ধরা যাক্।

একিয়ান (গ্রীক্) পক্ষের শ্রেষ্ঠতম বীর একিলিস। ইলিয়াড কাব্যের নায়ক সে। অসাধারণ বীরত্ব সত্ত্বেও মানবিক সমস্ত রকম স্বাভাবিক অনুভূতিসম্পন্ন ব্যক্তি সে। অসম্ভব রকম একগোঁয়া মানুষ এই একিলিস। মাথায় যখন যেটা একবার ঢোকে, সেইটে নিয়েই সে উন্মত্ত হয়ে থাকে, যতক্ষণ না আর কিছু একটা তার মাথায় ঢোকে। আগামেম্‌নন্ যখন ব্রীসিসকে তার কাছ থেকে কেড়ে নিলো, তখন সে ক্রোধে ক্ষোভে নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে রইলো, শত অনুরোধেও তাকে টলানো গেল না। আগা-মেম্‌নন্ যখন নিজের ভুল বুঝতে পেরে অজস্র উপঢৌকনে তাকে ভোলাতে চাইলো, তখনও সে তার একগুঁয়েমী ছাড়ে নি। একীয়ানরা সাংঘাতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে দেখেও সে বিন্দুমাত্র বিচলিত হয় না। কেন না, একিলিসের সবচেয়ে কোমল জায়গায় ঘা লেগেছে, তার সৈনিকের সম্মান বিপন্ন করেছে আগামেম্‌নন্,---সে অভিমান সে কোনো কিছুর পরিবর্তেই ভুলতে পারে না। কিন্তু যে মুহূর্তে হেক্টরের হাতে তার বন্ধু প্যাট্রোক্লাসের মৃত্যু-সংবাদ পেলো সে, সেই মুহূর্ত থেকে বন্ধু-হত্যার প্রতিশোধ

বাসনা ছাড়া আর কোনো ভাবনা ছিলো না তার। বন্ধুর মৃত্যুর প্রচণ্ড দুঃখে সে তখন মরীয়া হয়ে ওঠে। আগামেমননের সাথে ঝগড়া মিটমাট করে ফেলতে তখন তার দেরী হয় না। কেন না, অপর একটি লক্ষ্য নিয়ে সে তখন উন্মাদ হয়ে উঠেছে---বন্ধু-হত্যার প্রতিশোধ নিতে হবে। অগণিত ট্রোজান সৈন্যসহ হেকটরকে হত্যা করার পরেও তার সে প্রতিহিংসা-বাসনা যেন চরিতার্থ হতে চায় না। হেকটরের মৃতদেহ নিয়ে সে যা করেছে, তার সমাজের চোখে তা অতিশয় বীভৎস ব্যাপার।

এই একরোখামী একিলিস কি তার মায়ের কাছ থেকে পেয়েছিলো? তার মা থেটিস্-কেও আমরা আগাগোড়া দেখেছি,---ঐ এক চিন্তা তারও, কি করে ছেলের দুঃখ দূর করবে। তারই জন্য জিউস্ থেকে হেফাস্টাস্ পর্যন্ত যে কোনো দেবতার কাছে সে ধর্ণা দিচ্ছে।

কিন্তু এই একরোখা একিলিসকেই বৃদ্ধ রাজা প্রায়ামের সামনে অন্য রকম দেখি। হেকটরের মৃতদেহ ফিরিয়ে নেবার প্রার্থনা নিয়ে বৃদ্ধ প্রায়াম যখন একিলিসের কাছে উপস্থিত হয় তখন সেই পিতৃতুল্য প্রায়ামের প্রার্থনায় সে কাতর হয়, হেকটরের মৃতদেহ সে ফিরিয়ে দিতে রাজী হয়। নিজে হাতে সে প্রায়ামের শকটে সেই মৃতদেহ তুলে দেয় এবং হেকটরের সৎকারের জন্য এগারো দিন যুদ্ধবিরতির প্রস্তাবেও সে রাজী হয়।

একীয়ান পক্ষের প্রধান সেনাপতি আগামেম্নন্ও আদর্শ চরিত্রের লোক নয়। তার মধ্যেও স্বার্থপরতা, ধূর্ততা, অবিবেচনা আছে। নিজের ক্ষমতা সম্পর্কে সচেতনতা আছে, আবার দম্ভও আছে। একিলিসের কাছ থেকে ব্রীসিসকে ছিনিয়ে নেবার সময় তার মধ্যে যে একরোখা নীচতা দেখা যায়, নিজের ভুল বোঝার সংগে সংগে তার প্রতিকারের জন্যেও সে দ্রুত চেষ্টা করতে থাকে। তার ভাই মেনিলাউসের প্রতি তার স্নেহ ছাড়া এই রগচটা, খামখেয়ালী, অবিবেচক আগামেম্ননের মধ্যে প্রশংসা করবার মতো প্রায় কিছুই নেই। তবু তাকেও আমাদের ভালো লাগে রক্ত মাংসের জীবন্ত মানুষ বলে।

একীয়ানদের পক্ষে আরো আছে নেস্টর---ধীর, স্থির, সৌম্য, বুদ্ধিমান, রাজভক্ত ও বিচক্ষণ বক্তা। বিপদকালে মাথা ঠাণ্ডা রেখে আপোষের পক্ষপাতি। এদিকে আবার খেলাধুলার সময় নিজের ছেলেকে সে বিস্তারিতভাবে শিখিয়ে দিচ্ছে কেমন করে খেলায় অন্যকে ঠকাতে হয়।

আছে অডিস্যুস,---সাংসারিক বুদ্ধি সম্পন্ন, চতুর ও শক্তিশালী এবং সত্যিকারের বীর। তার বুদ্ধির জন্যই সে সকলের,---অন্ততঃ প্রায় সকলের,—ভালোবাসা অর্জন করেছে, অবশ্য মাথামোটা এ্যাজাক্সকে সে কুস্তিযুদ্ধে চালাকী করে ঠকিয়ে হারিয়ে দেয়।

আছে ডায়োমিডিস---অল্পবয়স্ক ও অল্প কথার লোক, কিন্তু যে কোনো দুরূহ কাজের দায়িত্ব নিতে উৎসুক।

আর ট্রোজানদের পক্ষে আছে প্যারিস,---তার নারীরূপমোহই সকল গোলযোগের মূল। সুন্দর, সুঠাম চেহারা, চঞ্চল ও দায়িত্বজ্ঞানহীন। সেই জন্যেই ট্রয়ে তাকে প্রায় কেউই ভালো চোখে দেখে না। আত্মসম্মানে আঘাত লাগলে প্যারিস সাহসী হয়ে ওঠে, কিন্তু বেশীক্ষণ তার ওপর নির্ভর করা চলে না। সে যুদ্ধ করতে আসে যুদ্ধ-পোষাকের পরিবর্তে চিতাবাঘের চামড়া পরে---যেন খেলার মাঠে এসেছে। মেনিলাউসের সংগে দ্বন্দ্বযুদ্ধে এঁটে উঠতে না পেরে সোজা পালিয়ে যায় প্রাসাদে, এবং সেখানে হেলেনকে নিয়ে শয্যার মধ্যে বিশ্রামের আরাম খোঁজে। পালিয়ে আসার জন্য এতটুকু গ্লানি বা লজ্জাবোধ নেই তার। সেই জন্যে গুরুগম্ভীর হেকটরের কাছে বকাবকিও খায়। এত দোষ সত্ত্বেও, প্যারিসকেও খারাপ লাগে না তো আমাদের।

দেখতে পাই জরাজীর্ণ, ভেঙেপড়া, বৃদ্ধ রাজা প্রায়ামকে। দুর্বল হলেও রাজকীয় মহিমা এখনও কিছু কিছু আছে তার। সন্তানদের ভরসাতেই সে এখন বেঁচে আছে, আর বড়ো বেশী দুর্বল সে তার সেই সন্তানদের সম্পর্কে। পুত্র প্যারিসের কুকীর্তির জন্য তাকে সে তার দেশবাসীর মতোই খুব ভালো চোখে দেখে না,---কিন্তু সেই প্যারিসের সংগেই মেনিলাউসের দ্বন্দ্বযুদ্ধ চোখ মেলে দেখার সাহস তার নেই। সে যুদ্ধ-দৃশ্যের সামনে থেকে দূরে সরে থাকতে চায়। আবার, পুত্রবধু হেলেনের জন্যই তার ট্রয়ের আজ এই সর্বনাশ, তবু সেই হেলেনের প্রতিও তার স্নেহ কম নয়। হেলেনকে আদর করে পাশে বসিয়ে, তার কাছ থেকে গ্রীক পক্ষের বীরদের পরিচয় নেয় সে। তার পঞ্চাশ জন পুত্রের মধ্যে সে সব চেয়ে বেশী ভালোবাসে হেকটরকে। তাই হেকটরের মৃত্যুর পর শোকার্ত প্রায়াম অন্য ছেলেগুলোকে অপদার্থ বলে তাদের সামনেই বকাবকি করে। আর সেই হেকটরের মৃতদেহটি ফিরিয়ে আনবার জন্য অন্ধকার রাত্রে, অরক্ষিত অবস্থায় পুত্রহন্তাকারী একিলিসের কাছে প্রার্থনা করতে যায়। কি অসহায়, করুণ তখন প্রায়ামের অবস্থা। একিলিসকে ডেকে প্রায়াম বলে---"একিলিস! তোমার পিতার চেয়েও আমি বেশী করুণার পাত্র। আমি আজ যে কাজ করতে বাধ্য হচ্ছি, তা পৃথিবীতে আর কেউ কখনও করেনি,---আমি আমার পুত্র-হন্তার হস্তচুম্বন করছি।"

ট্রোজান পক্ষের সবচেয়ে মারাত্মক, সবচেয়ে শক্তিশালী যোদ্ধা, হেকটর। দেশরক্ষার ক্ষেত্রে সমস্ত ট্রয় নগরী তারই ওপর নির্ভর করে আছে। অথচ এতবড় যে বীর তবু তাকেই যেন সংসারের প্রতি সবচেয়ে স্নেহশীল বলে চেনা যায়। পঞ্চাশ জন পুত্রের মধ্যে পিতার স্নেহ সেই সবচেয়ে বেশী আকর্ষণ করেছে। মাকে, স্ত্রীকে এবং পুত্রকে সে অত্যন্ত গভীরভাবে ভালোবাসে। তবু কর্তব্যকে সে স্বার্থের চেয়ে বড়ো জেনে-ছিলো বলেই তাকে প্রাণ দিতে হয়।

যুদ্ধ যাত্রার প্রাক্কালে হেকটর যখন তার শিশুপুত্রকে শেষবারের মতো আদর করে চলে যাচ্ছে তখনকার একটি বর্ণনা অত্যন্ত মমতার সংগে এঁকেছেন হোমার। হেকটর হাত বাড়িয়ে ছেলেকে কোলে নিতে চাইলেন কিন্তু শিশুটি পিতার যুদ্ধ-পোশাকে সজ্জিত ভয়াবহ মূর্তি দেখে ভয় পেয়ে কেঁদে উঠে পরিচারিকার কোল আঁকড়ে থাকে। তাম্র-নির্মিত শিরস্ত্রাণ এবং বাতাসে আন্দোলিত ঘোড়ার চুলের ফিতা দেখে সে ভয় পেয়ে গিয়েছিলো। মা-বাবাও শিশুর কাণ্ড দেখে হেসে ফেলে। হেকটর তখন তার শিরস্ত্রাণ খুলে নামিয়ে রেখে ছেলেকে কোলে নিয়ে চুমো খায়, তাকে দুহাতে তুলে নাচায় এবং জিউস ও অন্যান্য দেবতাদের কাছে প্রার্থনা জানায়—এই ছেলে যেন বড় হয়ে তার মতোই খ্যাতিমান ও সাহসী যোদ্ধা হয়। যেন পিতার চেয়েও আরো বেশী শক্তিশালী হয় সে।

ভ্রাতৃবধু হেলেনকেও কেবল হেকটরই স্নেহের চোখে দেখে। সে কথা হেকটরের মৃত্যুর পরে হেলেনের মুখেই শোনা যায়। হেলেন হেকটরের মৃতদেহকে উদ্দেশ্য করে বলেছে, "হেকটর! আমি তোমাকে আমার ট্রোজান ভাইদের মধ্যে সবচেয়ে ভালোবাসতাম। ---আমি দেশ ছেড়ে এসেছি আজ উনিশ বছর। এর মধ্যে আমি তোমার কাছ থেকে কোনো তিরস্কার বা কটু কথা কখনো শুনিনি। বাড়ীর অন্য সবাই,—তোমার ভাইয়েরা, বোনেরা, তোমার ভাইদের ধনী স্ত্রীরা, এমন কি তোমার মা পর্যন্ত আমাকে অপমান করতে বাকী রাখেন নি। ---তুমি সর্বদা তাদের দুর্ব্যবহারের প্রতিবাদ করেছো ভদ্রভাবে। ---ট্রয়ের বিরাট ভূখণ্ডে আমার প্রতি মধুর ব্যবহার করার জন্য এখন আর কেউ রইলো না"।

হেকটরের ভালোবাসা কেবল তার পরিবারের প্রতিই নয়---দেশের সকল স্ত্রী-কন্যাই তারই কাছ থেকে ভরসা পেতে চায়। ট্রোজান নারীরা এসে তাকেই ছেঁকে ধরে, নিজেদের পুত্র, ভাই ও স্বামীদের কথা জিজ্ঞেস করে। হেকটর সকলের কথাই ভাবে।

ইলিয়াডে নারী চরিত্র খুব কম, কিন্তু যে ক'টি আছে তা অবিস্মরণীয়। হেকটর পত্নী এ্যাণ্ড্রোমেকীর কথাই ধরা যাক। এ্যাণ্ড্রোমেকী বীরাঙ্গনা নয়, সে সাধারণ রমণী, স্বামীপুত্র নিয়ে শান্তিতে সে সংসার করতে চায়। তাই যুদ্ধ সজ্জায় সজ্জিত স্বামী হেকটরের প্রতি আবেদন জানায়---"হেকটর! ---তোমাকে হারালে আমারও হয়তো মৃত্যু হবে। কারণ তোমার মৃত্যু হলে আমার মনে শান্তি থাকবে না---থাকবে অনন্ত দুঃখ। আমার পিতা নাই, মা নাই। ---আমার সাত ভাই ছিলো, তারাও একদিনে সকলে মৃত্যুবরণ করে। ---কাজেই হেকটর! তুমিই আমার পিতা, মাতা, ভাই এবং স্বামী---সবই। এখন কৃপা কর আমাকে, থাক এখানে এই দেয়ালের উঁচু চুড়ায়----তোমার শিশু পুত্রকে অনাথ এবং তোমার স্ত্রীকে বিধবা করো না"।

আর হেকটরের সেই বিদায় মুহূর্তে শিশু এ্যাস্টিয়ানক্স যখন পিতার যুদ্ধ সজ্জা দেখে ভয়ে কেঁদে ফেলে, বাপের কোলে কিছুতেই যেতে চায় না,---তখন সেই শিশুর অবস্থা দেখে হেকটর হাসে, সেই সংগে এ্যাণ্ড্রোমেকীও হাসে, যদিও স্বামীর আসন্ন বিদায় বেদনায় তার চোখ ভরা পানি। চোখে পানি, মুখে হাসি---সেই এ্যাণ্ড্রোমেকীর ছবিটা যে গভীর মমতায় হোমার এঁকেছেন, আমরাও সেই মমতা অনুভব করি।

হেকটরের মা হেকাবিও চিরন্তনী মা। তার জীবনে এত কিছু ঘটেছে যে সে দুঃখবাদী হয়ে পড়েছে। সব সময় সে কেবল অমঙ্গলই আশংকা করছে। তাই হেকটরের যুদ্ধে যাবার সময় তার ভেতরের সেই অমঙ্গল আশংকা উদ্বেল হয়ে ওঠে। তাই তার বুকের অমৃতভাণ্ড মাতৃস্তনের দোহাই দিয়ে সে হেকটরকে নিবৃত্ত করতে চায়। আকুল কণ্ঠে বলে---"বাবা হেকটর! তোর এই মাতৃস্তনের কথা স্মরণ করে আমাকে দয়া কর্। এই বুকের দুধ দিয়ে তোকে কতদিন আমি শান্ত করেছি, সেদিনের কথা মনে করে দেখ্"। স্বামীর কল্যাণ কামনায়ও সে সদা উদ্গ্রীব। তাই শত্রু শিবিরে পুত্রের মৃতদেহ ফিরিয়ে আনবার জন্য প্রায়ামকে সে প্রথমে যেতেই নিষেধ করে, পরে প্রায়ামকে স্থিরপ্রতিজ্ঞ দেখে দেবতাদের উদ্দেশ্যে সুরাতর্পনের পরামর্শ দেয়।

আর হেলেনই তো ইলিয়াড কাব্যের এতবড়ো যুদ্ধের মূল কারণ। সে চিরন্তন নারী-সৌন্দর্য ও রূপ-মোহের প্রতীক। সে যে ট্রয়ের জন্যে কি সর্বনাশ ডেকে এনেছে তা সে বোঝে। আর তার জন্যে সে নিজেকেও দোষ দেয় এবং যে দেবী তার এই পরিণতির জন্য দায়ী তাকেও। তাকে দেখলেই ট্রয়ের পথে পথে লোকজন সভয়ে সরে যায়,---সে যেন অমঙ্গলের ছায়া। আর প্রাকারে উপবিষ্ট নগরবৃদ্ধরা যখন তাকে আসতে দেখে, তখন মন্তব্য করে---"এমন মেয়ের জন্য পুরুষরা যে এত কিছু সহ্য

করছে, সেটা এমন কিছু আশ্চর্য ব্যাপার নয়, কেন না তাকে দেখে দেবীর মতো মনে হয়"। সৌন্দর্য ও দুর্ভাগ্যের মূর্ত প্রতীক সে। অবশ্য তার এ দুর্ভাগ্য যুদ্ধের ফলাফলের ওপর নির্ভর করছে না। প্যারিস বা মেনিলাউস যারই জয় হোক, তাতে তার দুর্ভাগ্যের কোনো পরিবর্তন হবে না। তাই সে আক্ষেপ করে বলে—"আমি সত্যি লজ্জাহীনা, দুষ্টমনা, ঘৃণ্যজীব। কত ভালো হতো, যদি জন্ম মুহূর্তেই দুষ্ট ঝড়-দেবতা আমাকে উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে কোনো পাহাড়ের ওপরে কিংবা কোনো উত্তাল তরংগ-সঙ্কুল সাগরে ফেলে দিতো"।

সেই হেলেনের প্রতিও হোমারের কি অপরিসীম নিরাসক্তি। এই নিরাসক্তি আনার প্রতি টলস্টয়ের নিরাসক্তির মতো। দুই রমণীই ঘর ছেড়ে চলে এসেছে,—ভেবেছে তারা অতীতকে মুছে দিয়ে ভবিষ্যৎকে কোনো এক অপরিবর্তনীয় প্রেম দিয়ে বেঁধে ফেলবে। কিন্তু ভুল যখন ভাঙলো, তখন দুজনেই দেখে সামনে আর কোনো সুখ নেই, আশা নেই,—এক অলস বিষন্নতা সমস্ত কিছুকেই ছাপিয়ে উঠেছে।

হোমারের সৃষ্ট চরিত্ররা কোথাও তাদের পূর্বাপর সংগতি হারায় নি, কোথাও তারা তাদের স্বাভাবিকত্বের গণ্ডী পেরিয়ে যায় নি। তাতেই বোঝা যায় মানবজীবন, মানবচরিত্রকে তিনি কি পরিপূর্ণ ভাবে, কি অখণ্ড দৃষ্টিতে দেখেছিলেন।

ইলিয়াড কাব্যের দেবদেবীরাও যেন মানুষেরই ছায়া দিয়ে তৈরী। ঈশ্বর নাকি মানুষকে তাঁর নিজেরই অনুরূপ করে গড়েছেন,—আর ইলিয়াড কাব্যে হোমার মানুষের অনুকরণে দেবতা গড়েছেন। অলিম্পাসের চূড়ায় গ্রীক দেবলোকে তাই নানা রকম লৌকিক ধরণের তামাশাও দেখতে পাওয়া যায়। প্রায় সব দেবতাকে নিয়েই তিনি তামাশা করেছেন—তবে সে তামাশা কেবল তখনই যখন সব দেবদেবী একত্রে সম্মিলিত হয়েছে। মানুষের সংগে ব্যবহারে কিন্তু তাঁরা কেউই তামাশার পাত্র নন, সেখানে তাঁরা প্রত্যেকেই নিজের নিজের ক্ষেত্রে শক্তিমান। একমাত্র যুদ্ধ দেবতা আরেসকেই তিনি এই যুদ্ধময় কাব্যে সর্বদাই খর্ব করেছেন,—তার কারণ বোধ হয় এই যে, যুদ্ধকে মহিমান্বিত করার জন্য হোমার ইলিয়াড রচনা করেন নি, যুদ্ধের করুণ নিষ্ফলতাকেই বড় করে দেখাতে চেয়েছেন।

সমগ্র ইলিয়াড কাব্যে আমরা দেবদেবীদেরও পক্ষপাতিত্ব করতে দেখেছি, কিন্তু হোমার যেন ঐ দেবলোকের দেবতাদের চেয়েও নিরপেক্ষ। গ্রীক বা ট্রোজান, কাদের জন্য হোমারের বেশী দরদ, কেউ বলতে পারবে না। তার বর্ণনার গুণে উভয় পক্ষের বীরত্বেই আমরা গৌরব বোধ করি, উভয় পক্ষের শোকেই গভীর সহানুভূতি

বোধ করি। আর শুধু দেখি, কি দুর্জয় ও ভয়ংকর নির্লিপ্ততার সাথে হোমার ঘটনার পর ঘটনা বর্ণনা করে চলেছেন।

আর এই যে দীর্ঘ মহাকাব্যটি জুড়ে এত যুদ্ধের ঘনঘটা তবু যেন বোঝা যায়---যুদ্ধ নয়, শান্তিপূর্ণ আনন্দ বেদনাময় জীবনই হোমারের কাম্য। তাই তাঁর কাব্যের কোনো যোদ্ধাই সংসারের প্রতি উদাসীন নয়,—তারা সকলেই জানে এই যুদ্ধ শেষ হলে একদিন তারা ঘরে ফিরে যাবে, যেখানে তাদের প্রিয়জনরা রয়েছে।

যুদ্ধের ও ভয়ংকর প্রতিহিংসার কাহিনী তিনি শুনিয়েছেন, তার মধ্যে মানবতা ও মহত্ত্ব আরোপ করে আমাদের দেখিয়ে দিয়েছেন এই যুদ্ধের কোলাহলের পশ্চাতে ও ঊর্ধ্বে কি থাকতে পারে। তিনি আমাদের বুঝিয়ে দিয়েছেন, মানুষ হিসাবে সব মানুষই সমান; প্রেমে ও যাতনায়, পাপে ও দুঃখে, সহনশীলতা ও মৃত্যুতে---শত্রুমিত্র বা গ্রীক-ট্রোজানে কোনো ভেদ নেই। এই চিরন্তন ও সর্বজনীন সহানুভূতি ও বৈরাগ্যের সুরে ইলিয়াড কাব্য শেষ হচ্ছে। একিলিস আক্ষেপ করে বলেছে—
"We men are wretched things, and the gods, who have no cares themselves, have woven sorrow into the very pattern of our lives,"
মানুষের ভাগ্য নিয়ে দেবতারা উদাসীন ছিলেন বটে, তবে হোমার উদাসীন ছিলেন না।

"কে আর রহিবে জেগে পৃথিবীর 'পরে?
স্বপ্ন নয়—শান্তি নয়—কোন এক বোধ কাজ করে
মাথার ভিতরে"।

# এলিয়ট পরিক্রমা

সৈয়দ মাহতাবউদ্দিন আহাম্মদ

টি, এস, এলিয়ট আধুনিক ইংরেজী কাব্যে যে নূতন ধারার সূচনা করেছিলেন আজও তিনি সে ধারার শ্রেষ্ঠ পথিকৃৎ বলেই স্বীকৃত। আমেরিকায় জন্মগ্রহণ করলেও প্রথম মহাযুদ্ধের সময় থেকেই এলিয়ট ইংলণ্ডকেই বেছে নিয়েছিলেন তাঁর স্থায়ী বাসভূমি হিসেবে। প্রথম মহাযুদ্ধের সময়েই (১৯১৪--১৯১৮) বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায় তাঁর কবিতা বের হতে থাকে। তাঁর প্রথম দিকের সেই সব কবিতা ছোট ছোট পুস্তিকার আকারে আত্মপ্রকাশ করে ১৯১৭ থেকে ১৯২০ সালের মধ্যে। কিন্তু ১৯১২ সালে তাঁর **Waste Land** কবিতাটি প্রকাশিত হওয়ার পর থেকেই তাঁর কবি খ্যাতি ছড়িয়ে পড়তে থাকে সারা বিশ্বে।

সর্বগ্রাসী মহাসমরের কবলে পড়ে য়ুরোপের প্রাচীন সমাজ ও সভ্যতা দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছিল চরম ধ্বংসের দিকে। পুরাতন ধর্মবিশ্বাস, মূল্যবোধ, নৈতিকতা সব কিছু ধোঁয়া হয়ে উড়ে যাচ্ছিল কামানের মুখে। অতীত ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রতি সম্ভ্রম-বোধ খান খান হয়ে ভেঙ্গে যাচ্ছিল যুদ্ধের প্রতিক্রিয়ায়। যুদ্ধবিধ্বস্ত য়ুরোপীয় সভ্যতার ধ্বংসস্তুপের উপর উঠে দাঁড়িয়ে এলিয়ট চেয়ে দেখলেন একটি পুরাতন সমৃদ্ধ সভ্যতার শোচনীয় সার্বিক বিপর্যয় ও মৃত্যু।

সমাজ ও সভ্যতার এই অবক্ষয় য়ুরোপের অনেক কবি, সাহিত্যিক, দার্শনিককে ভাবিত করে তুলল। অনেকে সমাজতন্ত্রের মধ্যে খুঁজে পেলেন সকল সমস্যার সমাধান ; আবার অনেকে ধর্মের শান্তিবাণী শুনিয়ে চাইলেন হিংসা ও ধ্বংসের রাজ্যে একটি সুস্থ পরিবেশ সৃষ্টি করতে। এলিয়ট এই শেষোক্ত শ্রেণীভুক্ত। তিনি শান্তি ও মুক্তির পথ খুঁজে পেলেন বেদে-উপনিষদে, বুদ্ধের অহিংসার আদর্শে, পুরাণে, বাইবেলে, য়ুরোপীয় প্রাচীন

ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ভাঁজে ভাঁজে। এক কথায় তিনি অতীতমুগ্ধ, কারণ বর্তমান তাঁকে কোন আলোর আভাস দিতে পারেনি, কিংবা মুক্তি ও শান্তির কোন ইঙ্গিত। দৃষ্টিভঙ্গিতে এলিয়ট তাই সনাতনপন্থী ( classicist ), ধর্মে ইঙ্গ-ক্যাথলিক ( Anglo-catholic ) আর রাজনৈতিক চিন্তাধারায় তিনি রাজপন্থী ( royalist)। তিনি মনে করতেন চৈতন্যের সন্ততি ( development ) ও একতা প্রয়োজন আত্মসচেতন মানসের ভারসাম্যের জন্য। আরো বুঝেছিলেন যে নৈর্ব্যক্তিকতার মধ্য দিয়েই ঘটে ব্যক্তিমনের যথার্থ প্রকাশ। তিনি নিশ্চিত হয়েছিলেন যে একমাত্র অতীত ঐতিহ্যের আলোকেই সম্ভব নিজেকে বর্তমানের মধ্যে সঠিক চিনতে পারা। অতীত ,বর্তমান ও ভবিষ্যৎ এক সুতোয় গাঁথা যেন একটি মালা। কাজেই অতীতকে বাদ দিয়ে যেমন বর্তমানকে কল্পনা করা যায় না, তেমনি ভবিষ্যতের মধ্যেও আছে অতীত ও বর্তমানের প্রচ্ছন্ন উপস্থিতি :

Time present and time past
Are both perhaps present in time future,
And time future contained in time past.
( Burnt Norton )

Tradition and Individual Talent প্রবন্ধে এলিয়ট কাব্যে ঐতিহ্যের প্রভাব সম্পর্কে বলেছেন :

"What is to be insisted upon is that the poet must develop or procure the consciousness of the past and that he should continue to develop this consciousness throughout his career.........The progress of an artist is a continual self-sacrifice, a continual extinction of personality."

অর্থাৎ যিনি কবি তাঁর অতীতকে জানতেই হবে এবং তাঁর সমস্ত কাব্যের মধ্য দিয়ে তাঁর অতীত ঐতিহ্যের এই সচেতনতা কেবল বৃদ্ধি করে যেতে হবে। নিরন্তর আত্ম-বিলোপ ও ব্যক্তিত্বকে বলিদান না করলে শিল্পীর কোন অগ্রগতি সম্ভব নয়।

এলিয়টের ব্যক্তি নিরপেক্ষ ধর্মভিত্তিক শান্তির আদর্শ তাঁকে বিজ্ঞান-বিদ্বেষী করেছে। তার কারণ বোধ হয় এই যে বিজ্ঞানের বুদ্ধিসর্বস্ব যুক্তিবাদ এবং ধ্বংসাত্মক প্রকৌশল কোনটাই আধ্যাত্মিক সোপানারোহনের সহায়ক নয়। এলিয়ট বিশ্বাস করতেন যে কোন কবিই তাঁর মনের অখণ্ড রূপটি তাঁর কাব্যে ফোটাতে পারেন না যেহেতু, চেতনার অখণ্ডতা বলে কিছু নেই। আমাদের চেতনা-প্রবাহ খণ্ড খণ্ড চিত্র, বিচ্ছিন্ন অনুভূতি আর টুকরো টুকরো স্মৃতি ও ভাবনার সমষ্টি মাত্র।

এলিয়ট হচ্ছেন চেতনা প্রবাহেরই ( Stream of consciousness ) মহাকবি; তাঁর কাব্যের মূল বিষয়ই হচ্ছে অন্তর্চেতন মানস---তা বিভিন্ন কবিতায় বিভিন্ন রূপে প্রকটিত যদিও। প্রুস্ত, জয়েস, কাফকা প্রভৃতির লেখা উপন্যাসে (এবং স্বল্প বিস্তর ভার্জিনিয়া উল্ফে) মনের এই চেতনা প্রবাহকে সাহিত্যিক রূপ দেওয়া হয়েছে। বোদলেয়ার, ভালেরি, মালার্মে এবং রিলকের কবিতার মধ্যেও এই অন্তর্চেতনা সুস্পষ্ট। তবে এঁদের কবিতায় গীতিময়তার আধিক্যে কবিমনের যন্ত্রণা ততটা তীব্রতা লাভ করতে পারেনি, যতটা পেরেছে এলিয়টের কাব্যে। ইংরেজী কাব্যে কিন্তু অন্তর্চেতনার এই নূতন সুরটি সংযোজন করলেন এলিয়টই সর্বপ্রথম।

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় এলিয়টের যে সমস্ত কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল তাতে তিনি লণ্ডন ও বোষ্টন শহরের ভদ্রসমাজের মনোবিকার ও শূন্যতা তুলে ধরেছিলেন। হেনরি জেম্‌সের উপন্যাসে আমরা যে ব্যর্থতার দীর্ঘনিঃশ্বাস শুনতে পাই ঠিক সেই ধরনের ব্যর্থতার চিত্র এলিয়টের এই সময়কার কবিতাতে ফুটে উঠেছে। সমাজের উপর তলার ধনী ও বিলাসী শ্রেণীর জীবনের সমস্ত কদর্যতা, সমস্ত ক্ষুদ্রতাকে এলিয়ট প্রুফ্রক কবিতার মাত্র একটি ছত্রেই ব্যক্ত করেছেন:

I have measured out my life with coffee spoons.

প্রৌঢ়, পরাজিত প্রুফ্রকের শুচিবায়ুগ্রস্ততা ও অস্থিরতা অথবা সেই 'Portrait of a lady'র প্রৌঢ়া মহিলার ব্যর্থতাবোধের চিত্রের মধ্যেও ইতস্ততঃ ফুটে উঠেছে এলিয়টের কাব্যিক সুষমা, যদিও তারই সঙ্গেই মিশেছে তাঁর শ্লেষাত্মক টিটকিরি ( ironic wit )। সুন্দর ও কুশ্রী, আবেগ ও নিষ্প্রাণতাকে পাশাপাশি সাজিয়ে এলিয়ট যে নাটকীয়ত্ব সৃষ্টি করেছেন তাই হচ্ছে তাঁর কাব্যের অন্যতম উল্লেখযোগ্য আঙ্গিক ( formal device )। দু'য়ের অসামঞ্জস্যতা আমাদের অনুভূতিকে একটা ধাক্কা দিয়ে আমাদের মনে জাগিয়ে তোলে এক নূতন জিজ্ঞাসা ও চেতনা বোধ। The Love Song of J. Alfred Prufrock কবিতা থেকে এর দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে:

I grow old.........I grow old......
I shall wear the bottoms of my trousers rolled.
... ... ... ... ... ... ...
I have heard the mermaids singing, each to each.
... ... ... ... ... ... ...
I have seen them riding seaward on the waves
Combing the white hair of the waves blown back
When the wind blows the water white and black.

ার্ককোর সাদামাটা বর্ণনার সঙ্গে জলপরীদের সমুদ্রবিহারের এই রোমান্তিক কল্পনার মধ্যে একটা বৈসাদৃশ্য আছে, যা বর্তমানের দৃঢ় বাস্তবতার সঙ্গে অতীতের হারানো সোনার হরিণের প্রচ্ছন্ন তুলনার মধ্য দিয়ে তাৎপর্যময় হয়ে উঠেছে)।

এলিয়টের উপর সপ্তদশ শতাব্দীর ইংরেজ অতীন্দ্রিয়বাদী কবিদের ( metaphysical poets )—বিশেষ করে ডানের ( Donne ) প্রভাব পড়েছিল খুব গভীরভাবে। তাঁর সুইনী ( Sweeney ) কবিতাগুচ্ছে ডানের প্রভাব অত্যন্ত সুস্পষ্ট। ডানের মত এলিয়টের কোন কোন কবিতা বিজ্ঞ ( learned ) এবং দুর-কল্পনাশ্রয়ী ( far-fetched ) রূপকল্পে ( imagery ) ঠাঁসা। উদাহরণ স্বরূপ এলিয়টের প্রথম দিককার একটি কবিতা Burbank with a Baedeker; Bleistein with a Cigar এর উল্লেখ করা যেতে পারে। "দেড় পৃষ্ঠার এই কবিতাটিকে ঐতিহ্যের ভাঁড়ার বললেই হয়। সেক্স্‌পীয়রের নানা রচনা থেকে উদ্ধৃতি উল্লেখের সংখ্যা অন্ততঃ নয় হবে, তাছাড়া গতিয়ে, সেণ্ট অগাষ্টিন, হেনরি জেম্‌স্‌, ব্রাউনিং, রাসকিন, ডান, মার্ষ্টন, ফোর্ড ও স্পেন্সারও আছেন" (বিষ্ণু দে)। রেনেসাঁর নিরুপম শিল্প, গ্রীক পুরাণের সৌকুমার্য এবং নিসর্গ সৌন্দর্যের পাশে এলিয়ট এনে হাজির করেছেন বেশ্যালয়ের নোংরামি আর শুঁড়িখানার বেলেল্লাপনা। দুটো সম্পূর্ণ আলাদা অভিজ্ঞতার জগৎ সৃষ্টি করেও কবি দু'য়ের মধ্যে কোন সম্পর্ক স্থাপনের প্রয়াস পাননি অথবা তার উপর কোন মন্তব্য করেননি কিংবা এই খাপছাড়া চিত্রকল্পের দেননি কোন ব্যাখ্যা। পাঠককে তার নিজস্ব কল্পনা ও অভিজ্ঞতা দিয়ে পূরণ করে নিতে হয়, বুঝতে হয় কবির সবটুকু বক্তব্যকে ( যদিও পাঠকভেদে এলিয়টের কবিতার আবেদনও হবে বিভিন্ন মাত্রার )। ইঙ্গিতময়তা ( implication ) এবং পাঠকের সক্রিয় মননের মধ্য দিয়েই গড়ে ওঠে তাঁর কাব্যের আবেদন। বর্তমান বিশ্বে যখন কোন সত্যকেই আর মানুষ ধ্রুব বলে মানছেনা তখন এলিয়টের এই সব্যঙ্গ ইঙ্গিতময়তা দিয়েই আধুনিক মনকে একটি বিশেষ তত্ত্বের দিকে কবি আকর্ষণ করে নিয়ে যান।

এলিয়টের 'গেরণশ্যন' ( Gerontion—যার মানে হচ্ছে 'বুড়ো মানুষ' ) কবিতাটি হল একটি আত্মসংলাপ ( soliloquy )। কবিতার নাটকীয় গেরণশ্যন চরিত্রটি Waste Land এর অন্ধ, বৃদ্ধ, ভবিষ্যৎদ্রষ্টা টাইরেসিয়াস ( Tiresius ) চরিত্রের অনুরূপ। গেরণশ্যন এবং টাইরেসিয়াস দু'জনেই সাম্প্রতিক ক্ষয়িষ্ণু সমাজের দুটি বিশিষ্ট ও গোচচার কণ্ঠস্বর যেন। 'গেরনশ্যন' কবিতার সিলভেরো ( silvero ), হাকাগাওয়া ( Hakagawa ), মাদাম দ্য তর্ণকিস্ত ( Madame de Tronquist ) এবং ফ্রলীন ফন কুল্‌প ( Fraulein von kulp ) প্রভৃতি বিভিন্ন দেশীয় চরিত্রগুলোও

গেরণশ্যনের মতই গৃহহীন, ছন্নছাড়া মানুষ, যাদের আত্মিক বিপর্যয় এবং আধ্যাত্মিক নৈরাজ্যকে এলিয়ট অনাবৃষ্টির প্রতীকের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করতে চেয়েছেন।

'গেরণশ্যন' কবিতায় চিন্তার কোন পারম্পর্য কিংবা কোন যৌক্তিক সন্নিবেশন ( logical arrangement ) নেই। আছে কেবল বুড়ো লোকটির একরাশ ছেঁড়াখোঁড়া স্মৃতি ও ভাবনা। যে যুদ্ধে সে কখনো অংশ নেয়নি সেই যুদ্ধে যারা বীরের মত মরেছে সে ভাবছে তাদের কথা ( আর সেই সঙ্গে তার মনে পড়ছে প্রাচীন হোমারিক যুগের বীরত্বের কাহিনীও ) :

> I was neither at the hot gates
> Nor fought in the warm rain
> Nor knee-deep in the salt-marsh, heaving a cutlass,
> Bitten by flies, fought.

পরক্ষণেই তার মনে ভেসে উঠছে সাম্প্রতিক সমাজের ভাঙনের ছবি। যে ভাঙনের কথা গেরণশ্যন ভাবছে তা শুধু সমাজেরই ভাঙন নয়, সে ভাঙন ব্যক্তির অন্তর্জগতেরও ভাঙন :

> These with a thousand small deliberations.
> Protract the profit of their chilled delirium,
> Excite the membrane, when the sense has cooled,
> With pungent sauces, multiply variety
> In a wilderness of mirrors.

যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর নৈরাজ্য, হতাশা, অবিশ্বাস, দৈনন্দিন জীবন যাপনের ক্লীবতা ও গ্লানি, ব্যভিচার, হৃদয়হীনতা, আর সেই সঙ্গে অনির্বচনীয় মরমীয়া ( mystical ) শান্তি ও আধ্যাত্মিক মুক্তির ( salvation ) কামনা একটি বিয়োগান্ত নাটকের পরিণতি পেয়েছে Waste Land কবিতায়। Waste Land হয়তো এলিয়টের শ্রেষ্ঠ কবিতা নয়, কিন্তু এটা যে তাঁর সবচেয়ে বহুল প্রচারিত কবিতা তাতে কোন সন্দেহ নেই। অনেকে Waste Landকে দান্তের ( Dante ) কাব্য 'Inferno'-র ( 'নরক' ) সঙ্গে তুলনা করে থাকেন। কিন্তু Waste Land এর নরকের মধ্যে আমরা এক অন্যতর জগতেরও আভাস পাই। কেননা যুদ্ধোত্তর বিধ্বস্ত পৃথিবীর বর্ণনার ফাঁকে ফাঁকে Waste Land-এর পোড়ো মাঠেও হঠাৎ দখিনা হাওয়ার শীতল স্পর্শের মত প্রেম ও সুন্দরের কল্পনা আমাদের উন্মনা করে দেয় কখনো কখনো।

ঐকতানের (orchestra) উৎক্ষেপনের (movement) মত Waste Land পাঁচটি স্বয়ং সম্পূর্ণ পর্বে বিভক্ত। অনাবৃষ্টি ও বর্ষণ, বন্ধ্যাত্ব ও বলাৎকার এবং ধ্বংস ও সামাজিক আচারের সঙ্কীর্ণতা এই পাঁচটি পর্বের উপজীব্য। কিন্তু শেষ পর্বে কবি তাঁর পোড়োমাঠের বন্ধ্যাত্ব ও উষ্ণতার বাইরে উত্তীর্ণও হতে পেরেছেন এক চিন্ময় আনন্দলোকে :

The boat responded
Gaily, to the hand expert with sail and oar,
The sea was calm, your heart would have responded
Gaily......

অনেক বিচিত্র চরিত্র এসে ভিড় করেছে এই কবিতায়। হঠাৎ আলোর ঝলকানিতে আমরা দেখতে পাই সেই বুড়ী জার্মান রাজকুমারীকে, দেখি লিলের (Lil) বিষণ্ণ মূর্তিকে অথবা সেই টাইপিষ্ট মেয়েটিকে (যে একটা ঘেয়ো কেরাণীকে দেহ দান করছে নির্বিকার ভাবে আবেগহীন যান্ত্রিকতায়), দেখি মাদাম সোসোত্রিসকে (Madame sosostries)---মনশ্চক্ষে তিনি ভবিষ্যৎকে দেখতে পারেন ঠিক কাঁচের মত। দেখি স্মার্নার সেই ব্যবসায়ী ইউজেনিডিসকে, অথবা আধুনিক নাগরিক সভ্যতার প্রতিনিধি ভীরু সেই ষ্টেটসনকে। এই ভগ্ন আগোছালো পৃথিবীর সব কিছুকে কবি দেখিয়েছেন টাইরেসিয়াসের অন্ধচোখের দৃষ্টির মধ্য দিয়ে, যেহেতু মানুষের সমস্ত বেদনাকে আগেই পান করে সে হয়েছে নীলকণ্ঠ।

সাম্প্রতিক সভ্যতা ধীরে ধীরে ভেঙ্গে পড়ছে--- **London bridge is falling down falling down falling down** ; আর এই ভগ্নোন্মুখ সভ্যতার অরাজকতার বহু উর্দ্ধে এক অনির্বচনীয় ধ্রুব শান্তি ও সত্যের সন্ধানে সমকালীনতার শস্যহীন অনুর্বর প্রান্তরের পশ্চাদ্‌ভূমি পিছনে রেখে নদীতে ছিপ ফেলে বসে আছে Waste Land এর ধীবর রাজা (Fisher King) :

I sat upon the shore
Fishing with the arid plain behind me
Shall I at least set my lands in order ?
London bridge is falling down falling down falling down
Poi s'ascose nel foco che gli affia
Quands fiam uti chelidon—O swallow swallow
Le Prince d'Aquitaine 'a la tour abolie
These fragments I have shored against my ruins
Why then I'll fit you. Hieronymo's mad again.

দান কর, দয়া কর, সংযত হও ('দত্ত, দয়ধ্বম্, দম্যত')—উপনিষদের এ ওঙ্কার মন্ত্রের মধ্যেই আছে ধীবর রাজার পরমার্থিক খোঁজার পরিসমাপ্তি। তারপর শান্তি, শান্তি, শান্তি। তারপর সব মোহমুক্তি, চিরনির্বাণ:

Datta, Dayadhvam, Damyata
Shantih, Shantih, Shantih.

একথা ঠিক যে এলিয়টের জগৎ ক্ষয়িষ্ণু ও বিশৃঙ্খল; কিন্তু তবুও Waste Land কবিতাটি পাঠকের মনে এর অন্তস্থিত একটা সূক্ষ্ম বিশ্লেষণাতীত (unanalysable) রূপ বা বিন্যাসের (order) চেতনা জন্মায়।

Waste Land-এর পর এলিয়ট যে সব কবিতা লিখেছেন তাতে কবি তাঁর অন্তর্জগতের অনুভূতিকেই প্রাধান্য দিয়েছেন।

The Hollow Men কবিতাটি প্রকাশিত হয় ১৯২৫ সালে। এই কবিতায় এলিয়ট এঁকেছেন একটা ধূসর, নামহীন, নিরবয়ব প্রেতায়িত মৃত্যুর স্বপ্নরাজ্য। Waste Land-এ যে অবাস্তব লণ্ডন শহরের (unreal city) চিত্র বর্ণিত হয়েছে তা হল বোদলেয়ারের প্যারী। কিন্তু The Hollow Men-এ এই বহির্জগত থেকে অনেক দূরে প্রতিসরণ হয়েছে তাঁর। এখানে মূর্ত হয়েছে কবির চরম হতাশা ও নিরালম্বতার অনুভূতি। এদেশের ফাঁপা মানুষেরা হল কুশপুত্তলিকা—খড়ের মানুষ—যাদের ফিসফাস কথাবার্তা শুকনো ঘাসের উপর বাতাসের মৃদু সরসরানির মত ভেসে আসে আমাদের কানে। এই প্রতীকটি নেওয়া হয়েছে Waste Land-এরই শেষ দিক থেকে। The Hollow Men কবিতার প্রতীকগুলোর প্রস্তর কাঠিন্যের মধ্যে কোথাও সৌন্দর্যের লেশমাত্র চিহ্ন নেই, কারণ জীবন্ত মানুষের পৃথিবীতেই তো শুধু সৌন্দর্যের প্রস্ফুটন ও স্থিতি আর আমরা তো এসে পড়েছি এক ছায়াময় ভৌতিক মৃত্যুর জগতে;

Eyes I dare not meet in dreams
In death's dream kingdom.......

কবিতাটি শেষ হয়েছে একটি প্রার্থনায় আর শিশুদের আবোলতাবোল ছড়ার ঝংকারের মধ্যে। Ash-Wednesday-তে আবার কবির প্রত্যাবর্তন ঘটেছে জীবনের দিকে—মৃত্যুর অন্ধকার থেকে জীবনের আলোয়। অনুশোচনা, বৈরাগ্য এবং ধর্মের প্রতি চিৎশক্তির নূতন উৎক্ষেপনের একটা জটিল আবেগ এই কবিতায় লক্ষণীয়:

Suffer us not to mock ourselves with falsehood
Teach us to care and not to care
Teach us to sit still
Even among these rocks,
Our peace in His will.........

**Ash-Wednesday**-র কাছাকাছি সময়ে লেখা **Journey of the Magi** এবং **A Song for Simeon** নাটকীয় একক কবিতা ( **Dramtic Monologue** ) হিসেবে **Gerontion** এর সগোত্রীয়, তবে **Gerontion** কবিতায় যা' নেই তা হল এই যে এই দুটো কবিতাতেই ধর্মকে ( সেটা অবশ্য যীশুর ধর্ম ) সমকালীন সমাজের মুক্তির পথ বলে পরোক্ষ ভাবে তুলে ধরা হয়েছে, এই দুটো কবিতা ছাড়াও এই সময়ে এলিয়ট **Marina** নামে আর একটি কবিতা লিখেছিলেন। এই প্রসিদ্ধ কবিতাটি রাজা পেরিক্লিস্ ( **King Pericles**) এর নাটকীয় একক সংলাপ রূপে লেখা। রাজা পেরিক্লিসের কন্যা অপ্রত্যাশিত ভাবে মৃত্যুর রাজ্য থেকে ফিরে এসেছে জীবন্ত মানুষের দেশে। আর রাজা জীবনের হারিয়ে যাওয়া স্মৃতিগুলি রোমন্থন করছেন এক আনন্দ মিশ্রিত বিষণ্ণতায়ঃ

কত না সমুদ্র কোন্ বালুতীর ধুসর পাহাড় আর কোন্ সব দ্বীপ
কত জল ছল ছল গলুই এর গায়ে
আর বেতসের গন্ধ আর বনদোয়েলের গান কুয়াশাকে চিরে
কতো ছবি ফিরে আসে
হে কন্যা আমার। ( বিষ্ণু দে অনূদিত )

**Burnt Norton, East Coker, The Dry Salvages** এবং **Little Gidding**—এই কবিতা চতুষ্টয় গ্রথিত হয়েছে এলিয়টের **Four Quartets** কাব্যগ্রন্থে। এলিয়টের এই চারটি পৃথক কবিতাকে একটি অখণ্ড কাব্যরূপে বিচার করা সম্ভব। ১৯৩৫ থেকে ১৯৪২ সালের মধ্যে কবিতাগুলো ধীরে ধীরে জন্মলাভ করে। এই চারটি কবিতার চতুরঙ্গে এলিয়ট অনুভূতির এক নতুন প্রগাঢ়তা ও সুনির্দিষ্ট স্থৈর্যে এসে পৌঁছেছেন। **Four Quartets** নিঃসন্দেহে এলিয়টের শেষ শ্রেষ্ঠ কবিকীর্তি **Four Quartets** কাব্যগ্রন্থের বিষয়বস্তুর প্রসারতা বিস্তীর্ণঃ কবির ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার রূপ পরিগ্রহ, ইতিহাসের স্বরূপ, শিল্পীরূপে কবির সমস্যা এবং ভাষার প্রকৃতি। কবিতা থেকে কবিতান্তরে এলিয়টের অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি বিভিন্ন প্রসঙ্গে বার বার পুনরাবৃত্ত হয়েছে। কবির আগের কবিতাগুলোরও অনেক প্রতিধ্বনি ছড়িয়ে আছে **Four Quartets** কাব্যে।

এই প্রতিধ্বনিগুলো কবির আগের বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি নয়, বরং এগুলো তাঁর পূর্বের অসম্পূর্ণ বক্তব্যকে সম্পূর্ণ এবং একত্রীভূত ( integrate ) করেছে।

মুহূর্তের মাহাত্ম্য ও মুহূর্তের নশ্বরতাই তাঁর **Four Quartets** এর মূল বিষয়বস্তু :

The Moments of happiness—not the sense of welbeing
Fruition fulfilment security or affection
Or even a very good dinner, but the sudden illumination—
We had the experience but missed the meaning.
And approach to the meaning restores the experience
In a different form, beyond any meaning.
We can assign to a happiness
(The Dry Salvages)

জীবনের প্রাত্যহিকতার সঙ্গে ক্ষণিক দীপ্তির মুহূর্তগুলোর একটা অন্বয় স্থাপনের চেষ্টা করেছেন এলিয়ট তাঁর শেষ দিকের বিশেষ করে তাঁর শেষ চারিটি কবিতায়। এই ক্ষণিক মুহূর্তের দীপ্তি ভাস্বর হয় সীমিত কালের সঙ্গে অসীম মহাকালের ছেদবিন্দুতে ( **'the point of intersection of the timeless with time'**)। কথার যে অর্থ আমরা বুঝি সে অর্থ অসীমকে প্রকাশ করতে অক্ষম, তাই অনির্বচনীয়কে কথায় ও শব্দে উন্মোচন করতে হলে শব্দের মধ্যে খুঁজতে হবে ভিন্নতর অর্থ। **The Dry Salvages** কবিতায় এলিয়ট বলেছেন :

For most of us there is only the unattended
Moment, the moment in and out of time,
The distraction fit, lost in a shaft of sunlight.
These are only hints and guesses,
Hints followed by guesses ; and the rest
Is prayer, observance, discipline, thought and action.
The hint half guessed, the gift half understood, is Incarnation.

**Four Quartets**-এর কবিতা চতুষ্টয়ের প্রত্যেকটির জন্য এলিয়ট এক একটি কেন্দ্রীয় প্রতীক ( central symbol ) নির্বাচন করেছেন—**Burnt Norton** এর জন্য বায়ু, **East Coker** এর জন্যে মৃত্তিকা, **The Dry Salvages**-এর জন্য পানি এবং **Gidding** এর জন্য আগুন। এই প্রতীকগুলির ওপর অবশ্য বিভিন্ন অর্থদ্যোতনা আরোপ করা চলে। **Four Quartets** এর কবি চেষ্টা করেছেন গতি চঞ্চল বিশ্বের নিবাত, নিষ্কম্প কেন্দ্র বিন্দুতে বসে তার রূপ দর্শনের :

At the still point of the turning world, neither flesh nor fleshless ;
Neither from nor towards ; at the still point, there the dance is
But neither arrest nor movement.
( Burnt Norton )

এলিয়টের এই নৃত্যপ্রতীকের আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁর এক ভাষ্যকার বলেছেন : "শেষ কবিতাগুলোতে এলিয়ট এই প্রতীকের ( জীবনের যে খণ্ড গতির মধ্যে জীবনের সামগ্রিক রূপ এবং জীবনের নৃত্যে সক্রিয় হয়ে ও স্থির বিন্দুতে কবি স্থান কালের ব্যবধান ঘুচিয়ে এবং খণ্ডের মধ্যে বিশ্বের অখণ্ড রূপকে প্রত্যক্ষ করেন—অর্থাৎ এই নৃত্য প্রতীক ) খুবই কাছাকাছি আসেন। তাঁর অস্মিষ্ট-বিষয়সর্বস্ব বা বিষয়-বিষয়ীর দ্বন্দ্বাতীত স্থির বিন্দুটি, স্থিতি যার গতির মধ্যে, অবিচ্ছিন্ন চিৎস্পন্দের মধ্যমণিতে। বিষয়লগ্ন এই দৃষ্টি সম্ভব সক্রিয় চক্রের মধ্যে অস্তিত্ব স্বীকারেই- - - - - এবং এই চক্রবৎ পরিবর্তন তো জীবনেরই গতি যার পরিধির পরে শুধু মৃত্যুরই নেতি নেতি"। কিন্তু "এলিঅটের দ্বন্দ্ব নিরাকৃত হয়নি তার প্রমাণ ভিন্নস্তরের অভিজ্ঞতার ব্যর্থ মধ্যপদলোপী সন্ধি চেষ্টায় গতি ও আপেক্ষিকতা এবং স্থিতিকেন্দ্র অস্বীকারের ব্যপিত ভিত্তিতে"। এবং তাই শেষ পর্যন্ত ধর্মিষ্ঠ মরমিয়াবাদ ( mysticism ) মনের এক সীমাহীন মহাশূন্যতায় পর্যবসিত হয়েছে।

আধুনিক বাংলা কাব্যে এলিয়টের প্রভাব সম্বন্ধে দু'একটা কথা না বললে আমার বক্তব্য অসমাপ্ত থেকে যায়। এলিয়টের প্রভাব আধুনিক বাংলা কাব্যে এসেছিল একটু দেরীতেই। এলিয়টকে নিয়ে বাংলার প্রথম আলোচনা করেন সুধীন দত্ত তাঁর 'কাব্যের মুক্তি' নামক প্রবন্ধে। ১৯২৫ সাল থেকেই বলতে গেলে এলিয়ট পরিচিত হতে থাকেন বাঙালী পাঠকের কাছে।

"এলিয়টের কাছে বাংলা লেখকদের ঋণগ্রহণ মুখ্যত আত্মসচেতনতার ক্ষেত্রে। - - - - - সাহিত্যের ইতিহাস যে স্বকীয় রচনায় ও তার বিবেচনায় প্রাণবান ব্যাপার সে বোধও এলিঅটের সাহায্যে তীব্র হল। তিনি আমাদের সাহিত্যে অর্থাৎ একপ্রকার কর্মের দীক্ষায় ব্যাপ্তি ও গভীরতা বর্ধন দুইই করেন"।

আধুনিক বাংলা কাব্যে এলিয়টের ফলশ্রুতি হল আমাদের কবিদের আত্মসচেতন মনন এবং আমাদের মধ্যে আমাদের প্রাচীন ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধার পুনরুজ্জীবন। এলিয়টের প্রভাব কেবল এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। আধুনিক বাঙালী কবিদের কেউ কেউ এলিয়টী ঢঙের অলংকার, নির্মিতি এবং রূপকল্পও ব্যবহার করেছেন তাঁদের কবিতায়। বিভাগপূর্ব বাঙালী কবিদের মধ্যে সুধীন দত্ত, বিষ্ণু দে, অমিয় চক্রবর্তী, বুদ্ধদেব বসুর নাম করতে হয়। পূর্ব পাকিস্তানের কাব্যসাহিত্যে আবুল হোসেন, সৈয়দ আলী আহসান, শামসুর রাহমান এবং আরো কয়েকজন কবির উপর এলিয়টের প্রভাব লক্ষণীয়। তবে সামগ্রিকভাবে চিন্তা করলে পূর্ব পাকিস্তানের কাব্যসাহিত্যে এলিয়টী প্রজ্ঞা ও কাব্যাদর্শ বোধ হয় অনুশীলনের অভাবেই তেমন একটা শক্তিশালী প্রভাব সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়নি এখনও।

# নজরুল ও তাঁর একটি কবিতা

হাসনা বেগম

বিশ শতকের এক অসম্ভবের সম্ভাবনাময় যুগে নজরুলের আবির্ভাব। সে যুগ-আগুনের লেলিহান শিখায় তিনি দগ্ধ হয়েছিলেন---তাই বীণাতে আগুন জ্বালিয়ে বাঁশীর সুরে বিষ ঢেলে তিনি 'বিদ্রোহী' সেজেছিলেন---'ধূমকেতু' হয়ে 'সৃষ্টিকে' তিনি 'উল্টাতে' চেয়েছিলেন। নিপীড়িত মানুষের হয়ে 'ফরিয়াদ' তিনি জানিয়েছেন। 'অনিয়ম উচ্ছৃঙ্খল' হয়ে সকল 'বন্ধন'কে অগ্রাহ্য করেছেন---কিন্তু এ-'বন্ধন' 'দলে' যাওয়া তার নতুন সৃষ্টির জন্যে—মুক্ত জীবন আস্বাদনের জন্য।—

"ধ্বংস দেখে ভয় কেন তোর?
আসছে নবীন---জীবনহারা অসুন্দরের করতে ছেদন
তাই সে এমন কেশে বেশে
প্রলয় বয়েও আসছে হেসে
মধুর হেসে,
ভেঙ্গে আবার গড়তে জানে
সে চির সুন্দর।"

তাঁর ভাঙ্গার গানে নব সৃষ্টির সঙ্কেত পেয়ে জাতি সেদিন নজরুলকে বরণ করে নিয়েছিল তাঁদের প্রতিভূরূপে, সেদিন বহু বিশেষণে কণ্টকিত হয়েছিল নজরুলের কবি আখ্যা। কিন্তু এমন দিন যদি সত্য আসে---

"যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন রোল
আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না
অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ
ভীম রণভূমে রণিবে না"।

*সেদিনও 'চিরযুগের কবি' হিসেবে নজরুলকে আমরা কি খুঁজে পাবো না? —বহু বিশেষণের আড়ালে কবি নজরুল যে হারিয়ে যেতে পারেন না, তার অসংখ্য পরিচয় ছড়িয়ে রয়েছে নজরুলের 'দোলনচাঁপা', 'সিন্ধুহিন্দোল', 'ছায়ানট', 'চক্রবাক' কাব্যগ্রন্থে।

শিল্পী নজরুল তাঁর অন্তর্লীন, নিঃসঙ্গ, উদাসী অস্তিত্বকে, তাঁর আত্মশক্তিকে সন্ধান করেছেন। নজরুলের সৃষ্টি তাঁর আত্মসৃষ্টি---তাঁর সাহিত্যকীর্তি তাঁর আত্মারই মুক্তি। সীমাহীন দুঃখযন্ত্রণার দাহে আর্ত, অথচ পূর্ন, তৃষ্ণায় চিরউন্মুখ কবি দুর্মদ, দুর্দম, অশান্ত তাঁর প্রাণের পেয়ালা ভরিয়ে তুলতে চেয়েছিলেন আনন্দের সরাব দিয়ে। বেগম সামসুন নাহার মাহমুদকে একটা চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন ---

"আমার পনের আনা রয়েছে স্বপ্নে বিভোর, সৃষ্টির ব্যথায় ডগমগ। ----আর এক আনা করছে পলিটিক্স্, দিচ্ছে বক্তৃতা, গড়ছে সঙ্ঘ"। কিন্তু "নদীর জল চলেছে সমুদ্রের সাথে মিলতে"। তাঁর শেষ দিকের 'পথচারী' কবিতাতে উল্লেখিত সেই 'লোনা সমুদ্রে'র সাথে মিলিত হবার উদ্দেশ্যে তাঁর যাত্রা। পথচারী কিন্তু উদাসী, ---সেই উদাস পথিক কবি সত্তার প্রকাশ তাঁর দোলন চাঁপার 'পথহারা' কবিতায়---

"বেলা শেষে উদাস পথিক ভাবে
সে যেন কোন অনেক দূরে যাবে"।

জীবনের যাত্রা শুরুতেই বৈরাগ্যের সুর----নজরুল-জীবনটাই এমনি বৈপরীত্যে ভরা। গেরুয়া বসন নাকি অন্যকে 'বিভ্রান্ত' করার জন্যেই পরতেন, কিন্তু সে গেরুয়া রঙের ছাপ যে তাঁর মনেই। তাঁর ভাবনা অনেক দূরে যাবার---

"ঘরে এস' সন্ধ্যা সবায় ডাকে,
'নয় তোরে নয়' বলে একা তাকে;
পথের পথিক পথেই বসে;
জানে না সে কে তাহারে চাবে।
উদাস পথিক ভাবে"।

সবার বাঁধাধরা পথ কবির নয়---তাঁর যাত্রা পথের সঙ্গী কেউ আছে কিনা তাও তাঁর জানা নেই---শুধু দূর পথের দিকে লক্ষ্য তাঁর।

"বনের ছায়া গভীর ভালবেসে
আঁধার মাথায় দিগ্‌বধূদের কেশে,
ডাকতে বুঝি শ্যামল মেঘের দেশে,
শৈলমূলে শৈলবালা নাবে---
উদাস পথিক ভাবে"।

যখন আঁধার ঘনিয়ে আসবে তখন তাঁর মর্ত্য প্রিয়া নয়, 'শ্যামল মেঘের দেশের শৈলবালা'ই হয়ত বা তাঁকে আহ্বান জানাবে।

পথের শেষে তার প্রাপ্তি নিয়ে কোন সংশয় কিন্তু এই পথিকের মনকে ভারাক্রান্ত করে না। এই পৃথিবীতেই কবির আকর্ষণ রয়েছে, যেখানে—

"বাতি আনে রাতি আনার প্রীতি,
বধূর বুকে গোপন সুখের ভীতি,
বিজন ঘরে এখন যে গায় গীতি",—

কিন্তু উদাস পথিকের মন সেখানেও আশ্রয় পায় না—কারণ, সে যে চির একা। কাজেই—

"একলা থাকার গানখানি সে গাবে
উদাস পথিক ভাবে"।

একলা থাকার গান গাইবেন তিনি এটাই তাঁর ভাবনা কিন্তু ব্যর্থতা আসে তখন, যখন—

"হঠাৎ তাহার পথের রেখা হারায়,
গহন বাঁধার আঁধার বাঁধা কারায়,
পথ-চাওয়া তার কাঁদে তারায় তারায়"

পথের চিহ্ন যায় হারিয়ে, তখন—

"আর কি পূবের পথের দেখা পাবে
উদাস পথিক ভাবে"।

আঁধার পার করে কোন জ্যোতির্ময় বিন্দু তাঁকে পথ দেখাবে না—পথ চাওয়া তার তারায় তারায় কেঁদে ফিরবে কিন্তু তার ব্যর্থতাবোধও চরম আর্তনাদ হয়ে ফেটে পড়ে না, তার চরম ভাবনারও প্রকাশ নিরাসক্ত ভাবেই। বহু ঝড়-ঝঞ্ঝার শেষে 'পথচারী' কবিকে আমরা পথ চলতে দেখেছি কিন্তু সেখানে পথ চলার শেষে তাঁর চির উদাস মন যেন আশ্রয় খুঁজেছে 'লোনা সমুদ্রবারি'র মধ্যে। আর তার পরেই কবিকে বলতে শুনি—

"আপনারা জেনে রাখুন আল্লাহ্ ছাড়া আর কিছুর কামনা আমার নেই"।

(১৯৪১, ১৬ই মার্চ যশোর।)

# মধ্যযুগের কাব্যে সমাজচিত্র ও সাংস্কৃতিক ভাবনা ঃ চণ্ডীমঙ্গল

মনিরুজ্জামান

দেবপুত্র নীলাম্বর চণ্ডীপূজার নিমিত্ত অভিশপ্ত হন ; পৃথিবীতে তার পরিচয় কালকেতু ব্যাধ। স্বর্গীয় বৈভবরিক্ত এক অতি সাধারণ মানবশিশু সে। কিন্তু পরিবেশ, চরিত্র-সামঞ্জস প্রকৃতি, দেহাকৃতি সব যেন এক তরুণ মানব সন্তানের। মানুষের এক আশ্চর্য সম্ভাবনাকে যেন খোদাই করে নির্মাণ করা হোল। এতটুকু মানবেতর চিন্তা এর নির্মিতিকে কলঙ্কিত করল না। মধ্যযুগকে মৃত্তিকার রঙ-এ, জীবনের মূল্যে নতুন আবিষ্কার করা হোল মুকুন্দরাম কল্পিত এক অভিশপ্ত দেবজীবনের মধ্যে। সেই সঙ্গে মানুষের প্রতি, জীবনের প্রতি প্রগাঢ় ভালবাসা হেসে উঠল। জীবনের এত বড় বিস্তৃতি আর বুঝি ঘটেনি।

শিশু কালকেতু 'শশারু তাড়িয়ে ধরে', স্বভাবতই সে 'শিশুমাঝে যেমন মণ্ডল'---আর যৌবনে তার 'দুই বাহু লোহার শাবল'। তার দৈহিক বৃদ্ধি শশীকলার ন্যায় নয়---'বাড়ে যেন শালকোড়া', অঙ্গাভরণেও তেমনি---বুকে ব্যাঘ্র নখ; কটিতটে ত্রিবলী, কণ্ঠে জালের কাঠি, হস্তে শিকারীর লোহার শিকলি। হাঁড়ি হাঁড়ি ভাত, নেউল পোড়া, কাঁকড়া ইত্যাদির ওপরও স্ত্রীর অংশে তার লোভ।

"চার হাঁড়ি মহাবীর খায় খুদ জাউ,
ছয় হাঁড়ি মসুর সুপ মিশাইয়া লাউ"।

এই চরিত্র মধ্যযুগে অতিশয় জীবন্ত। এই কারণে এই চরিত্রকে নায়কের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত রেখে নিদ্বিধায়, নির্বাধায় বর্ণনা দেন কবি—

"শয়ন কুৎসিৎ বীরের ভোজন বিকার
... ... ... ... ... ... ... ...
গ্রাসগুলি তোলে যেন তেআঁটিয়া তাল,"

এই চরিত্রকে, এই দেবসম্ভব মানুষকে চকচকে মাঝাঘসা করে দেখাবার লোভ কবি কিভাবে সম্বরণ করলেন? যৌবনে তার দৌরাত্ম্যের কি জীবন্ত পরিচয়ই কবি এঁকেছেন। আবার তার দুরন্তপনার পথে ভাগ্যদেবী যেদিন অপ্রসন্ন হলেন, পথে পথে অমঙ্গলচিহ্ন—মঙ্গলবিনাশী করালী ছায়া মেলে ধরলেন—সেদিন একটি গোসাপ মাত্র সমস্ত থমথমে পরিবেশটাকে নিশ্চিন্তে নিজের খোলসের মধ্যে শোষণ করে নিয়ে কিভাবে কালকেতু চরিত্রের প্রথম বিষ্ময়, প্রথম হতচকিত প্রাণের ব্যথা, একটা মধুর সরলতা, একাকীত্ব এবং মূর্খতাকেও পাঠকের চোখের সামনে তুলে ধরলেন, সে কি কম বিস্ময়!

এখানেই, এই বৈষম্যেই জন্ম নিল নায়কের প্রথম সচেতনতা। 'বড়র বহুরী·····বড় লোকের ঝি'কে প্রকাশ্য সরলতায় উক্তি করলেন 'শ্মশানসম ব্যাধগৃহে প্রবেশে উচিত হয় স্নান'। এলো তার স্বতঃপ্রবৃত্ত নৈতিক সাবধানতাও। এবং চণ্ডীর আত্মপরিচয় জেনেও তাই অবশেষে আপন বিশ্বাস ও পরিবেশগত ধারণা থেকে কালকেতুর মুক্তি ঘটেনা—

> "হিংসামতি ব্যাধ আমি অতি নীচ জাতি
> কি কারণে মোর গৃহে আসিবে পার্বতী"।

হয়ত কালকেতু আপন অকিঞ্চিৎকর জন্মকে সার্থক ভেবে তার জীবনের বিস্তৃতিকে আকাঙ্খা করল। কিন্তু কবির কৌশলে চণ্ডীর কাছে প্রার্থনায় কালকেতুর সংস্কার তথা তার ব্যক্তিচরিত্র ও সমাজ প্রতিবেশই অসাধারণ মূল্যে উজ্জীবিত হয়ে উঠল। কালকেতুর সমাজ অতিশয় বাস্তব হয়ে উঠল এই ভাবে।

মুকুন্দরামের সমাজচিত্র অঙ্কন তথা সাংস্কৃতিক ভাবনা প্রধানতঃ এই কালকেতু চরিত্রকে কেন্দ্র করে সার্থক হয়েছে। অবশ্য কালকেতুতে কবি-কল্পনার খর্বতা আছে—এই কথা স্বীকার করতে হয়। সমগ্র কাহিনীতে ও চরিত্রের পরিণতিতে কোন কল্পনা বিনোদনের আকাঙ্খা নেই। কিন্তু যা আছে তা এক অতিশয় সারবান জীবন, নতুন করে বাঁচার এক দুরাকাঙ্খা, এক জীবনের সীমানার চিত্র। নানাবিধ বিপরীতধর্মী চরিত্র অঙ্কনে কবির সেই অভিজ্ঞতার পরিসর আমাদের অতিশয় সন্নিকট বলে অনুভব করা যায়।

মুকুন্দরাম জীবনকে লক্ষ্য করেছেন সংগ্রামের ক্ষেত্র হিসাবেই। তাঁর চরিত্র চয়ন ও নির্মাণ কৌশলের অন্তরালে এই দৃষ্টিভংগীই সজীব। স্বগ্রাম ত্যাগের ও বারবার লাঞ্ছনা ভোগের করুণ অভিজ্ঞতায় তিনি জেনেছেন, সাধারণ মানুষের জীবনের দুঃখ, আর্তি ও

সঙ্গের পীড়া। কবি এর রাজনৈতিক ব্যাখ্যাও দিয়েছেন, দেশকালের অবস্থা বর্ণনা করে। আবার সাংস্কৃতিক জীবনে নগরপত্তনাদির ন্যায় ঘটনা কতটা উৎসাহ-ব্যঞ্জক ও আকাংখিত তার চিত্রও আছে।

দেশের অনেকাংশই তখন হিংস্র পশুপক্ষীতে পূর্ণ, জঙ্গলময় অবস্থিতি; মৃগচারীদের সেখানে বাস। বন্যজন্তুদের সংগে সংগ্রাম একটি সাধারণ ঘটনা—পশুদের সংগে কালকেতুর যুদ্ধে সেই সত্যই প্রকট হয়ে ধরা পড়ে

জঙ্গলে নগর স্থাপনের চেষ্টাও যে না হত তা নয়। দুষ্কর্ষজন আপন পরাক্রমে যে কাজ সাধন করতেন, তখন তাঁর অধিকার কিংবা সার্বভৌমত্বের প্রশ্ন দেখা দিত—রাজার সংগে বিবাদমান এমনি দলের পরিচয় খুবই পাওয়া যেত।

দেশে শান্তির চেয়ে প্রবলের অত্যাচার মধ্যযুগীয় চরিত্র প্রকাশক সত্য ছিল। সাধারণ মানুষের জীবনের অনিশ্চয়তায় সেই সর্বত্র বিরাজমান অত্যাচারের পরিচয় জানা যায়। এই অবিচারের অবসান কাম্য হয়ে উঠেছিল বলেই চণ্ডীগান এত জনপ্রিয় হতে পেরেছিল।

কলিঙ্গরাজ্যে গুজরাট নগর পত্তনে বাংগালীর বাস্তুজ্ঞান ও শৃংখলার পরিচয় পাওয়া যায়। নব প্রতিষ্ঠিত নগরে বহু কিছুর ব্যবস্থা থাকতে হোত, প্রতিষ্ঠানাদিও গড়ে উঠতো। খিলানের প্রচলন হয়ত তখনও হয়নি, দরজার মাথায় ঝনকাঠের উপর 'বাউটি পাথর' বসিয়ে দেয়াল করার বর্ণনা তাই দিয়েছেন কবি। রাজপথে পাথর থাকত, আর 'কুমারে পোড়ায় পাজ্যা, নানা ইট পোড়ে সাবধান'। বিভিন্ন পেশাপেশীদের জন্য বিভিন্ন পাড়া ছিল নির্দিষ্ট; মুসলিম পাড়ায় বিভিন্ন ছাঁদের মসজিদ দেখা যেত। দীঘল মন্দির, সরাইখানা, কূপ ও অন্যান্য জলাশয় পথিক ও অস্থায়ী বাসিন্দাদের উপযোগী করে প্রতিষ্ঠিত হোত।

আইন ও দেশকর্তা ছিলেন রাজা. রাজার প্রকৃতি অনুযায়ী দেশজনের সুখ ও অবস্থ নির্ভর করতো। রাজা সংস্কৃতমনা হলে বা ধর্মপ্রবণ হলে দেখা যেত দরবারে—

"পণ্ডিত পুরান পড়ে স্তব করে ভাটে
গায়ক গাইছে গীত, নর্তকীরা নাটে"।

পার্বনী, পঞ্চক, বাঁশগাড়ী, সেলামী, ওয়া করাদি রাজার আদায় ছিল। রাজাজ্ঞায় সওদাগরগণ বাণিজ্যে যেতেন, স্বেচ্ছায় গেলেও অনুমতি নিতে হোত।

রাজকর্মচারীদের বিশদ বিবরণ দিয়েছেন মুকুন্দরাম। প্রকৃতপক্ষে তারাই চালাতো শাসন। ফলতঃ ঘুষ একটা নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে উঠেছিল সে সময়। এই 'ধুতি খাওয়া'-কর্মচারীরা ইচ্ছা করলে প্রজার সুখ বিনষ্ট করতে পারত, সুখ সৃষ্টিও করতে পারত। প্রাণদণ্ড, নির্বাসন, মস্তকমুণ্ডন করে ঘোলঢালা, পাঁচচুড়া করা, মুখে চুনকালি লেপে দেওয়া প্রভৃতি ছিল শাস্তির নিয়ম। অভিযুক্তকে দেখি 'গলায় কুঠার বান্ধি মাগিল গোহারি'। সেনাপতি কর্মচারীদের মধ্যে মুসলমানও থাকত। কোটালের কাজ ছিল নির্দিষ্ট সংবাদ জানা। গুপ্তচরেরা সন্যাসীবেশে পররাষ্ট্রের খবর আনত। পাইক হোত বাগদী, হাড়ী, ডোম শ্রেণীর লোকেরাই। পদাতিক, গজারোহী, অশ্বারোহী সৈন্য থাকতো, তারা তীর, ধনুক, তলোয়ার , বল্লম, বন্দুক, কামান ব্যবহার করতো; ঢাল নিয়ে বর্মাবৃত হয়েও যুদ্ধ করতো।

সাধারণ মানুষ ধর্মপ্রবণ হোত। ভাড়ু দত্ত, বুলান মণ্ডলের দলও অতি কম ছিল না। হিন্দু ও মুসলমানগণ যথা নিয়মে ধর্মাচরণ করত। কোরাণ পাঠের উল্লেখও আছে। নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুরা ষষ্ঠিপূজায় বলি দিত। সন্তান জন্মালে একুশ বা একত্রিশ দিনে অথবা একমাস পরে ষষ্ঠিপূজা দেওয়া হোত। হিন্দুদের মধ্যে জাতিভেদ প্রথা ছিল প্রবল। দাস, কৈবর্ত, কলু, বাইতি, বাগদী, মাছুয়া, কোচ, ধোবা, দরজী, শিউলী, ছুতার, পাটনী, ডোট, চৌদুলী, চুনারী, মাঝি, ডোম—এরা ইতর জাতি। হাঁড়িরা খুব মদ্যপ ছিল বলে জানা যায়। নীচ জাতি ধনী হলেও তার সামাজিক মর্যাদা বাড়তো না।

'নীচ কি উত্তম হয় পাল্যে মহাধন'।

তবে এদেরকে লোকে ভয় করে চলতো। কুলীনেরা অকুলীনের বাড়ীতে গেলে নিজেরাই রন্ধন কার্য করতো।

সামাজিক অনুষ্ঠান হোত অনেক। জন্ম, বিবাহ, শ্রাদ্ধ প্রভৃতিতে; সুপ্রসবে, সন্তানের কল্যাণকামনায়; নামকরণে, কর্ণভেদ প্রভৃতিতে পানি পড়া, ফুঁক থেকে আরম্ভ করে অন্যান্য যথাবিধি ধর্মীয় অনুশাসন মানা হোত। বিবাহে ঘটকালি করতেন পুরোহিত। সুবংশে বা উচ্চকুলে সন্তান দান লক্ষ্য থাকতো। বল্লালী কুলীন প্রথার খুব প্রচলন ছিল। ফলে এর কুফল লক্ষ্য করা গেছে অনেক। মেয়েদের যেমন ১২।১৩ বৎসর বয়সের আগেই বিয়ে দেওয়া হোত, তেমনি ছেলেদের ২৫ বৎসর পর্যন্ত অবিবাহিত থাকাও বিস্ময়ের বিষয় ছিল। যেমন,

''ভাড়ুর এক ভাই ছিল, নাম তার শিবা।
পঁচিশ বৎসরের হৈল নাহি হয় বিভা''।।

বিয়েতে পণ এবং যৌতুক উভয়ই ছিল—বর-কনে উভয়েই যৌতুক লাভের অধিকারী হত। আশীর্বাদী, জলসাধা, স্ত্রী আচার, মেয়ের পিঁড়িআসন ও বর প্রদক্ষিণ, শুভদৃষ্টি, গাঁটছড়া, জামাতার চরণে শ্বাশুড়ীর দধি ঢালা, ফুলশয্যা প্রভৃতি ব্যবস্থা ছিল। বিয়ে করে বর বধুকে নিয়ে বাড়ী ফিরলে শ্বাশুড়ী ও অন্যান্য এয়োগণ এসে বরণ করতো। স্বামীবশীকরণের তুকও ছিল। নিম্ন সমাজে সম্ভবত এক বিয়েই হোত, কিন্তু উচ্চ সমাজে বহু বিবাহেরই রেয়াজ ছিল।

উচ্চ বংশীয় বা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সংগে সাক্ষাতে এবং রাজসন্দর্শনে ভেট প্রয়োজন হোত। এসব লোক গরীবদের বেগার খাটাতে দ্বিরুক্তি করতেন না।

গরীব ও সাধারণ লোকেরা খুঞার বসন পরিধান করতে ভালবাসতো। ধনীগৃহিনীরা নেতের কাপড় তসর দোছুটি করে পরতো। কাঁচুলীতে নানা চিত্র আঁকা বা সেলাই থাকতো। গুয়ামুটি বা কানড় ছাঁদে খোঁপায় পাটের জাদ ও জাল ব্যবহৃত হতো, কবরী সাজানো, ফুল গোজার খুব প্রচলন ছিল। মেঘডম্বুর কাপড় ও পাটের শাড়ীর ব্যবহার ছিল খুব। আর গায়ে 'পরিবারে খুঁঞা উড়িতে খোসলা'—খোসলা কাপড়ের নাম ছিল। পুরুষেরা পাগড়ী বাঁধতো, সম্ভ্রান্তলোক বলে পরিচয় দিতে অনেকের ধুতির কোচা মাটিতে গড়াতো। গায়ে অঙ্গরাখি পরত কদাচিৎ; জুতা ছিল—

'চরণে পাউড়ি সাধু চলিলা শয়নে'।

পান খাওয়া মুখ বড় মানুষের লক্ষণ। 'বাটি ভরি বীড়াগুয়া, কুঙ্কুম কস্তুরী চুয়া, সুগন্ধি প্রসূণ মদলেখা'।

চুড়ি, পাশুলি, কণ্ঠমালা, হার, গজমতি হার, হেম-মুকুলিকা, নূপুর, 'সুবর্ণের কড়িমাছি' কুলুপিয়া শঙ্খ (তাতে গালা রং করে নামলেখা হোত—'শ্রীরামলক্ষ্মণ': 'সেই মত ছিল শঙ্খ শ্রীরামলক্ষ্মণ') নূপুর, রজত পাশুলি প্রভৃতি ছিল ব্যবহৃত অলঙ্কারের মধ্যে প্রসিদ্ধ।

মুকুন্দরাম প্রায় নিখুঁত পূর্বপরিকল্পনায় একে একে বর্ণনা করে গেছেন এসব। কাহিনীকে নির্মাণ করেছেন এই উপাদানে। কবিকংকনের বর্ণিত ঘটনা সেখানে কেন্দ্র বিহীন একটি চরিত্রোপাখ্যান, এবং উক্ত চরিত্রেরও পরিণতি বা পূর্বাপর সঙ্গতি নেই। কবি-কল্পনার স্বেচ্ছাচারিতা ঘটেছে সেখানে। মুকুন্দরামও কালকেতুর ব্যাধজীবনে জন্ম-গ্রহণের মাহাত্মকে সর্বক্ষণ টেনে রাখার শক্তিকে কোথাও খুঁজে পাননি অতএব কাহিনীর বিস্তার ঘটেছে ভিন্ন একটি কেন্দ্রে। কেননা স্বর্গের শিশুকে

স্বর্গে প্রেরণ তাঁর দায়িত্বও বটে ছিল। কিন্তু মঙ্গল কাব্যের আবেষ্টনী রামের ন্যায় আদর্শ জীবন ও চরিত্র চিন্তাকে প্রশ্রয় না দিলেও যে চরিত্র নিয়ে তা সন্তুষ্ট ছিল, মুকুন্দরাম তাকে অন্যান্য কবির ন্যায়ই সৃষ্টি করেন নি—তাকে পেয়েছেন তিনি আপনার অজানিত চিত্তব্যাকুলতায়, সন্ধান প্রয়াসেও। অন্ততঃ সন্ধানে তিনি কালকেতুর চতুস্পার্শ পরিভ্রমণ করেছেন, কেন না সেখানে সৃষ্টি অপেক্ষা সৃষ্টির উপকরণাদি জীবনকে আরো মথিত করেছে। তার প্রতি কবির সহানুভূতি ছিল সম্পূর্ণ। যে সমাজ চিন্তার প্রকাশ ওপরে ঘটেছে দেখতে পাই, তার কাছে কবির অন্তরাত্মা সঁপে দেওয়া ছিল।

কালকেতু হয়ত ম্লান হয়েছে সেখানে, ভাঁড়ু ও মণ্ডলের প্রভাব সেখানে দারুণ আঁচড়ে নিয়েছে---তবু কেবল ভাঁড়ু বা বুলান এত বড় ভিত্তিটাকে কি ধরে রাখতে পারতো ? যে সমাজকে কবি নীরিক্ষণ করে নির্মাণ করেছেন, তাঁর সর্বত্র একটা নষ্ট চরিত্রের গমনাগমন সম্ভব ছিল না। ধর্মাকুলতা কবির প্রবল না হলেও, সহানুভূতি বা সহৃদয় দৃষ্টি কবির ছিল। বিশ্লেষণ ক্ষমতাকে কবি তাই সংগে সংগে রাখেননি অথবা অর্জনই করেন নি—তবু দেখি এক বিশেষ সমাজচিন্তা ও পরিবেশচিত্র তার কাহিনী ও চরিত্র নির্মিতিতে আশ্রয় নিয়েছে—একটা গতানুগতিক কাহিনীর কাঠামো সেখানে কি দুর্বার কান্নায়ই না ভেংগে খান খান হলো। কালকেতু সেই সমাজচিন্তা বা বক্তব্যকে গ্রহণ করেই দেব সম্ভাবনাকে নিজেই মিথ্যা প্রতিপন্ন করল।

# আমেরিকার নাট্যসাহিত্য

রণজিৎ কুমার চক্রবর্তী

সাহিত্যিক মূল্য বিচারে ইংরেজী নাট্যসাহিত্যের সাথে আমেরিকান নাট্যসাহিত্যের তুলনা শুধু যে অমূলক তা নয় অবান্তরও বটে। ইংরেজী নাট্যশৈলীর বিস্তৃতি আর গভীরতা পাঠক মাত্রকেই বিস্মিত করে—এর কাব্যিক গুরুত্ব অপরিসীম; খালি মঞ্চের সাথে যে তার সম্পর্ক তা নয়, মানুষের "হৃদয়ের তারে তারে, প্রাণের শোনিত ধারে" তার আবেদন। আমেরিকার নাট্যসাহিত্যের সাথে আধুনিক ইংরেজী নাট্যসাহিত্যের একটি যোগ আছে—তুলনাও চলে। অতি সহজবোধ্য কারণেই এলিজাবেথীয় ও ভিক্টোরীয় নাটকের সাথে প্রারম্ভিক ও মধ্যকালীন আমেরিকান নাটকের যোগসূত্র খুবই ক্ষীণ। উপরোক্ত কথাগুলো থেকে যদি এ' ধারণা সৃষ্টি হওয়ার অবকাশ থাকে যে পৃথিবীর নাট্য সাহিত্যে আধুনিক আমেরিকার অবদান উল্লেখযোগ্য নয় তবে পরিষ্কার ভাবে এটুকু বলা চলে যে আধুনিক পৃথিবীর নাট্যজগতে আমেরিকা, মানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা লক্ষ্য করার ও আলোচনা করার এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

ইংলণ্ডের লাইফ বলতে আমরা বুঝি গত পাঁচশত বছরের ইতিহাস, আর যুক্তরাষ্ট্রের লাইফ মাত্র গত সত্তর বছরের কথা। অবশ্য অতি নগন্য ভ্রূণ আকারে যুক্তরাষ্ট্রে নাটক দেখা দিয়েছিল ১৮৬০ সালের দিকে। যে ক্ষীণ ধারা অতি শ্লথ গতিতে এগিয়ে চলতে থাকলো উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধের প্রারম্ভে তা' প্রথম জোয়ারের মুখ দেখলো ১৮৮৮ সালে ইউজিন ও'নীল-এর শুভ আবির্ভাবে। ও'নীল আমেরিকান নাট্যজগতের ভগীরথ।

আমেরিকান নাটকের আদিকথা ভাঁড়-যাত্রা, রঙ্গ-অভিনেতাদের অমার্জিত অঙ্গভঙ্গী ও অসংস্কৃত কথোপকথন যা অনেকাংশে সাহিত্যিক মূল্য বর্জ্জিত বলা চলে। নাটকের প্রারম্ভিক স্তরে নিগ্রো চারণ কবি ও অভিনেতার অবদানও অনস্বীকার্য্য। আমেরিকান

নাটকের অসংস্কৃত আদিরূপ ঐতিহাসিক সত্যের স্বাক্ষর। বাহির থেকে আমদানী করা চলে পণ্য, কিন্তু সাহিত্য নিজের দেশের মাটিতে গড়ে উঠে। তখনই হয় তার সাথে দেশের নাড়ীর যোগ। তাই স্বদেশের মাটির গন্ধের ছোঁয়ায় নতুন নাটকের জন্ম নিতে একটু সময় লেগেছিল। এতে ঐতিহাসিক স্বাভাবিকতার পরিচয় মেলে। এটাও ভুললে চলবে না যে মিরাক্‌ল্‌ ও মোর‍্যালিটির ঘূর্ণী থেকে পূর্ণমুক্তি পেতে ইংরেজী নাটকেরও বেশ সময় লেগেছিল। ইংরেজী নাটকের নয়নসুভগরূপ একদিনে হয়নি। একটি শেক্সপীয়র শত শত পূর্বসূরী নাট্যকারের অতন্দ্র সাধনার মূর্ত সিদ্ধি।

অন্যান্য অনেক দেশের নাট্যসাহিত্যের মত আমেরিকার নাট্যসাহিত্যের গোড়ার দিকে এমন একটি যুগ ছিল যখন প্রযোজক আর অভিনেতারাই ছিল প্রধান —তারাই জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করত আর অবহেলিত নাট্যকার নিত বিস্মৃতিকে বরণ করে। সেই জন্যে দেখা যায় এডুইন ফরেস্ট্‌, বুসিকল্ট, জেফারসন্‌ আর বেরীমোরদের নাম কিংবা অভিনেতা-পরিচালক বেলাস্কোর খ্যাতি আমাদের স্মৃতিতে যতটুকু প্রোজ্জ্বল তদানীন্তন কোন নাট্যকারের নাম ততখানি নয়। মাত্র শ' খানেক বছর আগেকার নাট্যকারদের অনেকেরই নাম গবেষণা করে বের করতে হয়েছে। প্রথমযুগে, এমনকি উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকেও আমেরিকায় ইউরোপ থেকে আমদানী করা নাটকই অভিনীত হোত।

আমাদের মনে আছে ১৮৬৫ সালের সেই বিষণ্ণ সন্ধ্যার কথা, সেই নাটক 'Our American Cousin', যার লিখক হলেন টম্‌ টেলর্‌ আর সেই মহামানব লিঙ্কনের কথা। লিঙ্কন এই নাটকের অভিনয় দেখছিলেন। সর্ব্বনাশা গৃহযুদ্ধের অবসান হয়েছে। লিঙ্কন নিরুদ্বেগে যখন অভিনয় দেখছিলেন—এমন সময় আততায়ীর গুলিতে তিনি হলেন নিহত। লিঙ্কনের সাথে সাথে অমর হলো এল্‌কিস্‌ বু'থ, নাটক 'Our American Cousin', আর নাট্যকার টম্‌ টেলর। উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো এই যে টম্‌ টেলর আমেরিকান নাট্যকার নন। তিনি হলেন একজন খাঁটি ইংরেজ।

তখন একটা ঝোঁক ছিল নামকরা উপন্যাসের নাট্যরূপ দেওয়ার চেষ্টা। 'চেষ্টা' বলছি এই জন্যে যে তৎকালীন আমেরিকায় উপন্যাসের কৃতকার্য্য নাট্যরূপ উল্লেখযোগ্য নয়। মিসেস্‌ হেরিয়েটের 'টম কাকার কুটির'-এর কয়েকটি নাট্যরূপ এ সময়েই দেওয়া হয়েছে। নাট্যজগতে মৌলিক প্রচেষ্টা আমেরিকায় এখনও হয়নি। আমেরিকা তখন খুঁজছিল একজন ইবসেন্‌। ১৮৮১ সালে যুগস্রষ্টিকারী 'গোষ্ট্‌'

মঞ্চে আবির্ভূত হলো—সারা ইউরোপে পড়ল সাড়া। স্কেণ্ডিনেভিয়া হলো পূর্ব ইউরোপের নাট্যগুরু। আমেরিকা তখনও নীরব। ১৮৮৮ সালে ষ্ট্রিণ্ড্বুর্গ দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন 'মিস্ জুলী' দিয়ে। আমেরিকায় তখন বেলাস্কো তার সীমিত নাট্যপ্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন মাত্র। ১৮৯২ সালে তাঁর প্রথম নাটক **'Widowers' Houses'** নিয়ে বার্নাড শ আত্মপ্রকাশ করলেন। মাত্র দশ বছরের মধ্যে উদিত হলো তিনটি নবীন সূর্য ইউরোপের নাট্যাকাশে, আর পশ্চিম গোলার্দ্ধ তাদের আলোতেই হলো আলোকিত। আমেরিকা তখনও প্রতীক্ষায়।

১৯০৬ ও ১৯০৯ সাল আমেরিকার নাটকের ইতিহাসে বিশেষভাবে স্মরনীয়। ১৯০৬ সালে শিকাগোতে 'নিউ থিয়েটার' নামে এক রঙ্গমঞ্চ স্থাপিত হলো, আর ১৯০৯ সালে হলো নিউইয়র্কে। এই সাথে স্মরণ করতে হয় জর্জ পিয়ার্স বেকারকে। আমেরিকার নাট্যজগতে উর্বরতার অভাব দেখে তিনিই প্রথম উপলব্ধি করেছিলেন নাট্য প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা। আগ্রহী ছাত্রেরা যাতে নাটক লেখা শিখতে পারে তার জন্যে তিনি একটি প্রশিক্ষণ সূচী প্রনয়ণ করলেন এবং সেই অনুযায়ী একটি কোর্স চালু করলেন। তা' হোল ১৯০৫ সালের কথা। আর আমেরিকার অগ্রগন্য নাট্যকার ইউজিন ও'নীল হোলেন পিয়ার্স বেকারেরই ছাত্র। আজ হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পিয়ার্সের নাটক প্রশিক্ষন সূচী ৪৭-ওয়ার্কসপ্ নামে বিখ্যাত। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে মেসাচুসেট্সের প্রভিন্সটাউনে একদল উৎসাহী যুবক যে ক্ষুদ্র নাট্যামোদী সঙ্ঘের সৃষ্টি করেছিল ও'নীলের প্রচেষ্টায় তা' এক নতুন জোরালো নাট্য আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্র হয়ে দাঁড়ালো।

প্রথম মহাযুদ্ধের একটু আগে ও'নীল কয়েকটি একাঙ্কিকা লেখেন; তার মধ্যে **'Bound East for Cardiff'** খুব নাম করা। ১৯১৬ সালে নাটকটি মঞ্চস্থ হয়। তার পর থেকে একটানা চলতে থাকে ও'নীলের নাটক-সৃষ্টি। আমেরিকার নাটকের ইতিহাসে এক নবযুগের সূচনা হলো। প্রভিন্সটাউনের নাট্যোৎসাহীরা গ্রীনিচ গ্রামে যে ছোট্ট রঙ্গমঞ্চের পত্তন করেছিল ১৯২০ সালের দিকে তা অনেকাংশে উন্নত হয়ে উঠলো এবং মাত্র পাঁচ বছরের মধ্যে একমাত্র এখানেই পঞ্চাশজন নাট্যকারের লেখা কমপক্ষে এক শ' খানা নাটক মঞ্চস্থ করা হয়। আর একটি বিশেষ আনন্দের কথা ছিল এই যে লেখকদের মধ্যে প্রায় সবাই আমেরিকান। প্রথম খ্যাতনামা নাট্যকার উইলিয়ম ভন্ মুডী, তার বন্ধু পার্সি ম্যাক্কোয়ী ও শিষ্য জোসেফাইন পীবডির স্বপ্ন এতদিনে সার্থক হলো। (মুডীর লেখা নাটকের মধ্যে 'দি গ্রেট্ ডিভাইড্' (১৯০৬)

এবং 'দি কেথ্ হিলার' (১৯০৯) দর্শক ও সমালোচকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছিল; পার্সি ম্যাককেয়্যী বিখ্যাত গল্পকার ও উপন্যাসিক নেথানিয়েল হথর্ণের 'ফেদারটপ' নামক গল্পের নাট্যরূপ দেন; মুডীর প্রাক্তন ছাত্র পীবডি হেমিলিনের বিচিত্র চিত্রিত বংশীবাদকের কাহিনীর নাট্যরূপ দেন এবং এ' নাটকের নাম দেওয়া হয় 'দি পাইপার'। ১৯১০ সালে মুডীর মৃত্যু হয়—এই বছরই ম্যাক্‌কেয়্যী ও পীবডি আত্মপ্রকাশ করেন)।

শীঘ্রই নিউইয়র্কে নতুন নতুন নাটকচক্র গড়ে উঠলো। 'ওয়াশিংটন স্কোয়ার প্লেয়ারস্' নামক নাট্যগোষ্ঠি প্রথম মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পরেই 'থিয়েটার গীল্ড্' নামে আত্মপ্রকাশ করলো এবং পরে নিজেরাই গীল্ড থিয়েটার নামে একটি নাট্যশালা প্রতিষ্ঠা করলো ১৯২৫ সালে। অবশ্য, তাদের সামগ্রিক প্রচেষ্টা আরম্ভ হয়েছিলো ১৯১৪ সাল থেকে। প্রথম মহাযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার ফলে তাদের কাজ কিছুটা ব্যাহত হয়। ইউজিন ও'নীল গীল্ড থিয়েটার প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম, যদিও ১৯১৫ সালে প্রতিষ্ঠিত 'নেবারহুড্ প্লে হাউজে'—সখের নাটক চলতো তবু একথা বললে হয়ত ভুল হবে না যে গীল্ড থিয়েটারই আমেরিকার প্রথম আধুনিক নাট্যশালা।

বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকের জনপ্রিয় নাটক হলো 'Abie's Irish Rose' (১৯২৪),—এ'নাটকের অভিনয় তিন হাজার রজনী দেখেও নিউইয়র্কের দর্শকেরা ক্লান্ত বা বিরক্ত হয়নি। যদিও ও'নীলের কোন নাটকই এ' ধরণের অসাধারণ ব্যবসায়িক সাফল্য লাভ করেনি তবুও ও'নীল ছিল সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রে একটি পরিচিত নাম; কিন্তু 'এবিজ্ আইরিশ রোজের' লেখক এ্যান্ নিকোলাস্‌কে কেও মনে রাখেনি, নাট্যকারকে হত্যা করলো নিজেরই নাটক। নাটক দেখেই লোকে মুগ্ধ হলো, নাট্যকারকে কেউ মনে রাখেনি। (মার্গারেট মিচেলকে অনেকেই মনে রাখেনি কিন্তু কে না শুনেছে 'গন্ উইদ্ দি উইণ্ড'-এর নাম। অবশ্য, মিচেল নাট্যকার ছিলেন না; তিনি ছিলেন উপন্যাস লেখিকা।)

আমেরিকান নাটকের প্রাচীন পদ্ধতিকে বাতিল করে ও'নীল নিয়ে এলেন এক নতুন বাস্তবতা। চিরাচরিত নাট্যরীতির পরিবর্তে তিনি প্রবর্তন করলেন নতুন এক্‌স্‌প্রেশানিষ্ট (Expressionist) রীতি। অভিনব বর্ণাঢ্য দৃশ্যপট নেই; Co-incidence-দোষদুষ্ট বৃত্ত বা কাহিনীও অনুপস্থিত; অতিনাটকীয় কৃত্রিম সংলাপ বর্জিত হোল। মানব জীবনের কঠিন বাস্তবতা স্থান ও পাত্র-উপযুক্ত স্বাভাবিক ভাষায়, স্বতঃস্ফূর্ত

সংলাপে সমৃদ্ধ করল ও'নীলের নাট্যশৈলী। তাঁর নাটক মানুষের বাহ্যিক কার্যাবলীর সাধারণ নাট্যরূপ নয়, বরঞ্চ মানুষের মন ও আত্মার উপযুক্ত নাট্যায়ন। ও'নীল নিছক রিয়েলিষ্ট নন্; তিনি হচ্ছেন একজন পাকা নেচারেলিষ্ট। ফ্রয়েডীয় পদ্ধতিতে তিনি মানবপ্রকৃতিকে পর্যবেক্ষণ করেছেন—কোমল রোমান্টিকতা তাঁর নাটকচত্বরে স্থান পায়নি। এখানে গোলাপের সুবাসের পরিবর্তে দেশী মদের বোঁটকা গন্ধ; সাধ্বী ডেস্‌ডিমনার সন্ধান এখানে মিলবে না, মিলবে প্রমোদবালা অথবা ভিক্টোরিয়ার মত 'white devil', রোমিও জুলিয়েটের প্রেমের পরিবর্তে আছে বিমাতার অবাঞ্ছিত প্রেম (Desire Under The Elms—o'Neill, 1924,)। অনেক ক্ষেত্রে ও'নীল চরিত্র সংগ্রহ করেছেন সমাজের আস্তাকুঁড় থেকে। তাঁর অনেকগুলো নাটকের গল্প পড়া যায় কিন্তু বলা যায় না। কথাগুলো পিউরিটানিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বলছি না। কথা হলো এই যে আমাদের সামাজিক নীতির মাপকাঠি দিয়ে ও'নীলের নাটক বিচার করা সম্ভব নয়। পাশ্চাত্য সমাজের প্রাচুর্যের কুফলস্বরূপ যে অনেক অবক্ষয় দৃষ্টিগোচর হয় তা'ই ও'নীলের নাটকে বিধৃত হয়েছে। তাঁর ছিল বিচিত্র অভিজ্ঞতা। অনেকবার কন্‌রাড্-এর (Conrad) মত তিনি সমুদ্রযাত্রা করেছেন; ঘুরেছেন দক্ষিণ আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকার বিভিন্ন জনপদে। ইংলণ্ডে অনেকবার তিনি এসেছেন; আবার কিছুদিন সাংবাদিকের কাজও করেছেন। তাই বলছি ও'নীলের ছিল সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতা—আর তার দ্বারা উজ্জ্বল হয়েছে তাঁর নাটকগুলো।

এটা সত্যি যে ও'নীলের নাটক পড়তে গেলে হতাশ হতে হয়। তার নাটক ছাপার অক্ষরে নয়, তার নাটক মঞ্চে। দীর্ঘ ও বিস্তৃত নির্দেশ, কথ্য ভাষা ও দীর্ঘ সংলাপ অনেক সময় আমাদের পড়তে ভালো লাগে না। কিন্তু মঞ্চে আসার সাথে সাথেই তার নাটক একটা নতুন রূপ নেয়। 'The Moon of the Caribbees' ও তাঁর নেচারিলিষ্টিক নাটক 'Beyond the Horizon' (১৯২০) এর পর তাঁর এক্স্‌প্রেশানিষ্টিক্ নাটক 'The Emperor Jones' একটি অবিস্মরণীয় সৃষ্টি। সারা নাটকে নেপথ্যে টম্‌টমের একটানা শব্দে একটি হিপ্‌নটিক্ প্রভাব ও একটি বিশেষ অনবদ্য মানসিক অবস্থার সৃষ্টি হয়। অশরীরী ভীতি ও ছায়ামূর্তি নিগ্রোগুলি, ব্রুটাস্ জোন্সের ভীতিবিকৃত প্রলাপ এবং কঙ্গোর আদিম অরণ্যে তার মানসিক গতি ও তার নাটকীয় বহিপ্রকাশ এ' নাটককে এক উল্লেখ্য মর্য্যাদা দান করেছে।

শ্বেতাঙ্গ-নীগ্রো সমস্যা নিয়ে লেখা 'All God's Chillun God Wings' ১৯২৪ সালে প্রকাশ পায়। এর পরে আসে 'The Great God Brown.'

এ নাটকে প্রধান চরিত্রগুলিকে মুখোশ পরিধান করতে দেখা যায়। **Lazarus Laughed**-এ (১৯২৭) সাতটি বিভিন্ন টাইপ চরিত্রের জীবনের সাতটি অধ্যায় দেখানো হয়েছে উনপঞ্চাশটি মুখোশের মাধ্যমে। কাহিনীর বিরাট বিস্তারের জন্য ও'নীলের '**Strange Interlude**'কে ভাগনারের নাটকের সাথে তুলনা করা হয়ে থাকে। বিভিন্ন চরিত্রের আভ্যন্তরীণ চিন্তাবৈচিত্র এক্স্‌প্রেশানিষ্টিক্ পদ্ধতিতে দেখানো হয়েছে। স্বগতঃ উক্তির সাহায্যে দেখানো হয়েছে কিভাবে একটি চরিত্র একযোগে একটি বা কয়েকটি বিভিন্ন চিন্তা করছে আবার অন্য চরিত্রের সাথে উপযোগী ও সংলগ্ন সংলাপ চালিয়ে যাচ্ছে। '**Mourning Becomes Electra**' আমেরিকার নাট্যজগতে ও'নীলের এক যুগান্তকারী অবদান। যদি তিনি শুধু এই নাটকটি লিখতেন তবুও তিনি পৃথিবীর সাহিত্যের ইতিহাসে অমর হয়ে থাকতেন, সন্দেহ নেই। এই নাটকের এক নতুন ব্যঞ্জনার কারন হলো সমকালীন আমেরিকার সামাজিক পটভূমিকায় গ্রীক পৌরাণিক কাহিনীর উপস্থাপনা। আমেরিকার গৃহযুদ্ধের অবসান আর ট্রয়ের পতন—এ'দুই ঘটনা সমীকৃত হয়েছে। ব্রিগেডিয়র এজ্‌রা মেনন্ আধুনিক এগামেম্‌নন্ ; তাঁর পত্নী খ্রীষ্টিন্ হচ্ছেন ক্লাইটেমেন্‌ট্রা। ওরিষ্টিস্ হচ্ছে তাঁদের পুত্র ওরীন এবং কন্যা লেভিনীয়াকে ইলেক্‌ট্রা (**Electra**) হিসেবে ধরা যেতে পারে। স্থানীয় শহরবাসিরা হচ্ছে গ্রীক নাটকের সমতুল্য কোরাস্। সফোক্লিস্, ইউরিপিডিস্, ইস্‌কাইলাস্-এর সমৃদ্ধ গ্রীক পৌরানিক নাটক পাঠ করার পর ও'নীলের '**Mourning Becomes Electra**' আমাদের মনে এক গভীর দাগ কাটে। সাথে সাথে মনে পড়ে আর একজন আধুনিক নাট্যকারের কথা যিনি তাঁর '**The Cocktail party**' প্রমুখ নাটকে একই ধারা অনুসরণ করেছেন। এই নাটকগুলির পৌরাণিক ও আধুনিক তাৎপর্য্য প্রণিধাণযোগ্য। বিশটি বছর ধরে ও'নীল তাঁর অফুরন্ত প্রাণশক্তি ও প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন একটির পর একটি অনবদ্য নাটকের মাধ্যমে। '**Anna Christie**', '**Marco Millions**', '**The Hairy Ape**' এবং '**Dynoms**' তাঁর আর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য নাটক। ও'নীলের নাটকে জটিলতা আছে, আন্তরিকতা আছে, আছে বিস্তার কিন্তু পর্য্যাপ্ত গভীরতা নেই। তাঁর নাটকে অনেক সময় অসুন্দরকে (আপাত দৃষ্টিতে) উপস্থাপিত করতে হয়েছে জীবনের সত্যের প্রয়োজনে। জীবনের সত্য অথচ কদর্য্য দিকের প্রতি ইঙ্গিত করলেই সাহিত্য অসুন্দর হয় না। ইয়াগো অসুন্দর, '**Paradise Lost**'-এর শয়তান চিরাচরিত বিশ্বাস অনুযায়ী অসুন্দর। শিল্পীর ষ্টাইলের স্পর্শে তারা লাভ করেছে এক নতুন গৌরব। মানবজীবনের দৈন্য, সংঘাত ও হতাশা পরিস্ফুটনের সামগ্রিক উৎকর্ষে ও'নীল অনন্য। ও'নীল আধুনিক আমেরিকার নাট্যজগতে উইয়েভৃস্কি। তাঁর মধ্যে

আছে বেন্ জন্‌সন্ আর কন্‌গ্রীভের সমাজবীক্ষণ। মলিয়ের কিংবা শেরিডেনের মত তিনি হাসান না; তিনি হচ্ছেন গ্রীক নাট্যকারের মত সিরিয়স্।

সমসাময়িক অন্যান্য নাট্যকারদের সাথে তুলনা করলে বুঝা যায় ও'নীলের স্থান শীর্ষদেশে। বেরমেন্, ফিলিপবেরী, রবার্ট শের্‌উড্, মস্ হার্ট, সিড্‌নি হাওয়ার্ড, জর্জ কাফ্‌ম্যান্ প্রভৃতি নাট্যকারেরা ও'নীলের প্রতিভার দ্যুতিতে নিষ্প্রভ ছিল। উপরোক্ত ছয়জন নাট্যকারের মোট নাট্যকৃতির একটি খতিয়ান দেওয়া হলো—

১। বের্‌মেন (১৮৯৩):—ইনি হার্ভার্ডের ৪৭-ওয়ার্কসপের নাটক প্রশিক্ষণ কোর্সে ভর্তি হন। ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর নাটক 'বাইওগ্রাফি' মঞ্চস্থ হলো। এটি হলো একটি মার্জিত কমেডি। আমরা এখানে পাচ্ছি এক শিক্ষিতা ও অতি জনপ্রিয় আধুনিকার স্মৃতি চারণ।

২। ফিলিপ বেরী (১৮৯৬-১৯৪৯):—প্রবাসী আমেরিকানদের নিয়ে রচিত তাঁর নাটক 'হোটেল ইউনিভার্স' সমালোচকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এক প্রবীণ মরমিয়া ধ্যানীর অবস্থিতিতে এই নাটক গৌরবান্বিত হয়েছে। তাঁর একটি রূপকধর্মী নাটক হলো 'হিয়ার কাম্ দি ক্লাউন্স'।

৩। রবার্ট শের্‌উড্ (১৮৯৬):— হ্যানিবালের বিজয় অভিযানের পটভূমিকায় রচিত কমেডি 'দি রোড্ টু রোম্' (১৯২৭), ঘটনাবহুল নাটক 'পেট্রিফাইড্ ফরেষ্ট' (১৯৩৫) ও ইউরোপের হোটেল জীবনের আলোকে লিখিত 'ইডিয়ট্'স্ ডিলাইট' শেরউডের অবদান।

৪। মস্‌হার্ট (১৯০৪) ও ৫। কাফ্‌ম্যান্ (১৮৮৯) :— হার্ট ও কাফ্‌ম্যান্ পৃথকভাবে কোন নাটক লিখেননি। তাঁদের নাটক প্রচেষ্টা চলেছে সম্মিলিত ভাবে। 'You Can Take It With You' (১৯৩৬) এবং 'The Man Who Come To Dinner' (১৯৩৯) তাঁদের মিলিত প্রয়াসের ফল।

৬। সিড্‌নি হাওয়ার্ড (১৮৯১-১৯৩৯):— বেরমেনের মতো ইনিও হলেন ৪৭-ওয়র্কসপের ছাত্র। ১৯২৪ সালে প্রকাশিত তাঁর নাটক 'They Know What They Wanted' এ বিধৃত হয়েছে হাস্যরসের মাধ্যমে কিভাবে একটি সুন্দরী তরুণী কদর্য চালাকীর শিকার হয়ে এক অর্ধমৃত বুড়োকে স্বামীত্বে বরণ করলো। আর 'The Silver Cord'-এ পাচ্ছি মাতার অস্বাভাবিক পীড়াদায়ক অভিভাবকত্বের দৃষ্টিগ্রাহ্যরূপ।

ব্যষ্টিগতভাবে বিচার করলে হয়ত দেখা যাবে যে এ নাটকগুলির মধ্যে কয়েকটি নাটকীয়তা ও সাহিত্য বিচারে ও'নীলের নাটককে ছাড়িয়ে গেছে। কিন্তু একথা ভুললে চলবে না যে ও'নীলের শ্রেষ্ঠত্ব তার বিশাল সামগ্রিকতায়। ও'নীলে এমারসন্-থরোর দার্শনিক প্রজ্ঞার গভীরতা নেই, কিন্তু আছে হুইটম্যানের বাস্তবতা। তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব এই বাস্তবতায় ও জীবনবীক্ষণে।

ও'নীল যে' বছর তাঁর 'Desire Under The Elms' প্রকাশ করলেন ঠিক সে' বছরই **'The Adding Machine'** নামে এক অভিনব নাটক লিখলেন এলমার রাইস্ (১৮৯২)। নিউইয়র্কের 'মর্নিংসাইড্ প্লেয়ার্স' নামক নাট্যগোষ্ঠি এই নাটক মঞ্চস্থ করে। **Mr. Zero** নামধেয় এই নাটকের নায়ক বিভিন্ন জন্মচক্র-চারণের পর পরিণত হলেন নিজের নিরস যন্ত্রের এক আত্মাহীন ক্রীতদাসে। নাটকটিকে একটি নিরীক্ষামূলক প্রচেষ্টা বলা যেতে পারে।

জন হাওয়ার্ড ল'সন্ ও গিলবার্ট সেলডিসের নাম করতে হয় এই প্রসঙ্গে। ল'সন তাঁর নাটক 'রোজার ব্লুমার'-এ প্রতীকধর্মী ব্যালে নৃত্য ও অ্যাব্স্ট্রেক্ট্ দৃশ্যপট সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন। ১৯২৫ সালে মঞ্চস্থ ল'সনের বাস্তবধর্মী নাটক 'প্রোসেশানল্' বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করে। সেলডিস্ নাম করলেন ১৯২৪ সালে 'দি সেভেন্ লাইভ্লি আর্টস্' নাটকটি প্রকাশ করে। সিড্নি কিংসলির 'ডেড্ এন্ড্' নাটকটিরও নাম করতে হয়। চমৎকার দৃশ্যধর্মী পটভূমি নাটকটির মান অনেকাংশে উন্নীত করেছে। নাটকটির প্রকাশকাল ১৯৩৫ সাল। কিংস্লির নাটকটির বছর চারেক আগে জর্জ এবং ইরা গার্শ্যিন গীতধর্মী নাটক 'Of Thee I Sing' দিয়ে দর্শকদের মনোরঞ্জন করলেন। 'ব্রীজ্ অব্ স্যান্ লুই রে'-এর প্রখ্যাত লেখক অধ্যাপক থর্নটন্ ওয়াইল্ডার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের একটু আগে 'আওয়ার টাউন' এবং 'দি স্কিন্ অব্ আওয়ার টীথ্' নাটকদ্বয় উপহার দিলেন আমেরিকার নাট্যভাণ্ডারে। আমেরিকার ইয়েট্স্-ধর্মী লোকনাট্যের ঐতিহ্য সৃষ্টির প্রচেষ্টার জন্য বিখ্যাত হয়ে রয়েছেন প্রথমে উত্তর ডেকোটা ও পরে উত্তর কেরোলিনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ফ্রেডারিক্ কচ্। আবার নাটকে নিগ্রোজীবন প্রতিফলিত করার ব্যবহারিক প্রয়াস ও আংশিক সফলতার জন্য স্মরণীয় হয়ে আছে ক্ষীণজীবি 'ফেডারেল থিয়েটার'। প্রতিভাধর তরুণ প্রযোজক অর্সন্ ওয়েলেস্, সুনিপুণ মঞ্চ প্রকল্পক ও সজ্জাকারী রবার্ট এড্মণ্ড্ জোন্স্ ও নর্মান্ বেল্ জেড্স্ অমর হয়ে আছেন আধুনিক আমেরিকার নাটকের আঙ্গিক ও বিষয়বস্তুর বিবর্তনের ইতিহাসে। ইতিমধ্যে গড়ে উঠ্লো এক মার্কস্বাদী নাট্যগোষ্ঠি। মস্কো আর্ট থিয়েটারের ষ্টাইলে

প্রলেটারিয়েট্ জীবনের প্রক্ষেপ ঘটলো আমেরিকার রঙ্গমঞ্চে। শ্রেণী সংগ্রাম পেলো নাট্যরূপ। মঞ্চের উপরই দেখা গেলো ধর্মঘট, শ্রমিক সভা ও বক্তৃতা। আমেরিকার দর্শকদের জন্য হলো এ' এক নতুন অভিজ্ঞতা। ঠিক এই সময়েই আবির্ভাব ঘটলো শক্তিশালী নাট্যকার ক্লিফোর্ড ওডেট্সের। আমেরিকার নাট্য-সাহিত্যে ও'নীলের পর যদি কারও নাম করতে হয় তবে ওডেট্স্-এর নামই সর্বপ্রথম মনে আসে। ওডেট্স্-এর প্রশংসিত প্রলেটারিয়েট্ নাটকদ্বয় হলো —'Waiting For Lefty' এবং **'Awake and Sing'**।

আমেরিকায় কাব্যনাট্য মোটেই যে উৎকর্ষলাভ করেনি তা নয়—ওয়ালেস্ ষ্টেভেন্স্ এক্ষেত্রে বিশেষ কৃতিত্বের দাবী করতে পারেন। তাঁর নাটক হলো **'Carlos Among The Candles'** এবং **'Three Travellers Watch a Sunrise.'** আচিবল্ড্ ম্যাক্‌লীশ্ এবং ম্যাক্স্‌ওয়েল্ এন্ডারসন্-ও কয়েকটি কাব্যনাট্য লিখেছেন।

ষ্টেইন্‌বেক্ চেষ্টা করেও নাটকের ক্ষেত্রে বিশেষ সফলকাম হতে পারেন নি। অপরপক্ষে ডস্ পেসোজ্ ও সেরোয়েন আমেরিকার নাটকের ইতিহাসে দুইটি স্মরণীয় নাম। পেসোজের 'এয়ারওয়েজ ইন্‌করপোরেটেড্' এবং সেরোয়েন-এর 'দি টাইম্ অব্ ইওর লাইফ্' (১৯৩৯) যে দুইটি মূল্যবান সংযোজন এ বিষয়ে মত বিরোধের অবকাশ নেই।

টেনেসী উইলিয়ামস্ ও আর্থার মিলার দু'জন লব্ধপ্রতিষ্ঠ আধুনিক নাট্যকার। ১৯৪৫ সালে প্রকাশিত উইলিয়াম্‌সের 'দি গ্লাস্ মেনেজারী' ও ১৯৪৭ সালে প্রকাশিত 'এ ষ্ট্রিট্‌কার নেম্‌ড্ ডিজায়ার' বহুলপঠিত নাটক। তাঁর জনপ্রিয়তা অপরিসীম। সাধারণ জীবন চিত্রণে অসাধারণ কৃতিত্বের প্রমাণ দিয়ে উইলিয়ামস্ ও মিলার আমেরিকাবাসীর হৃদয় জয় করেছেন। ১৯৪৯ সালে প্রকাশিত মিলারের নাটক 'ডেথ্ অব্ এ সেল্‌স্‌ম্যান' একটি সৎ ও আন্তরিক নাট্যপ্রচেষ্টা। এ'দুজন নাট্যকারের নাটকে আমরা দেখি কল্পনা ও কাব্যপ্রেরণার প্রত্যক্ষ ছাপ। তাঁরা দুজনেই সংলাপের চমৎকারিত্বের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন, ঘটনার বর্ণচ্ছটার উপর গুরুত্ব দেননি। তাঁদের নাটকগুলো সত্যিই সুখপাঠ্য। ইলিয়টের খ্যাতি কবি হিসাবে হলেও তাঁর চারখানা ভালো নাটক রয়েছে। একথা অবশ্য সত্যি যে তাঁকে ঠিক আমেরিকান নাট্যকার বলা যায় না।

থিয়েটারের টেকনিক পরিবর্তনের সাথে আমেরিকায় নাটকের ক্ষেত্রে বিভিন্ন নতুন নতুন পরীক্ষা এখনও চলছে। তাছাড়া টেলিভিশান, সিনেমা ও বেতারের দৌলতে শত শত নাটিকা অবিরাম জন্ম নিচ্ছে। সেগুলির হয়ত সাহিত্যিক মূল্য খুব বেশী নেই, কিন্তু সেগুলির সংখ্যা ও নতুনত্ব দেখে অবাক না হয়ে পারা যায় না। এরাই সৃষ্টি করতে

পারে একটি বলিষ্ঠ নাট্যঐতিহ্য যা থেকে পরে জন্ম নিতে পারে সত্যিকারের সাহিত্যিক মূল্য সম্পন্ন আরও অনেক নাটক।

প্রতীকবাদ সারা আমেরিকান সাহিত্যের একটি বিশেষ লক্ষণ। ট্রান্সেন্ডেন্টেল্ যুগের এমারসন্, থরো ও হথর্ন-এর রচনা প্রতীক ধর্মী। হারমেন মেলভিলের 'মবিডিক' প্রতীকবাদের অমর স্মৃতিস্তম্ভ। আধুনিক লেখক ওয়াইল্ডার ও হেমিংওয়ে এই ধারা থেকে বাদ যাননি। হেমিংওয়ের 'ওল্ডম্যান্ এণ্ড দি সী' প্রতীকবাদের ছোঁয়ায় ধন্য। নাট্যসাহিত্যে ও'নীল ছিলেন এই প্রতীকবাদের সক্ষম প্রয়োগকারী। ওডেট্স্, সেরোয়েন, বেরী এবং শেরউড তাঁদের নাটকে প্রতীকের বহুল ব্যবহার করেছেন। প্রতীকবাদের বিশেষ প্রভাবে অনেক সময় চরিত্র টাইপে পরিণত হয় এবং নাটক ও উপন্যাস অস্বাভাবিক এ্যাব্স্ট্রেক্ট্ হয়ে পড়ে। এ জন্যেই হথর্নের 'দি স্কারলেট্ লেটার', 'দি মারবেল্ ফন্', 'হাউজ্ অব্ দি সেভেন্ গ্যাবেল্স্' ও ছোট গল্পগুলিতে জীবন্ত চরিত্রের বদলে প্রাণহীন টাইপ বেশী নজরে পড়ে। আধুনিক আমেরিকান নাটকের এক্স্প্রেশানিষ্টিক্ প্রচেষ্টা প্রতীকবাদেরই একটি বিশেষ রূপ। রূপকের সার্থক প্রয়োগও নাটকের ক্ষেত্রে বিরল নয়। ফিলিপ বেরী তার নাটকে রূপকের সার্থক ব্যবহার দেখিয়েছেন।

অতি তরুণ নাট্যকারদের মধ্যে অনেকে এখনও খ্যাতির প্রতীক্ষায়। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে যে নাট্য আন্দোলন শুরু হয়েছিল তার জের এখনও কাটেনি। তরুণ নাট্যকারেরা সে ঐতিহ্য এখনও বয়ে নিয়ে চলেছেন। আমেরিকার নাট্য আন্দোলনে ৪৭-ওয়ার্কসপের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা এখনও শেষ হয়নি। প্রতি বছর ট্রেণিং প্রাপ্ত অনেক নতুন নাট্যকার বের হচ্ছেন। এদের কাছে আমেরিকা অনেক কিছু আশা করে যদিও আমরা জানি যে প্রতিভা ট্রেণিং-এর উপর নির্ভর করে না।

---

এ রচনায় নিম্নলিখিত বইগুলোর সাহায্য নেওয়া হয়েছে—

1. A History of the American Drama from the Civil War to the Present Day (NY, Appleton-Century—Crofts, 2v. in one, revised edn., 1936), *by Arthur H. Quinn.*
2. The Oxford Companion to the Theatre (1951), Ed. *by Phyllis Hartnel.*
3. Fifty years of American Drama, 1900--1950 (Chicago, Regenery 1951). *by Alan S. Downer.*
4. The American Drama Since 1918 (NY, Braziller, 1957), is the revised edn. of a book first pub. in 1939. *by Joseph W. Krutch.*
5. The Literature of the United States. (Britain, Penguin, 1959) *by Marcus Cunliffe.*

# শিল্পী ও সমালোচক

জাহাঙ্গীর তারেক

কারো কারো মতে শিল্পী ও সমালোচক দু'টি আলাদা জগতের অধিবাসী। বিচ্ছেদের বিপুল জলরাশি তাঁদের নিয়ত পৃথক করে রাখছে। তাঁদের উদ্দেশ্য স্বতন্ত্র, অন্বিষ্ট স্বতন্ত্র, লক্ষ্যে পৌছবার পদ্ধতিও স্বতন্ত্র। কেননা শিল্পীর সৃষ্টি সার্থকতা পায় এক ধরনের অতিলৌকিক স্বপ্নচারিতায়, যেখানে "আমি জানি না", এই মনোভাবের কাছে তিনি আত্মসমর্পণ করেন সহজাত প্রবৃত্তি বশে। অথচ প্রতিদিনের ধূলিমলিন রাজপথেই সমালোচকের পদচারণা ; শিল্পের অমৃত লোকের চতুর্দিক পরিক্রমণ করেই তাঁর শক্তি নিঃশেষিত হয়, অন্দরে প্রবেশের অধিকার কখনো পান না।

উপরোক্ত সঙ্ঘাতের সত্যতা অস্বীকার করছি না ; বরঞ্চ সন্দেহ করি, ব্যাপারটিকে এরকম একটি সরল ব্যবচ্ছেদের দ্বারা চিহ্নিত করা আদৌ সম্ভব কি না। শিল্পী ও সমালোচকের এই বহু পুরাতন বৈরী ভাব তাঁদের ঐতিহাসিক কলহ ও বাদপ্রতিবাদ সম্ভবতঃ শিল্পীর নিজেরই মনের নিরন্তর উক্তি প্রত্যুক্তির বহিঃপ্রকাশ মাত্র। কারণ শিল্পীর এই সমালোচনীবৃত্তি তাঁর সৃষ্টিপ্রেরণার পক্ষে বন্ধন মনে হলেও এ শৃঙ্খলা তাঁর শিল্পকলারই অঙ্গীভূত ; তাঁর প্রতিভা বিকাশের পক্ষে অপরিহার্য। কে জানে হয়ত এই দুই প্রতিপক্ষ—'কপালকুণ্ডলার' শিল্পী ও 'বঙ্গদর্শনে'র সমালোচক—মূলত একই ব্যক্তি।

তদুপরি এমন অনুমানও নিরাপদ নয় যে যেহেতু বুদ্ধিবৃত্তি কল্পনাশক্তিকে আঘাত হানে, তাই, এক্ষেত্রে এক পক্ষের বিজয় মানেই অন্য পক্ষের পরাভব। যুক্ত কৌশলের অগণিত মারপ্যাচে শিল্পীর সৃজনীবৃত্তি ও সমালোচনীবৃত্তি একে অপরকে নিষ্ক্রিয় করতে পারে, প্রাণবান করতে পারে, ছাড়িয়েও যেতে পারে। কিন্তু এমন অনেক স্মরণীয় দৃষ্টান্তের কথাও আমরা জানি যেখানে এই দুটি শক্তি পরস্পরের ভেতরে একেবারে অনুপ্রবিষ্ট, যেমন র‍্যাফাএল বা মোজার্টের জ্ঞানগর্ভ রচনা-

বলীতে—সৌন্দর্য ও বুদ্ধিমত্তা যেখানে অভিন্নসত্তা। সন্দেহ নেই, কোন কোন ক্ষেত্রে এরা ভিন্ন মার্গেও বিচরণ করে; কিন্তু সেক্ষেত্রে এ-সিদ্ধান্তও অবশ্যগ্রাহ্য নয় যে, যে-শিল্পী তাঁর বুদ্ধিবৃত্তিকে উন্মূলিত করে একটি স্বয়ংক্রিয় প্রবৃত্তির কাছে আত্মসমর্পণ করেন, শিল্পী হিসেবে তাঁর সার্থকতাই অপেক্ষাকৃত সুনিশ্চিত কিংবা সেই আত্মসমর্পনের মুহূর্তেই তাঁর শিল্প প্রতিভার সার্থকতম বিকাশ ঘটে। লেওনার্দোর নোট বইগুলোতে এমন অনেক নক্সা আছে যেখানে তিনি তাঁর হাতকে মনের সচেতন নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত করে অবাধে সঞ্চরণ করতে দিয়েছেন। কিন্তু সমঝদার ব্যক্তিরা বলেন, যে-চিত্রগুলির পেছনে তাঁর বিশ্লেষণী বুদ্ধির সতর্কতা ছিল তাদের তুলনায় উপরোক্ত প্রক্রিয়ায় অঙ্কিত ছবিগুলো গুণগতভাবে নিতান্ত নিম্নমানের। ব্লেকের চিত্র সম্বন্ধেও কথাগুলি সমান প্রযোজ্য। যে-ছবিগুলি তিনি ভাবাকুল অবস্থায় সরাসরি কল্পনা থেকে এঁকেছেন তাতে স্বয়ংক্রিয় অনুলিখনের ছাপ বর্তমান; দেখতে সেগুলো অনেকটা ট্রেসিং-এর মতো এবং সচেতন শ্রমের দ্বারা পরিশীলিত চিত্রগুলোর তুলনায় রঙে রেখায় অপেক্ষাকৃত নিষ্প্রভ।

এখন উপরোক্ত দৃষ্টান্ত সমূহের সাক্ষ্য যদি আমরা স্বীকার করি অর্থাৎ যদি একথা সত্য বলে মেনে নিই যে সমালোচনা শিল্পকর্ম মাত্রেরই অন্তর্নিহিত সৃষ্টি প্রক্রিয়ার অঙ্গীভূত একটি ব্যাপার; একে অস্বীকার করে কোন শিল্পকর্মের পথেই সত্য হয়ে ওঠা সম্ভব নয়, তাহলে এতে আশ্চর্যের কিছু নেই যে যে-কোন সার্থক শিল্পকর্মই সমালোচনার একেকটি মূলসূত্রকে অঙ্গীকার করে। এবং উক্ত বিশেষ শিল্পকর্মটি ঐ বিশেষ মূলসূত্রের সাহায্যেই অবশ্য বিচার্য। কিন্তু তা করতে গেলেই অনিবার্যভাবে তার প্রতিফলন ঘটে অপরাপর শিল্পীদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত মূলসূত্রগুলির ওপর। এবং এমনি করে জোনাথন সুইফ্‌ট যাকে বলেছেন "বইয়ের লড়াই"—"**a battle of the books**" কিংবা হোগার্থের ভাষায়—"**a battle of the pictures**" সেই সঙ্ঘাত ও তুলনা প্রতিতুলনার ব্যাপারটি বিরামহীনভাবে চলতে থাকে। এমনি করেই শিল্পী ও সমালোচকেরা ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠি শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়েন। এবং এই গোষ্ঠি ও শিবিরের ছাপ মেরে দেওয়ার রেওয়াজটি যদিও অপেক্ষাকৃত আধুনিক, তার মূলীভূত কারণটি কিন্তু মোটেই নিরর্থক নয়। কেননা শিল্পী—যদি তিনি বুদ্ধিমান কলাকুশলী হন স্বভাবত চাইবেন তাঁর কারুকলার ভেতরে প্রবেশ করে তার অন্তর্নিহিত সূত্র সমূহের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করতে; আর এ-ও নিতান্ত স্বাভাবিক যে এইসব সূত্র ও প্রকরণ—এককালে যা বিশেষ বিশেষ সঙ্ঘের সতর্ক সংরক্ষণের বিষয় ছিল—আজকের দিনের স্বাধিকারপ্রমত্ত শিল্পী-কলাকোবিদদের তপ্ত তর্কবিতর্কের লক্ষ্যস্থল হবে।

সুতরাং প্রতিটি শিল্পকর্মের ভেতরেই, দেখা যায়, এমন সব সমালোচনার বস্তু ও সূক্ষ্ম কলাকৌশল থাকে যাতে বৈয়াকরণদের শান্তি ভঙ্গ হয়, তাঁদের প্রশান্তির সরোবরে আলোড়ন জাগে। বলা যেতে পারে, প্রত্যেক শিল্পীই তাঁর নিজের ভেতরে একজন সমালোচককে তো বটেই, গুটিকয়েক বৈয়াকরণকেও নিভৃতে লালন করেন। কিন্তু এঁরাই যখন আর সব কিছুকে ছাড়িয়ে পুরোভাগে এসে দাঁড়ান তখন এ-সঙ্ঘাতের পরিণতি ঘটে নিছক বাক্য প্রকরণগত শুষ্ক বিতর্কে। শিল্পকর্ম তখন কৌতূহলীর কৌতূহল তৃপ্ত করে এবং পেশাদার সমালোচকের ছুরিকাঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়ে যথারীতি পরিণতি লাভ করে।

সৌভাগ্যক্রমে শিল্প কর্মের সৃষ্টি শুধু শিল্পীদের জন্য নয়--এবং যা আরো ভয়ঙ্কর হতে পারত শিল্পকলার ঐতিহাসিকদের জন্যও নয়; শিল্পসৃষ্টি হয় জনগণের জন্যে যাদের ওপর ওর অপ্রতিরোধ্য অব্যবহিত প্রভাব কখনো কখনো মারাত্মক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। কেননা শিল্প আমাদের তথাকথিত স্বাভাবিক জীবনধারার ভেতর অনুপ্রবেশ করে আমাদের প্রতিমানগুলিকে ওলটপালট করে দেয়, পরিপ্রেক্ষিত বদলে দেয়, এমন সব আবেগ জাগিয়ে তোলে যার অস্তিত্বশুদ্ধ নতুন ঠেকে এবং আমাদের বহুদিনের সযত্নলালিত সংবেদনগুলিকে নির্মম ভাবে উপেক্ষা করে। শিল্প, এই হিসেবে, মানুষের জীবনে একটা মস্ত উপদ্রব বিশেষ যার প্রবলতার মাত্রাধিক্য হলে যে-সব এলাকাকে আমরা কল্পনার অভিঘাত থেকে নিরাপদ ভাবতে অভ্যস্ত, সেখানে পর্যন্ত হানা দেয়।

আমরা অবশ্য চিরদিন শুনে আসছি যে শিল্পী যা কিছু স্পর্শ করেন তাতেই রূপান্তর ঘটান এবং সৃষ্টির তীব্র উত্তাপে জগতের অতি কঠিন নিরেট বস্তুগুলিও গলে একাকার হয়ে যায়। শিল্পীর মন্ত্রশক্তির কাছে একবার শুধু মন সঁপে দেওয়া চাই, তিনি আমাদের জাগতিক সব চিন্তা ভুলিয়ে দেবেন। এক দিব্য স্বপ্নলোকে আমাদের অভ্যুত্থান ঘটাবেন। শিল্পের এই যে সৌন্দর্যগত দিক, তার ভাব মোক্ষণ শক্তি—একে অস্বীকার করবার উপায় নেই। কিন্তু শিল্পী আমাদের সংবেদন সমূহের রূপান্তর ঘটান এ যেমন সত্য, তিনি যে তাদের তীব্রতা বৃদ্ধি করতে পারেন সে-ও তেমনি সত্য। সে কারণে শুধু ভাব মোক্ষণ নয়, ভাবাবেগকে উত্তেজিত করবার ক্ষমতাও শিল্পের করায়ত্তে। ফলত শিল্প রসিকের মনে এমন একটি উচ্চতর সচেতনতার বোধ সংক্রমিত হতে পারে যা রসানুভূতির ক্ষণিকতা অতিক্রম করে স্বভাবের দীর্ঘস্থায়ী উপাদানে পরিণত হয়।

'লে ফ্ল্যর দ্যু মালে'র ভূমিকায় বোদলেয়র তাই বৃথাই প্রতিবাদ করেছিলেন যে উক্ত বইটি একটি অতি নিরীহ প্রচেষ্টামাত্র; অপরূপ কারুকুশলতা দ্বারা একটি নোংরা

বিষয়কেও যে রূপান্তরিত করা যায় সেইটি দেখানোই তাঁর উদ্দেশ্য। "সদগুণের সঙ্গে মসী মিশ্রণ করা"ই (a' confondre l' enere avec la vertu) যাদের উদ্দেশ্য তাদের গ্রাম্যতাকে তিনি আঘাত হেনেছেন কিন্তু তাঁর নিজের 'মসীর সঙ্গে সদগুণ মেশাবার,' এবং পাপের উপরেও একটা শৈল্পিক মহিমা আরোপ করবার*ইচ্ছার যা ফলশ্রুতি, তাকে এড়িয়ে যেতে তিনি চেষ্টা করেননি : **Le sujet fait pour l'artiste une partie du genie, et pour moi, barbare malgre' tout, une partie du plaisir.*** জগতের সবচেয়ে নাগরিক, সবচেয়ে পরিশীলিত কবিও এমনি করে বর্বরতার সঙ্গে তাঁর আত্মীয়তা স্বীকার করেছেন। কোন আদিম সমাজপতির মতোই যেন তিনি অনুভব করেছেন যে কেবল মন্ত্রোচ্চারণের বলেই একটি সমাজের স্বভাব তিনি বদলে দিতে পারেন।

আমাদের আলোচ্য বিষয়ের প্রসঙ্গে এই মন্ত্রশক্তির ব্যাপারটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এই মন্ত্রশক্তিই কখনো কখনো অসাধারণ দংশনশক্তি রূপে আত্মপ্রকাশ করে। সুরের ছদ্মবেশধারী রায়ের বিরুদ্ধে আপীল চলে না। সে কারণেই হাইনের মতো কবির হাতে **polemics** এমন আশ্চর্য প্রাণ প্রাচুর্য পায়। 'শীতের রূপকথা' নামে একটি কবিতায় হাইনে প্রুশিয়ার সম্রাটকে শাসিয়ে ছিলেন এই বলে যে তাঁর প্রতিক্রিয়াশীল নীতি ত্যাগ না করলে দান্তের 'ইনফার্নোর' মতো এমন এক কবিতা তিনি লিখবেন সম্রাট যেখানে অনন্তকাল ধরে নরকের আগুনে দগ্ধ হবেন। এবং সম্রাটকে তিনি একথাও স্মরণ করিয়ে দেন যে কবিদের রচিত নরকাগ্নি শাস্ত্র বর্ণিত নরকাগ্নির তুলনায় ঢের ঢের বেশি ভয়াবহ ; কারণ দান্তের অভিশপ্ত নরকবাসীদের উদ্ধার করবার ক্ষমতা স্বয়ং ঈশ্বরেরও নেই। কবির পংক্তিনিচয়ের নিখুঁত ছন্দঃস্পন্দ, তাঁর চিত্রকল্পের শক্তি ও যাথাযথ্য পাঠকের মনের উপর এমনভাবে মুদ্রিত হয়ে যায়, যে সেখান থেকে তাদের স্থানচ্যুত করা স্বয়ং ঈশ্বরেরও সাধ্যে কুলোয়না।

এখন একথা সত্য হলে, কবির এই 'সুরের আগুন' ন্যায়-অন্যায় বিচারের ক্ষেত্রে অতি মারাত্মক প্রতিপন্ন হতে পারে। কারণ তাঁর প্রকাশশক্তি ও অন্তর্দৃষ্টি যে সবসময়ই সমানানুপাতিক হবে এমন কোন নিশ্চয়তা নেই। সুন্দর মাত্রেই সব সময় সত্য নয় ; এবং সুন্দর যখন মিথ্যা বা ভ্রান্তির বাহন হয় তখন এ-দুয়ে মিলে যে রমনীয়তার উদ্ভব ঘটায় তার অভিঘাত মানুষের কল্পনাশক্তি শত সহস্র বৎসরের চেষ্টাতেও প্রতিরোধ

* **"শিল্পীর পক্ষে, বিষয়বস্তু তাঁর প্রতিভারই অংশস্বরূপ এবং আমার মতো বর্বরের পক্ষে, তা আনন্দের অংশ।"**

করতে পারে না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, লুক্রেজিয়া বোগিয়া নাম্নী জনৈকা নারী আজকের দিনেও পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে সর্বপ্রকার পাপাচার ও ইন্দ্রিয়পরতন্ত্রতার প্রতীক হয়ে আছে। অথচ ইতিহাসের সত্য অনুসন্ধান করলে দেখা যায় লুক্রেজিয়া ছিলেন একজন সাধারণ সতীসাধ্বী মহিলা—সদাচারী, বিনয়ী ও স্নেহশীলা। ফেরারার ডাচেস হিশেবে শাসন-কার্যেও তিনি দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন, প্রজাদের শ্রদ্ধা ও প্রীতিও লাভ করেছিলেন। কিন্তু তবু তাঁকে কেন্দ্র করে একটি কুৎসিৎ কিংবদন্তীর উদ্ভব হল এবং তার সবটাই সানাজাবো নামে একজন কবির কল্পনাপ্রসূত। পরবর্তীকালে কাহিনী নিয়ে ভিক্তর উগো একখানি নাটক লিখলেন, দোনিজেত্তি লিখলেন একটি অপেরা এবং রসেটি লুক্রেজিয়া বোগিয়ার একখানি প্রতিকৃতিও অঙ্কন করলেন—সবগুলিতেই লুক্রেজিয়ার কিংবদন্তী কথিত পাপাচারগুলিই গাঢ়তর বর্ণে উদ্ভাসিত হল।

শিল্পের এই ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে সত্য নিতান্ত অসহায় প্রমাণিত হল। পরবর্তীকালের ঐতিহাসিকরা বৃথাই এই রূপকথার স্বরূপ উদ্ঘাটনের চেষ্টা করলেন। কিন্তু

> "Les dieur eur-memes meurent,
> Mais les vers souverains
> Demeurent
> Plus forts que les airains."*

কেউ কেউ হয়ত ভাবতে পারেন যে এসব সমস্যার সমাধান অতি সহজেই হতে পারে যদি সত্য ও কল্পনার নিজ নিজ এলাকা নির্দিষ্ট করে দেওয়া যায়। শিল্পীরা সত্যের বিকৃতি ঘটালেও কিছু ক্ষতি নেই, যতোক্ষণ এটাকে তাদের .poetic license বলে বোঝা যায়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত বাস্তবে প্রয়োগ করতে গেলেই এ সমাধানের অন্তঃসারশূন্যতা বেরিয়ে পড়ে। কল্পনা ও উপলব্ধি সেই বস্তুর ওপর প্রয়োগ করতে গেলে তারা একে অপরের উপর প্রভাব বিস্তার না করে পারে না। অর্থাৎ লুক্রেজিয়া সম্বন্ধে আমরা ইতিহাস থেকে যেটুকু জানি তাঁর প্রভাব তাঁর সম্বন্ধে আমরা কতটা বিশ্বাস করতে প্রস্তুত আছি তার ওপর অবশ্যই পড়বে। পক্ষান্তরে, শিল্পীরা আমাদের মনে যেসব বিশ্বাস সংক্রমিত করে দিয়েছেন ইচ্ছে করলেই সেগুলি ঝেড়ে ফেলা যায় না। সেটা বাঞ্ছনীয়ও নয়। কারণ এরকম চিকিৎসা ফলপ্রসূ হলে

* "দেবতারাও মরণশীল, কিন্তু কবিতা—ব্রোঞ্জের চাইতেও দৃঢ় কঠিন সার্বভৌম কবিতা কখনো মরে না।" থেওফিল গোতিয়ে।

এক ধরণের মারাত্মক মানসিক ব্যাধি জন্মাবার সম্ভাবনা—যাতে বুদ্ধিবৃত্তি কল্পনা-শক্তিকে অগ্রাহ্য করে আর কল্পনাশক্তি বুদ্ধিবৃত্তির নির্দেশ অমান্য করে।

কিন্তু শিল্পের অবাধ স্বাধীনতা—**Poetic license**—অন্যভাবেও শিল্পের পরিধি সঙ্কুচিত করতে পারে। শিল্পকলা তাতে অবসর বিনোদনের অপ্রাসঙ্গিক উপায় বা যৌন প্রেরণার সঙ্গে সম্পর্কহীন এক ধরণের সুখকর কৌশল মাত্রে পর্যবসিত হতে পারে—হয়ত অবসর ক্ষণের ভূষণ স্বরূপ তাকে গ্রহণ করব কিন্তু গুরুতর কাজে মনোযোগ দেবার সঙ্গে সঙ্গেই তার অস্তিত্বের কথা ভুলে যাব। এমনি করে শিল্পী তাঁর সবচেয়ে বড়ো দায়িত্ব পালনের আনন্দ থেকেই বঞ্চিত হবেন। কেননা মানুষের অভিজ্ঞতার যেসব অন্ধকার গলিঘুঁজি বুদ্ধিবৃত্তির নাগালের বাইরে সেখানে প্রবেশ করে মানুষের উপলব্ধির সীমাকে সম্প্রসারিত করাই তো তাঁর প্রধান কৃত্য।

শিল্পীর উদ্দেশ্য যদি স্পষ্টত **polemic** হয় তাহলে আমাদের বিচারবুদ্ধির উপর শিল্পের প্রভাব যেমন অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠে, **polemic** উদ্দেশ্য লোপ পাওয়ার পরেও তেমনি শিল্পের সংক্রমণ শক্তি অব্যাহত থাকে। প্লেটো যে কারণেই স্পার্টানদের শিক্ষাপদ্ধতির নিন্দা করতে গিয়ে একদিকে দুঃখ ভোগের যন্ত্রণা অপরদিকে সুখ সম্ভোগের বিপদের কথা উল্লেখ করেছেন:

**"And those who drink from these two sources at the right time and in the right measure will be blessed.........but those who do not, will be otherwise."**

কিন্তু যথাসময় ও যথাপরিমাণ কে নির্ধারণ করবে? প্লেটোর মতে সে ভার কখনো শিল্পীর হাতে ছেড়ে দেওয়া যায় না। কারণ শিল্পকে বিচারবুদ্ধির নিয়ন্ত্রণের বাইরে অবাধ বিহারের অধিকার দিলে সে আমাদের ভেতর বাহিরের সর্বত্র অনাসৃষ্টি ঘটাবে। প্লেটোর মতে শিল্পী ইচ্ছে করলে মানুষকে যে কোন কিছুতে রূপান্তরিত করতে পারেন: যথোচিত সুরের ব্যবহার করে কখনো বীর, কখনো কাপুরুষ, কখনো কঠিন, কখনো কোমল করে তুলতে পারেন। আবার যথোচিত শব্দ চয়নের দ্বারা ভালকে মন্দ, মন্দকে ভাল বলেও প্রতীতি জন্মাতে পারেন। অর্থাৎ প্লেটোনিষ্ট জেমস হ্যারিসের ভাষায়: "কল্পনায় যার শুরু বাস্তবে তার সমাপ্তি।"

আধুনিক মানুষের কানে শিল্পীর এই দণ্ডাদেশ একটু বেশি ভীতিবিহ্বল শোনায়, কিন্তু প্লেটো জানতেন যে, শিল্পীর ভিতরে 'জিনিয়াস' যেমন কাজ করে 'ডেমন'ও তেমনি

সক্রিয় হতে পারে। শিল্পী রাজনীতিবিদ হলে তিনি যে অতি মারাত্মক যাদুবিদ্যার উৎস হতে পারেন তার প্রমাণ স্বরূপ আলসিবাদিসের দৃষ্টান্ত তাঁর সামনে ছিল। প্লেটোর তাই আশঙ্কা : "When the modes of music change, the fundamental laws of the state always change with them." এতোখানি সার্থকতা অবশ্য অতি অসাধারণ শক্তিশালী শিল্পীর পক্ষেই সম্ভব। প্লেটোও তা ভালোভাবেই জানতেন ; শিল্পী যতো বড়ো হন তাঁকে ভয় করবার প্রয়োজনও ততো বেশি।

আধুনিক আইন কিন্তু প্লেটোর এ-সিদ্ধান্তকে গ্রাহ্য করে না। অশ্লীল দুর্নীতিমূলক বলে কোন বই আদালতে অভিযুক্ত হলে প্রথমেই দেখা হয়, বইটির শিল্পগুণ কিছু আছে কিনা ; যদি থাকে তো বইটি নিঃসংশয়িত রূপে নিরপরাধ প্রমাণিত হল, তার বিরুদ্ধে আর কোন আপত্তি টেকে না। প্রক্রিয়াটি নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয় কেননা এতে করে শিল্পীদের কারাগারের বাইরে থাকবার সম্ভাবনা বাড়ে কিন্তু যুক্তি হিসেবে এ-পদ্ধতি সাঙ্ঘাতিকরূপে ত্রুটিপূর্ণ। কারণ শিল্প কোন কিছুকে রূপান্তরিত করলে তার তীব্রতাও যে সেই পরিমাণে বৃদ্ধি পায় এবং ছোট শিল্পীর তুলনায় বড়ো শিল্পীর ক্ষতিসাধন করবার শক্তিও যে অনেকগুণে বেশি এই সত্যটি যেন ইচ্ছে করেই উপেক্ষিত হয়। প্লেটো কিন্তু এবিষয়ে অনেক বেশি সজাগ ছিলেন :

"And if any such man will come to us to show us his art, we shall kneel down before him and worship him as a rare and holy and wonderful being : but we shall not permit him to stay. And we shall anoint him with myrrh and set a garland of wool upon his head, and shall send him to another city."

এটাই হচ্ছে প্লেটোর শিল্পভীতির সবচেয়ে বিভ্রান্তিকর দিক। তাঁর সূক্ষ্ম সংবেদনশীল চিত্ত শিল্পের স্পর্শে তীব্রভাবে সাড়া দিতে সক্ষম হলেও—এবং সে-কারণেই শিল্পের অপরিমিত শক্তির কথা ভেবে তিনি যে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন তা অল্পবুদ্ধি গোড়া নীতিবাগীশদের সিদ্ধান্তের বড়ো বেশি নিকটবর্তী ঠেকে। ফলে এই দুই মনোভাবকেই এক নিক্তিতে ফেলে ওজন করবার লোভ হয়। কিন্তু প্লেটোকে নীতিবাগীশদের দলভুক্ত করা যায় না এই জন্যে যে তিনি একদিকে যেমন পাঠকের মনে 'দিব্যভয়' ( Theios phobos ) জাগাবার প্রয়াস পেয়েছেন শিল্পের মন্ত্রশক্তির অপপ্রভাবকে প্রতিহত করবার জন্যে, অপরদিকে তেমনি 'পঙ্গু ধার্মিকতা'কেও (choly' 'andri'a) তিনি উপহাস করেছেন।

এ হচ্ছে, তাঁর মতে, মনের এমন এক কাঠিন্যপ্রাপ্ত অবস্থা যা শিল্পের আনন্দ বেদনা তার শুভ অশুভ কোন প্রভাবেই আর সাড়া দেয় না। এ-রোগের সংক্রমণ হয় সাধারণত মানুষের যৌবন অতিক্রান্ত হলে—যখন তার মন আর ভাবাবেগে উন্মথিত হয় না এবং একটা অন্ধ পরিতৃপ্ত নিরাপত্তা বোধের মধ্যে আত্মপ্রসাদ পেতে থাকে। এ রোগ থেকে নিরাময় লাভের জন্য প্লেটো বৃদ্ধদের উপদেশ দিয়েছেন মদ খেয়ে মাতাল হতে, যেন তারা শিল্পের বিপদকে নতুন করে আলিঙ্গন করে যুবকদের সাথে এক সারিতে মিলতে পারেন।

সুতরাং প্লেটোর শিল্পভীতির ভারসাম্য রেখেছে 'পঙ্গু ধার্মিকতা'র উপর তাঁর জ্বলন্ত ঘৃণা। পঙ্গু না হয়েও শিল্পকে ভয় করতে শেখানো এই ব্যাপারটি তাঁর কাছে এতোই দুঃসাধ্য ঠেকেছে যে তাঁর মনে হয়েছে শিল্পকে শাসন, নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার ভার মেজিস্ট্রেটের ওপর অর্পণ করা কর্তব্য। কিন্তু এ-ব্যবস্থা তাঁর নিজের কাছেই গ্রহণ-যোগ্য বোধ হয়েছিল কিনা, সে বিষয়েও সন্দেহ জাগে। কারণ একটু পরেই তিনি আবার বলছেন যে ম্যাজিস্ট্রেটের ওপর এ-দায়িত্ব দেওয়া যায় যদি সে-ম্যাজিস্ট্রেট বিধাতার মতই সর্বজ্ঞ হন। এবং প্লেটোর যুক্তি অনুসরণ করে অনায়াসেই আমরা এ-সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে ম্যাজিস্ট্রেটরা যতোদিনে এ রকম সর্বজ্ঞ হয়ে না উঠছেন ততোদিন তাঁদের 'পরে এ দায়িত্ব অর্পন না করাই নিরাপদ।

কিন্তু প্লেটোর উটোপিয়ান চিকিৎসা পদ্ধতির উপর আস্থা রাখতে না পারলেও তাঁর রোগ নির্ণয় ক্ষমতাকে কিছু অগ্রাহ্য করা যায় না। ম্যাজিস্ট্রেটের অভ্রান্ততার উপর নিশ্চয়ই নির্ভর করা চলবে না। কিন্তু সেক্ষেত্রে অন্ধ অনিশ্চয়-বিধিকে বিচারকের আসনে বসানোই কি ঠিক হবে? যদি তা না হয়, তাহলে প্লেটো যে-জন্য সর্বজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট খুঁজেছেন আর কার ওপর সে-কাজের ভার দেওয়া যায়?

আমার বিশ্বাস, সেই দায়িত্ব বহন করবার ভারই সমালোচকের, যাঁর ভুল করবার সম্ভাবনা সব চেয়ে অধিক, কিন্তু সত্যের কাছাকাছি পৌঁছবার সম্ভাবনাও সেই পরিমাণে বেশি। সমালোচকই শিল্পকর্মের ভাষ্যরচনা করে। তার মূল্যায়ন ও যাচাই বাছাই করে পাঠকের মনে প্লেটো-কথিত ভীতির উদ্রেক করবেন কিংবা তাদের 'পঙ্গু ধার্মিকতা'কে কশাঘাত হানবেন। তিনি যদি ভুলও করেন—আর ভুলতো তিনি করবেনই—তাহলে অন্য সমালোচকরা রয়েছেন তার প্রতিবাদ করতে। সর্বোপরি শিল্পী স্বয়ং তো রয়েছেনই নতুন নতুন শিল্প রচনা করে তাঁকে হতবাক করে দিতে, তাঁর মতামত

প্রত্যাহারে বাধ্য করতে। কারণ কোন শিল্পকর্ম সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত শুনবার আমাদের প্রয়োজন নেই। যেটা আমাদের পক্ষে সবচেয়ে জরুরী সে হচ্ছে একটা সদাজাগ্রত সচেতনতা বোধ, মনের দরজা জানলা সব খোলা রাখবার একটা অনুভূতি। কিন্তু সমালোচনা যদি কেবল শিল্পকর্মের প্রকরণগত গুণবিচারেই সীমাবদ্ধ থাকে, প্রকরণের সঙ্গে মানবজীবনের অন্যান্য দায়দায়িত্বের ক্ষেত্রেও প্রসারিত না হয় তাহলে উক্ত সচেতনতা বোধ কখনো বিকশিত হতে পারে না। শিল্পের স্বায়ত্ত শাসনের বিধি অনুযায়ী, সমালোচকের কেবল একটি প্রশ্ন আলোচনা করবারই ন্যায়সঙ্গত অধিকার আছে: "শিল্পী তাঁর অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে সমর্থ হয়েছেন কিনা"। কিন্তু আমি বলব, তৎসঙ্গে দু'টি একটি নিষিদ্ধ প্রশ্নও তাঁকে উত্থাপন করতে হবে যেমন শিল্পীর অভীষ্ট লক্ষ্য আদৌ অভিপ্রেত কি না, আমাদের অভিজ্ঞতার জগতে তার স্থানই বা কোথায়?

বস্তুত জীবন্ত শিল্পকলার স্বার্থের খাতিরেই শিল্পাভিব্যক্তির অন্তর্নিহিত ঝুঁকি সম্পর্কে আমাদের সচেতন থাকা দরকার; কেননা তাতে প্রকারান্তরে সৌন্দর্যের ছদ্মবেশের আড়ালে ক্রিয়াশীল মানবীয় শক্তিকেই স্বীকার করা হয়। আপত্তি উঠতে পারে যে শিল্প সমালোচনার পরিধি শিল্পের স্বীকৃত সীমানার বাইরেও প্রসারিত হলে শিল্পের স্বাধীনতা বিপন্ন হবে; কেননা সেক্ষেত্রে যে-সব কর্ম কেবল কল্পনাতেই ঘটছে এবং সেকারণে শিল্পী যার কোন দায় স্বীকার করেন না---তার দায়িত্বও শিল্পীকেই বইতে হবে। কিন্তু কল্পনাশ্রয়িতার সঙ্গে দায়িত্বহীনতার সম্বন্ধস্থাপন যুক্তির দিক থেকে অসার, শিল্প তাতে করে ব্যসনের উপকরণ মাত্রে পর্যবসিত হয়। সমালোচকই হয়তো পারবেন এসব ব্যাধির একেবারে মূল ধরে চিকিৎসা করতে। অবশ্য বিতর্ককে বিশুদ্ধ সংবেদনশীলতার ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ রাখবার একটা সুবিধে এই যে মানুষের দায়িত্ব কর্তব্য সংক্রান্ত বিতর্কের মতো তাতে বীররসের অবতারণা হবার সম্ভাবনা কম। কিন্তু ম্যাকিয়াভেলির জনৈক শিষ্য তো অনেক আগেই বলে দিয়েছেন: "ঈশ্বরকে যাঁরা নিজেদের গৃহে স্থান দিতে চান, শয়তানকে তাঁদের শয়নকক্ষে ঠাঁই দিতে হবে"।

# পঙ্কজ পুষ্প

হুমায়ুন আজাদ

রবীন্দ্রনাথ তখনো অস্তমিত হননি, কিন্তু তাঁর আবাল্য, সদাসহচর বহু বোধ ক্রমশ অস্তমিত হচ্ছিলো। যে-দিব্য, শাশ্বত, বৈকুণ্ঠলোকবাসী ছিলেন তিনি, তাঁর উত্তরজৈবনিক অনেক কবিতা থেকে সে শাশ্বতলোকের অসংখ্য চিহ্ন ঝরে পড়েছে। কালের ঘণ্টাধ্বনি তাঁর কানে ধ্বনিত হয়েছিলো স্পষ্টভাবে, এবং তিনি যদিও ছিলেন এক জীবনে বহু জন্মান্তরবাদী, তবু তাঁকে দেখে যেতে হয়েছিলো কবিতায় কালান্তর আনলো একদল নব্যযুবা। তাঁরা শাশ্বতের স্পর্শ বঞ্চিত, শিল্পের চিরন্তনতায় পূর্বপথযাত্রীদের মতো দৃঢ়বিশ্বাসী নন। তাঁরা যা সৃষ্টি করলেন, তা বস্তুতই পঙ্কজ পুষ্প, স্বর্গোদ্যান থেকে পুষ্পচয়নের অক্ষমতা তুমুলভাবে ঘোষিত হলো তিরিশি কবিতায়। এ-কারণেই রাবীন্দ্রিক উদ্যানের পুষ্পপ্রেমিক পরবর্তীযুগের পুষ্প স্পর্শ করতে যেয়ে কণ্টকিত হন। জীবনানন্দ দাশ বা বুদ্ধদেব বসু, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত অথবা বিষ্ণু দে, যে-কারো কবিতাই গ্রহণ করি না কেন, বারংবার বোধ করতে হয়, ঋতু বদলে গেছে ভয়ংকরভাবে। কবিতার উপাদান বদলে গেছে, বদলে গেছে উপাদান-সংগ্রন্থন প্রক্রিয়া। এতোকালের মাননীয় বহু বিষয় কেমন বিবর্ণ, রক্তহীন হয়ে উঠেছে। প্রেমকে আর মনে হয় না দিব্য, শাশ্বত, প্রকৃতি ম্রিয়মান, এবং সর্ববিধ সম্পর্কের মধ্যে ছায়াপাত করে আছে প্রচণ্ড সংশয়। তাই সাম্প্রতিক কবিতা পাঠককে তৃপ্তিকর খাদ্য দিতে স্বেচ্ছায় সামর্থ্যহীন। তিরিশি কবিবৃন্দ যে-ভ্রষ্টযুগের সন্তান, আমরাও সেই যুগেরই অধিবাসী, কেননা উত্থানরহিত বঙ্গ বা বিশ্বে নতুন বাতাস ইতিমধ্যে বয়নি। জীবনানন্দ দাশ ছিঁড়ে গেছেন, ফেঁড়ে গেছেন। দুদণ্ড শান্তি নিয়ে বেঁচেছেন, এবং তাঁর মনপুরুষ 'আট বছর আগের একদিনে' সমস্ত নিষেধ এড়িয়ে আত্মহত্যা করেছে। সুধীন্দ্রনাথ দত্তের নায়িকা দেহসর্বস্ব, অথবা তাঁর নায়ক-নায়িকার

সাক্ষাৎ হয় অশ্লেষার রাক্ষুসী বেলায়, সমুদ্যত দৈবদুর্বিপাকে। এই কুগ্রহগ্রস্ত জীবনের ভাষ্যকারগণ যে-জগৎ আমাদের হাতে তুলে দিয়েছেন, তা শরীর ও চরিত্রে দুষ্ট, ক্লান্ত, জর্জরিত।

কিন্তু সে পঙ্কস্রোতেই জন্মেছে আশ্চর্য পুষ্প। যেহেতু সে-স্রোত আজো প্রবহমান, তাই সাম্প্রতিক কবিও সেই স্রোতোধারা থেকেই পদ্ম আহরণ করেন। তিনি সর্বদা পবিত্র, পুণ্য রক্তকে ভয় পান, মুষ্টিতে তুলে নেন সেই সব পরিত্যক্ত পণ্য, যা কোনোদিন কবিতার মধ্যে স্থান পায়নি। এবং তাঁকে বিদায় জানাতে হয় অনেক কিছুকে—প্রেম, প্রকৃতি, শাশ্বতবোধ ইত্যাদি সমস্ত প্রচলিতের সম্পর্কে তাঁকে থাকতে হয় রূঢ়। প্রকৃতির কথাই ধরা যাক। বঙ্গ দেশীয় অকৃপণ প্রকৃতি আজ কেমন গরিব এবং কৃপণ, তার দেবার শক্তি নেই। তাই আজকের কবিতায় প্রকৃতির স্নিগ্ধ স্থান নেই, থাকলে তা শবের মতো। আমরা এখন প্রকৃতিকে দেখি রাস্তার মধ্যবর্তী দ্বীপপুঞ্জে, পার্কের দেয়ালের ভিতরে। তিরিশের প্রকৃতিবিদ জীবনানন্দ প্রকৃতি ধার করে এনেছেন পুরানো রূপসী বঙ্গ থেকে। বর্তমানের কবি তাই সন্ধান করেন হঠাৎ প্রকৃতির ঝলকানি, চিমনির ধূম্র যেন মেঘ, ড্রেনের গলিত ইঁদুরশিশু পদ্ম, অকস্মাৎ নয়নগ্রাহ্য হয় ডাস্টবিনে দল মেলছে সূর্যমুখীর শংকিত চারা। শামসুর রাহমানে প্রকৃতির জন্যে স্থান সংকুলান হয় না এ-হেতুতেই, তিনি দেখেন খেলেনার দোকান, ভিখিরি, কানন-বালার ছবি। তাঁর প্রেমিকা যে-দিন চিরদিনের জন্যে তাঁকে ত্যাগ করে যায়, সে-দিন হরিণশিশু অঞ্চল আকর্ষণ করে না, প্রকৃতির কোনো বদল ঘটে না, কেবল বিবর্ণ হয়ে উঠে চেয়ার, টেবিল ইত্যাদি। চমৎকার পুষ্পসারির দৃশ্য দেখেছেন শহীদ কাদরী, তাই তাঁর নিষ্প্রভ চোখে, উদ্যানের পুষ্পপংক্তিকে মনে হয় কেক পেস্ট্রির মতো থরেথরে সাজানো। জীবনানন্দ দাশ কি দেখেছিলেন? বরফের মতো চাঁদ, নষ্ট শসা, কুয়াশার ফুল, লক্ষ্মীপেঁচা।

প্রেমও বিগত যুগের রূপকথা। বর্তমানে অসংশয়ী, নিবেদিত প্রেমের কবিতা লেখা বা পড়ার মতো ক্লান্তিকর আর কিছু হতে পারে না। আষাঢ়ের অজস্র জলধারে কেঁদেও তাকে আর পাওয়া যাবে না। বর্তমানে যে কচ ও দেবযানীর বিদায়ের পালা অভিনীত হয় না, তা নয়, বরং এরোড্রাম, ইষ্টিমার-ইস্টিশনে, অন্যত্র, তা অনবরত হচ্ছে। কিন্তু তাকে কাব্যরূপ দেয়া অসম্ভব। তিরিশের কবিদের মধ্যে বুদ্ধদেব বসু সবচেয়ে প্রেমপ্রার্থী। কিন্তু তাঁর বারংবার নিবেদনের মধ্যে প্রেমের মৃত্যু বারংবার ধ্বনিত, এবং একই কথা কথিত হতে পারে জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

সম্বন্ধে। বর্তমানে প্রেম একটি ভয়াবহ নাট্যলীলা, আবার যেখানে তা লিরিক, সেখানেও বোমাবর্ষণের শব্দে শিথিল হয় আলিঙ্গন, বা চন্দ্রগ্রাসের ছায়া এসে সহসা পতিত হয় উভয়ের গানের মধ্যে।

২

আধুনিক কবিতায় পৌণপুণিক প্রত্যাবর্তন ঘটে, তাই, এমনসব বস্তুর, যাদের মধ্যে কবিতা সঞ্চার দুঃসাধ্য। রবীন্দ্রনাথ 'মরা বেড়ালের ছানা', 'মাছের কাঁনকা', ইত্যাদি ব্যবহার করে, বা পৃথিবী একবার 'ছলনাময়ী' বলে মুক্তি লাভ করেছিলেন কিন্তু বর্তমানে যিনি কবিতা লিখছেন সেই পরম মুক্তি তাঁর জন্যে নেই। ড্রেন, ডাস্টবিন, ধূসর বাতাস, কোলাহল এবং হতাশা যেখানে অষ্টপ্রাহরিক সঙ্গী, সেখানে কবি কি করতে পারেন? তিনি নিশ্চয়ই নেমে যাবেন এদেরই গর্ভে, সেখান থেকেই আনতে হবে কবিতার প্রফুল্ল পদ্ম। যদি কেউ তুলে আনতে চান প্রচলিত ভূভাগ থেকে তবে কবিতা তাঁর সঙ্গে রূঢ় আচরণ করবে, এবং তাঁর মুমূর্ষু উপাদান পদ্য ছাড়া আর কিছু তৈরি করতে পারবে না।

এখানেই সমস্যা সংকটজনক। কবিতায় সাম্প্রতিক উপাদানের নিকটস্থ দেখে বহু যুগবোধহীন, কবিতাজ্ঞানবঞ্চিত নেমে আসেন কাব্য-লোকে, ফলত, তাঁদের কবিতা আধুনিক কবিতা না হয়ে হয়ে দাঁড়ায়, সমস্ত সাম্প্রতিক উপাদান এবং প্রক্রিয়া সত্ত্বেও, সাম্প্রতিক কবিতার অনুকরণ। এবং আমরা, সরল জনসাধারণ, বিভ্রান্ত হই নকলকে যথার্থ ভেবে। সাম্প্রতিক বহু কবির রচনা থেকেই অনায়াসেই বিশেষ বিশেষ স্থান আহরণ করে দেখানো যেতে পারে, এই সব বাক্যাবলী কবিতা নয়, কবিতার অনুকরণ। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর সমাপ্তিক কাব্যপ্রকাশের পূর্বে বহুদিন নীরব ছিলেন এবং ওই কাব্য থেকে মৃত্যু পর্যন্তও নীরব ছিলেন, একারণে, যা কবিতা তা তাঁর মধ্যে রচিত হচ্ছে না। কিন্তু এ বোধ সকলের মধ্যে সঞ্চারিত হয়নি, বর্তমানে কবিতা রচনার্থে অনেক সময়ই ব্যয়িত হয় কবিদের, যথার্থ কবিতা রচিত হয় না।

পশ্চিম ভূভাগে কবিতা নিয়ে খেলা শুরু হয়ে গেছে। নিজেদের বুদ্ধির সমস্ত শক্তিকে অনেকেই নিয়োজিত করেছেন চমৎকারিত্ব সৃষ্টিতে, এবং তা কবিতার পক্ষে মারাত্মক। সেই করুণ কসরতের নমুনা দিচ্ছি:

ক, Paul Mecartney Gustav Mahlar
Alfred Jarry John Coltrane
Charlie Mingus Claude Debussy
Wordsworth Monet Bach and Blake......
Stephen Mallarme' and Alfred de Vigny
Ernst Mayakovsky and Nicolas de Stael
Hendemith Mick Jagger Durer and Schwitters
Garcia Lorca
and
Last of all
me.

( আড্রিয়ান হেনরির 'me' কবিতা )

**BLACK IS WHITE**
**WHITE IS BLACK**
**WHITE IS BLACK**
**WHITE IS BLACK**

( প্রাগুক্ত কবির )

এ-সব কসরৎ বঙ্গদেশেও দেখা দেবে। কিন্তু কবিতার বিরুদ্ধে এর চেয়ে কঠোরতর শত্রুতা আর কি হতে পারে? তাই আধুনিক কবিতা পাঠকালে, জীবনানন্দের মন্তব্য সর্বদা স্মরণীয়, 'সকলেই কবি নয়, কেউ কেউ কবি।'

# শিল্পীর পরিপ্রেক্ষিত

আবুল মোমেন

'চাই দ্বন্দ্ব, আরো দ্বন্দ্ব': ইয়েট্‌স্‌-এর এই অতর্কিত নাটকীয় উক্তিতে শিল্প-সৃষ্টির জন্যে তাঁর ঐকান্তিক আর্তি সুতীব্রতায় ঘোষিত। এই শিল্পী-মন দ্বন্দ্ব, সংশয় ও দ্বিধা-বিকীর্ণ: প্রতিটি মুহূর্ত সংগ্রামময়, রক্তাক্ত; ফলে নিরবচ্ছিন্নভাবে সচেতন তিনি। প্রতি মুহূর্তে তিনি নতুনকে অবলোকনের ও অচেনাকে আবাহনের অনিশ্চিত সম্ভাবনায় প্রস্তুত; এবং তাই নতুন উপলব্ধি ও অনুভবে তাঁর শিল্পী-সত্তা অগ্রগামী, অনাগতের পথ তাঁর তৃষিত উষ্ণ চিত্তের আলোয় চির-উদ্ভাসিত; ফলে তাঁর সৃষ্টিরা আলো-আঁধারির লীলায় নিত্য সম্ভাবনাময়। বস্তুত সেই অক্লান্ত মনটিই শিল্পী-মন যা কিনা প্রত্যয় ও নিশ্চয়তা নামের কোন নিশ্ছিদ্র প্রকোষ্ঠকে ডিঙিয়ে সংশয়ের তটিনীতে দ্বন্দ্বের তরণী বেয়ে 'লোকে লোকে নব নব পূর্বাচলে আলোকে আলোকে' বিচরণ করে। কেননা শিল্পী-মনের প্রত্যয় কোন ব্যক্তিত্বের কাছ থেকে আহৃত নয়, অকৃত্রিম মননের ভিত্তিভূমিতে প্রকর্ষিত সংকল্পের প্রকাশ। এবং সেই প্রত্যয়ের ভূমিটি শিলার আস্তরণ নয়, বরং তটিনীর মত, অনিবার্য প্রশ্নের আঘাতে চঞ্চল হয়। সাধারণতঃ আত্মপ্রত্যয় শব্দটিকে যে সীমিত অর্থে ধরা হয় তা জড়ত্বের নামান্তর, বরং এই অর্থেই শিল্পীরা প্রত্যয়ী যে তাঁদের সৃজন-ইচ্ছার সজীবতা ঋতুচক্রে বর্ণিল; এবং এমনকি তাঁদের নতুন পথে যাত্রার স্বাধীনতাও অবাধ। তাঁদের প্রত্যয় কখনো প্রশ্নে ও দ্বন্দ্বের আক্রমনে আহত, কখনো দিশাহীনতায় তরঙ্গিত আর কখনো বা উদ্যত আঘাতের নিচে বিক্ষুব্ধ; কিন্তু এই তরঙ্গিত, বিক্ষুব্ধ ও আহত মনকেও এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে শিল্পীর একমাত্র প্রত্যয়ী সত্তার---সেইসব অনুভবের শিল্প-সম্ভাবনা। আসলে যার মনের বিস্ময় ম'রে গিয়েছে, যে নতুনকে নতুন ব'লে চিনতে পারে না, যার মন সংক্রামক প্রশ্নের আঘাতে উদ্বেল হয় না সেই নিশ্চিত পুরুষ শুধুই পুরুষ, কোনকালেই শিল্পী নয়। তাই কীট্‌স্‌রা পলায়নের কথা ব'লে এবং সদর রাস্তা জেনেও সত্য-রূপ

বাস্তবের সহবাস করে। এবং একই ভাবে দ্বন্দ্বের অভিঘাতে সমৃদ্ধ হয়েই একজন ইয়েট্‌স্ এর প্রতিষ্ঠা, যদিও তাঁর প্রতিটি বর্তমান নিদারুণ ভাবে অনিশ্চিত বিহ্বলতায় অভিষিক্ত।

আনাতোল ফ্রাঁস মাছির চক্ষু-সৌভাগ্যে ঈর্ষান্বিত হয়েছেন, অথচ ভেবে দেখেননি সত্যিই মানুষের একাধিক জোড়া চোখ আছে: সে চোখ হল তার বিভিন্ন সত্তা বা 'আমি'গুলো। বস্তুত একজন 'আমি'র অভ্যন্তরে অনেক 'আমি'র বাস; নিষ্ক্রিয় মন তাদের খোঁজ জানে না, হয়ত দৈবাৎ নিজের অসম্ভব অপরিচিত একটি রূপ দেখে ক্ষণকালের জন্যে বিস্মিত কিংবা উদ্দীপিত হয়, তারপর প্রশ্নহীন মন হারিয়ে ফেলে সেই পরিচয়ের গৌরব। কিন্তু আরেকটি মন নিরন্তর প্রচেষ্টায় অনাহূতভাবেও অন্বেষণ করে সেইসব দুর্বার ও ক্ষীণ, শীতল ও উষ্ণ, শাশ্বত ও তাৎক্ষণিক 'আমি'গুলোর। তারপর নিখিল সংগ্রামের আলোয় বিবদমান সত্তাগুলোকে দেখে কম্পাস ঠিক করে, পথ জেনে নেয়, এবং তারো পরে এক নতুন জগতের কাহিনী সেই মন থেকে সংক্রামিত হয় কলম আর কাগজে।

অতএব, শিল্পীরাও সামাজিক মানুষ এই কথা ব'লে গৌরব না ক'রে বরং বলা উচিৎ শিল্পীরা সমাজের অন্য মানুষ, কখনো অনন্য। তাই তাঁকে সামাজিক দায়িত্বের কথা ব'লে সুনির্দিষ্ট ভবিষ্যৎ পথ স্মরণ করিয়ে দিয়ে আত্মপ্রসাদ লাভ করা গেলেও অচিরেই সেই শিল্পীর উদ্দেশ্যে গাঁথা রচনার সময় এসে যাবে। কেননা শিল্প তো সাংবাদিকতা নয়—নীতিমালার কথা স্মরণ ক'রে পথ চলতে গিয়ে নিজের স্বভাবজ চরিত্রকে ভাঙতে হবে, অনাবশ্যক 'আমি'গুলোকে ছাঁটতে হবে; কিন্তু সেই মানুষ যাঁর চরিত্র নির্দিষ্ট খাপের উপযুক্ত হওয়ার জন্যে নিজস্বতাকে বলি দেয়, অনেক অনুভবকে উপেক্ষা করে, অবহেলা করে শিল্পীদের রায়ে তিনিই চরিত্রহীন। কেননা চরিত্রহীন ব্যক্তি কখনো শিল্পী নয়; অবশ্য চরিত্র শব্দটি এ ক্ষেত্রে বিশ্লেষণের অবকাশ রাখে। কোন্ গভীর অর্থে শিল্পী চরিত্রবান বা চরিত্রহীন, যদি তা-ই প্রশ্ন হয় তবে নির্দ্বিধায় বলব যিনি আপন উপলব্ধি ও অনুভবকে, অর্থাৎ নিজেকে ফাঁকি দেন, তিনিই চরিত্রহীন। ফলে একজন বোদলেয়র যখন তাঁর চেতনাকে মর্যাদা দিয়েও গণিকা-সঙ্গে অভ্যস্থ হন তখনো তিনি—গণিকাকেও প্রেমিকার আসনে অভিষিক্ত করতে পারেন বলেই—চরিত্র হারান না, কিন্তু বোদলেয়র নামের একজন সামাজিক মানুষের চরিত্র তাতে ট'লে উঠতে পারে, বা ওঠে। ঠিক তেমনি বিশেষ উদ্দেশ্যকে চরিতার্থ করতে গিয়ে আপনার সূক্ষ্ম সত্তাটিকে যাঁরা উপেক্ষা করবেন তাঁদের শিল্পী-চরিত্র আর বজায় থাকে না। তাঁরা উদ্দেশ্যমূলক প্রগল্‌ভ পদ্য নির্মাতা হতে পারেন, কিন্তু কখনোই কবি নন, শিল্পী নন।

নিজের অনুভবকে ফাঁকি দিয়ে সব হতে পারে শুধু শিল্প সৃষ্টি সম্ভব নয়, তাই ট্রাফিক পুলিশের মত দিক নির্দেশক শিল্পের রাজ্যে অচল। কোন মহাপুরুষও একজনমাত্র শিল্পীকে আপন নির্দেশে চালাতে পারেনি, কোন জিউস কোন প্রমিথিউসকে টলাতে পারেনি, পারে না। যুগে যুগে তাই প্রমিথিউসরাই শিল্পী, যারা মুমুক্ষু, আর্তনাদ করে মুক্তির জন্যে, কিন্তু আত্মসমর্পনের বিনিময়ে মুক্তি মাগেনা। তাই যে দেশে শিল্পীদের ওপর সমাজ ও রাজনীতির দাবী বেশি সে দেশে শিল্পী ম্রিয়মান, শিল্প সংকুচিত।

২

সূক্ষ্মতা : অনুভূতি, প্রকাশ ও পরিবেশনার সূক্ষ্মতা সাহিত্য-শিল্পের অনিবার্য অঙ্গীকার ; অথচ অনভিজ্ঞ পাঠক সূক্ষ্মতার বহুমুখী আকর্ষণে দিশাহীন, ফলে তিনি দুর্বোধ্যতার অভিযোগ জানিয়ে সাহিত্য-শিল্পের প্রতি পেছন ফিরে দাঁড়ান। কিন্তু শিল্পী বারবার ধাক্কা দিয়ে ক্রমশ যে জগতে অনুপ্রবেশের অধিকার লাভ করেছেন, সে জগত একজন পাঠক অতর্কিতে বোঝার আশা করেন কী ভাবে। বরং একবার ধাক্কা দিয়ে যে অস্পষ্টতাকে তিনি দেখলেন সে অস্পষ্টতাই তাঁকে ক্রমশ স্পষ্টতায় নিয়ে যেতে সক্ষম ; অথচ তিনি তাঁর ক্ষুব্ধ অভিযোগ জানিয়ে নিরস্ত হয়ে সেই উজ্জ্বল সম্ভাবনার মৃত্যু ঘটালেন। এখানে অস্পষ্টতা শব্দটি বিশেষ পক্ষপাতের দাবী রাখে, কেননা ভালো লেখা অস্পষ্ট মনে হওয়াই স্বাভাবিক, অন্ততঃ প্রথমপাঠে। তাই অস্পষ্টতা দেখে নিস্পৃহায় পিছন ফিরে দাঁড়ালে ঠকার সম্ভাবনা প্রচুর। বরং সেই লেখাটিই অপাঠ্য যা পড়ে কোন অস্বচ্ছ রহস্যময় জগত উঁকি দেয়না, হাতছানি দেয়না কোন অচেনা বোধ, শুধু শূন্যতার তির্যক অন্ধকার কিংবা বড়োই সাদামাটা চিত্রগীতহীন নগ্ন বক্তব্য ধরা পড়ে।

তাই হয়তো আবহমানকালের ইতিহাসে শিল্পের দুই সমান্তরাল যাত্রা---কোনদিন এরা মিলবার নয়। একদিকে সংগ্রামে দ্বন্দ্বে নিজের রক্ত ও দেহের প্রতিটি অনু দিয়ে অনুভবের মাধ্যমে ভালোবাসা এবং এমনি সব বোধকে সংহতভাবে প্রকাশ করার নিরন্তর প্রয়াস ; আরেকদিকে মানুষের অভাব অভিযোগ সুখ-দুঃখের তাৎক্ষনিক অনুভূতিকে সরাসরি রূপায়নের প্রচেষ্টা সূক্ষ্ম-বোধের সাহিত্য আর লোকায়তিক সাহিত্যের দুই ভিন্ন গতিপথ পরস্পর লীন হবে না, হতে পারে না। তাই লোক-সাহিত্য, লোক-সংস্কৃতি, লোক-সঙ্গীত ইত্যাদি পৃথক রাজ্যের অস্তিত্ব সুপ্রকট। কিন্তু যেদিন সমাজের প্রত্যেকটি মানুষ শিক্ষিত হয়ে উঠবে সেদিন নতুনভাবে লোক-সাহিত্য সৃষ্টির সম্ভাবনা সঙ্গত ভাবেই ক'মে যাবে ; যেমন প্রতীচীতে আজ লোক-শিল্পের নমুনা লুপ্ত-সম্পদ হিসেবেই আদৃত। অবশ্য তাই ব'লে সকল শিক্ষিত ব্যক্তিই শিল্পের উক্ত অনুক্ত সব কথাই বুঝতে পারবেন, এ কথা নিশ্চয় বলবোনা, কেননা শিল্পীর সাথে তাঁদের যে ব্যবধান তা

মৌলিক এবং কোনকালে মেটবার নয়। অর্থাৎ ইয়েট্স্-এর মতো যাঁরা সুক্ষ্যতা ও দ্বন্দ্বে নিজের রক্ত মাংসের অনুভবে নিরন্তর প্রসূতি-যাতনায় শিল্প-সৃষ্টি করছেন, সেই নির্ভেজাল শিল্পীর সাথে সমাজের সাধারণ মানুষের দূরত্ব সুনিশ্চিত। এ দূরত্ব ঘোচার নয়, কোনদিন ঘুচবে না। কেননা শিল্পীর সীমানা কালের বুকে লেখা নেই, 'একজন সেক্সপীয়রের মৌল বাক্যাবলী তাঁর কালের দাবী মিটিয়েছে, আমাদের কালের মেটাচ্ছে, আগামীতে মিটাবে, এবং এমনকি তাঁর আগের কালের দাবীও মেটাতে সক্ষম।

অথচ তিনি যদি সমাজের দাবী ও অনুশাসন মেনে চলতেন তবে বড়জোর একজন পণ্ডিত হতে পারতেন, কিন্তু কবি নন। অবশ্যই মানতে হবে কবি-সাহিত্যিকরা স্বয়ম্ভু নন, সমাজেই জন্মান, কিন্তু সমাজ থেকে বেরিয়ে আসেন, অবশ্য অস্বীকার ক'রে নয়, অতিক্রম করে। শিল্পীরা সামাজিক কাজে জড়িয়ে পড়লে শিল্পের সমূহ ক্ষতি অবশ্যম্ভাবী, বরং দেখা গিয়েছে সামাজিক ক্রিয়াশীলতায় নির্লিপ্তি তাঁর মন ও মানসকে ভাবনা ও রচনার জন্যে প্রস্তুত ক'রে দেয়। তাই একজন রঁমা রলাঁকে কর্মী পুরুষ হতে গিয়ে আহত সৃজন পুরুষের কাছ থেকে চরম দণ্ড নিতে হয়।

বাল্মিকীর মানসভূমিতেই রামের জন্মভূমি যেমন সত্য তেমনি সত্য শিল্পীর মানস জগতে ভিয়েতনাম যুদ্ধ সম্পর্কে যে দ্বন্দ্ব চলছে তা-ও। কিন্তু তিনি যদি সশরীরে যুদ্ধে যোগ দেন এবং তৎকালেই শিল্প-কর্মে লিপ্ত হন তবে তাঁর স্বাধীন ভাবনা ব্যাহত হবে; হয়তো তিনি সত্যের পক্ষেই যুদ্ধ করবেন, কিন্তু তবুও সত্যকে যথাযথ প্রকাশের জন্যে যে নিরাসক্তির প্রয়োজন, সেই দুর্লভ সম্পদ তিনি হারাবেন; ভ্রান্তিকে তিনি আর বেদনা দিয়ে অনুভব করবেন না, প্রমত্ত রোষে অনুভব করবেন। এমনি দেখেছি আমরা, বাঙলা দেশে, সুকান্তকে, কবিতায় যিনি শত্রুকে চিনিয়েছেন, তার বিরুদ্ধে যুদ্ধের আহ্বান জানিয়েছেন। কিন্তু তার ফলে তাঁর বেশির ভাগ কবিতায় কবিদের সেই অলৌকিক সম্পদ, বেদনা বোধের একটুও ছাপ নেই বলে তা গদ্যের মত সটান, এমন কি প্রায়-ক্ষেত্রেই শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ।

৩

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর একটি কথা বারবার বলেছেন যে চোখ-কান বুঁজে শিল্পী হওয়া যায়না, সাধু সন্ন্যাসী হওয়া যেতে পারে। অর্থাৎ শিল্পীকে চক্ষুষ্মান হতে হবে, প্রতিটি বিষয়কে তিনি এমন জাগ্রত চেতনায় ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখেন যে তাতে তিনি ত্রিকালের যোগসূত্র কখনো হারান না। এই বাস্তবতাকে জানা ও অনুভব করা এবং সেই অনুভূতিকে শিল্পে রূপায়নই শিল্পীর কাজ; এবং তারো পরে যদি তিনি সেই

অনুভূতিসমূহের জন্মদাতা উৎসের সাথে একাত্ম হতে চান, হতে পারেন, কিন্তু একটি শর্তে—পক্ষপাত, ঈর্ষা ইত্যাকার হীন চেতনায় শিল্প আক্রান্ত হতে পারবে না। অর্থাৎ সেই অলীক ও বাস্তব যন্ত্রণার আধারই শিল্পী, যন্ত্রণার উৎসটি নন তিনি। তাই বাস্তবের চেয়ে পরাবাস্তবের সাথে, লৌকিকের চেয়ে অলৌকিকের সাথে, দেহের চেয়ে দেহাতীতের সাথে, ব্যক্তের চেয়ে অব্যক্ত, প্রকাশের চেয়ে অপ্রকাশ, বর্ণিতের চেয়ে বর্ণনাতীত ও বচনীয়ের চেয়ে অনির্বচনীয়ের প্রতি শিল্প ও শিল্পীর পক্ষপাত। এবং তাই শিল্প-সাহিত্যে শেষ কথা নেই, এক মধুর রহস্যময়তা শিল্পের আঙিনায় 'শুধু অকারণ পুলকের' এক তীব্র বোধকেও সাহসে ও আনন্দে প্রকাশ করতে পারে।

অর্থাৎ শঠ ও প্রবঞ্চক কখনো শিল্পী হতে পারেনা, বরং যিনি বঞ্চিত, এবং যিনি প্রতারনাকে দেখে শিহরিত হয়েছেন, তীব্র যাতনা বোধে আক্রান্ত হয়েছেন তিনিই শিল্পের সহযাত্রী। তাই বলতে চাই বাস্তবক্ষেত্রে ঘটনার উপাদান হয়ে শিল্পের উপকরণ হওয়া যায়, কিন্তু স্রষ্টা হতে গেলে সেই উপকরণ দিয়ে মালা রচনার ক্ষমতাই প্রয়োজন। টলস্টয় তাঁর সৃষ্টি 'ওয়র এ্যাণ্ড পীস' যুদ্ধে অংশগ্রহণকালে লেখেননি, তারো পরে দীর্ঘদিনের অনুভব ও উপলব্ধির নির্যাস উপঢৌকন দিয়েছেন সেই দুর্লভ শিল্পীসুলভ নিরাসক্তি অর্জনের পর। অতএব, শিল্পী আর পার্থিব মানবের মধ্যে যে দূরত্ব, সে দূরত্ব অক্ষয় হোক, শিল্পী প্রতিটি বর্তমানকে রক্তমাংসের হৃদয়ে অনুভব করার জন্যে জাগতিক আড়ম্বর থেকে শৈল্পিক-অবসর লাভ করুন। অর্থাৎ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বক্তব্যকে ধার করে বলা যায় চোখ-কান খোলা রেখে শিল্পী তাঁর অনুভূতির তোরণকে দ্বন্দ্ব ও সংশয়ে ভাবনার জন্যে অবাধ উন্মুক্ত রাখুন, আর জাগ্রত রাখুন তাঁর মনের অগাধ আকাশকে।

# 'বিদেশিনী'

আলতাফ হোসেন

'আমাদের এই জগতের মধ্যে একটি কোন্ বিদেশিনী আনাগোনা করে—কোন্ রহস্যসিন্ধুর পরপারে ঘাটের উপর তাহার বাড়ি—তাহাকেই শারদপ্রাতে মাধবীরাত্রিতে ক্ষণে ক্ষণে দেখিতে পাই—হৃদয়ের মাঝখানেও মাঝে মাঝে তাহার আভাস পাওয়া গেছে, আকাশে কান পাতিয়া তাহার কণ্ঠস্বর কখনো বা শুনিয়াছি।'

'বহু-বাল্যকালে' এই 'বিদেশিনী'-র সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় হ'য়েছিল। তারপর সে পরিচয় ক্রমে বেড়েছে। কবিতায় তেমন আভাস দেননি কৈশোরে, যৌবনে কখনো ব্যাকুল কখনো উচ্ছ্বসিত হয়ে বলেছেন 'বিদেশিনী'-র কথা, বৃদ্ধবয়সে সে ব্যাকুলতা ও উচ্ছ্বাস আর একভাবে স্পষ্টতা পেয়েছে।

কে এই 'বিদেশিনী' এবং কৈশোরে যে-'বিদেশিনী'-র 'অপরূপচিত্র', রবীন্দ্রনাথের মনে অঙ্কিত হ'য়ে গিয়েছিল তারই কথা কি রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যৌবনে, তাকেই স্মরণ করেছেন শেষ বয়সেও?

কিছু কবিতা ও গানের আলো-আঁধারিতে আমরা এই পথের অনুসরণ করতে পারি।

'তোমায় বিদেশিনী সাজিয়ে কে দিলে।'—এই গানের কলিটির মধ্যে রবীন্দ্রনাথ সম্ভবত প্রথম 'বিদেশিনী'-র পরিচয় পান—না, পরিচয় বলা ঠিক হবে না, 'বিদেশিনী' রূপকল্পটি তাঁকে গভীরভাবে নাড়া দেয়। কী বোঝাচ্ছে এ কলি? তোমায় সাজিয়ে দিল যে সে হ'লো বিদেশিনী না যাকে সাজিয়ে দেয়া হ'লো সে হ'লো বিদেশিনী? এবং 'বিদেশিনী'ই বা কেন? 'বহু-বাল্যকালে' কি রবীন্দ্রনাথ

এ-কলির অর্থ বুঝেছিলেন? দেখেছিলেন কি 'বিদেশিনী'-র পশ্চাতে কোনো দেহাতীত ছায়া? না বোধহয়। তাঁর কৈশোরিক মন যে-'বিদেশিনী'কে ঘিরে তখন স্বপ্নজাল রচনা করেছে, রহস্যময়তায় সে তখনো আবৃত হয়নি। একটু স্পষ্ট হবে তাঁর 'বহু-বাল্যকালে'র রচনা 'বনফুল'-এর সরলতা আর ভালোবাসায় ভরা কমলাকে মনে আনলে। যে-কমলার চরিত্র তিনি এঁকেছেন তাঁর এগার থেকে বারো বৎসর বয়সের মধ্যে সেই কমলার সন্ধান তিনি তাঁর 'বহু-বাল্যকালে'রই অত্যন্ত ভালো লাগা একটি গানের পংক্তির একটি শব্দের অপূর্ব দ্যোতনায় পেয়ে থাকবেন হয়তো। এ-প্রসঙ্গে এরপর আমাদের মনে আসে 'নলিনী'র কথা। 'ভগ্ন-হৃদয়'-এর 'নলিনী' চরিত্রটি আঁকা হয়েছে অনেকে বলেন বোম্বাইয়ের আনা তরখড়কে মনে রেখে। আনা তরখড়ই সত্যিকারের অর্থে 'বিদেশিনী' হ'য়ে রবীন্দ্রনাথের জীবনে আসেন প্রথমবারের মতো। যদি মেনে নিই আনা তরখড়ই 'ভগ্ন-হৃদয়ে' পরিচিত হয়েছেন 'নলিনী'-রূপে তাহ'লে বলতে পারি 'নলিনী'-ই রবীন্দ্র-সাহিত্যের প্রথম 'বিদেশিনী'। আবার মনে করা যাক্ 'তোমায় বিদেশিনী সাজিয়ে কে দিলে' পংক্তিটির কথা; সঙ্গে সঙ্গে যদি পড়ি 'নলিনী'র সাজ-প্রসঙ্গের বর্ণনা: সখী শিশিরে মুখানি মাজি/সখী লোহিত বসনে সাজি/দেখ বিমল সরসী আরশীর 'পরে অপরূপ রূপরাশি' মনে হয় 'বহু-বাল্যকালে'র তীব্র ভালো লাগা সেই গানের পদটি রবীন্দ্রনাথের মন তখনো অনেকখানি জুড়ে।

আর এক বিদেশিনীর কথা আমাদের মনে আসছে সঙ্গে সঙ্গে। কী গুণে স্কটের সেজো দুহিতাটি কিশোর রবীন্দ্রনাথকে টেনেছিলেন জানি না, আমরা দেখবো এই বিদেশিনীর সান্নিধ্যে দু'দিন কাটানোর স্মৃতিকে রবীন্দ্রনাথ কতটা মহিমান্বিত ক'রে দেখেছেন: 'মেটেনা মেটেনা তবু তিয়াষ আমার;/শত ফুলদলে গড়া সেই মুখ তার/স্বপনেতে প্রতি নিশি/হৃদয়ে উদিবে আসি/এলানো কুন্তলজাল, আকুল নয়নে/সেই মুখ সঙ্গী মোর হইবে বিজনে।' তারপর শেষের দিকের দু'টি সারিতে: 'ক্ষুদ্র এ দুদিন তার শত বাহু দিয়া / চিরটি জীবন মোর রহিবে বেষ্টিয়া।' উদ্ধৃত দ্বিতীয় পংক্তিটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। বোধহয় মনে আসতে পারে 'বহু-বাল্যকালে' ভালো লাগা সেই গানের কলিটির কথা আবারো।

সূত্র মিলবে কেবলি 'বিদেশিনী' রূপকল্পটি 'বহু-বাল্যকালে' রবীন্দ্রনাথকে নাড়া দেয় গভীরভাবে, সত্যিকারের বিদেশিনীর সংস্পর্শে তা হয় গভীরতর। তাহ'লে রবীন্দ্রনাথের বাল্যকালে ও কৈশোরে 'বিদেশিনী' রক্তমাংসের মানবীরূপেই সাজে-সজ্জায় অপরূপ হ'য়ে তাঁর মানসগোচর হয়েছিল বোঝা যাচ্ছে।

বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে জীবনের প্রায় শেষ পর্যন্ত নানাভাবে এই 'বিদেশিনী' রবীন্দ্রনাথকে দেখা দিয়েছে, নানারূপে।

২

এরপর যে 'বিদেশিনী' রবীন্দ্রনাথের জীবনে এসেছে, তাকে চেনা আমাদের পক্ষে সহজ নয় আর। পরিণত যৌবনে রবীন্দ্রনাথ বলছেন এই 'বিদেশিনী'র কথা। প্রসঙ্গত শুধুমাত্র উল্লেখ করবো এই 'বিদেশিনী'র দুয়ারে পৌঁছতে রবীন্দ্রনাথকে 'প্রভাতসঙ্গীত'-এর দু'টি তিনটি কবিতাসোপান অতিক্রম করতে হয়েছে। 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতার 'দূর হ'তে শুনি যেন মহাসাগরের গান' এবং 'প্রভাত-উৎসব'-এর 'আকাশ পারাবার বুঝি হে পার হবে/আমারে লও তবে আমারে লও তবে' পংক্তিগুলির কথা মনে রাখলেই চলবে।

কিছু কবিতা ও দু'টিমাত্র গানের আলোকে এবার আমরা 'বিদেশিনী'কে চিনে নেবার চেষ্টা করতে পারি।

খুব স্পষ্ট ক'রে 'বিদেশিনী'র উল্লেখ যে কবিতায় প্রথম পাই সেটি হ'লো 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'। 'বিদেশিনী'এ কবিতায় অমোঘ নিয়তির মতো রবীন্দ্রনাথকে নীরবে কেবলমাত্র অঙ্গুলি-সংকেতে নিয়ে চলেছে 'সোনার তরী'তে। ভেসে চলেছে তরণী, সম্মুখে 'বিদেশিনী'র হাসিময় আকর্ষণীয় আহ্বান, চতুষ্পার্শ্ব জুড়ে সিন্ধুর অবিরাম গর্জন, আর সময় সন্ধ্যার কাছাকাছি। এ-সবই অনুকূল এক চরম অনিশ্চিত সম্ভাবনার, অবশ্যম্ভাবী ভবিতব্যের। কিন্তু না, ভয় পাচ্ছেন না কবি, মনে তাঁর অপরিসীম কৌতূহল, কেননা তাঁর মনে হচ্ছে তিনি চলেছেন কিছু একটার 'অন্বেষণে', 'বিদেশিনী' তাঁকে 'কি আছে হোথায়' দেখিয়ে দেবে নিশ্চয়। একবার মনে হচ্ছে 'বিদেশিনী' তাঁকে নিয়ে চলেছে তার আপন আলয়ে, যে আলয় 'ঊর্মিমুখর সাগরের পার। মেঘচুম্বিত অস্তগিরির চরণতলে' অবস্থিত হ'তে পারে। কিন্তু 'বিদেশিনী' কোনো প্রশ্নেরই জবাব দেয় না। শুধু হাসে। এদিকে কবির মনে হচ্ছে বাইরে ঝড় শুরু হয়েছে প্রবল, জলোচ্ছ্বাসের শব্দ এসে কানে বাজছে ভীষণ, আর মনে হচ্ছে যেন পৃথিবী ছাপিয়ে অসীম রোদনধ্বনি শোনা যাচ্ছে, কিন্তু তারই মাঝে আবার হিরণতরণী ভাসছে, তার গায়ে ঝিকমিক করছে সন্ধ্যার আলো, আর সে তরণী-মধ্যেই 'বিদেশিনী' ব'সে হেসে যাচ্ছে মধুর হাসি। কেন এ হাসি? কেন এ বিলাস?

এরপর কবির মনে পড়ছে এই 'বিদেশিনী' তাঁকে 'কে যাবে সাথে' ব'লে কি ভাবে ডাক দিয়েছে এবং হাসির জাদুতে তাঁকে সম্মোহিত করেছে। প্রকৃতি কখনো উত্তাল

কখনো শান্ত হয়েছে কিন্তু তরী থামেনি, অবিশ্রাম ভেসে চলেছে। কবি আবার শুধোচ্ছেন ব্যাকুল হ'য়ে পূর্ণতার সন্ধান এই 'বিদেশিনী' দিতে পারবে কিনা। কিন্তু 'বিদেশিনী' আগের মতই নীরব।

রাত আসছে, স্বপ্নময় রাত। 'বিদেশিনী'র দেহসৌরভ বাতাসে ভাসতে শুরু করেছে। এমনকি 'বিদেশিনী'র কেশরাশি কবির গায়ে এসে উড়ে পড়ছে ('বিদেশিনী'কে আর একটু অন্তরঙ্গ ক'রে পাচ্ছেন কবি এত ব্যাকুলতার পর, দিনের ক্লান্তি শেষে যখন রাতের নিমগ্নতা নামলো?) কিন্তু কবি তার স্পর্শ চাচ্ছেন প্রাণে-মনে, চাচ্ছেন 'বিদেশিনী' তাঁর সঙ্গে একান্ত হয়ে থাক।

'নিরুদ্দেশ যাত্রা'র 'বিদেশিনী'র পুরো রূপটি কিন্তু বিবৃত হয়েছে 'মানসসুন্দরী' কবিতায়:

এখন ভাসিছ তুমি
অনন্তের মাঝে; স্বর্গ হতে মর্ত্ত্যভূমি
করিছ বিহার; সন্ধ্যার কণককবর্ণে
রাঙিছ অঞ্চল;
... ... ... ... ... ...
কখন অজ্ঞাতে আসি ছুঁয়ে যাও প্রাণ
সকৌতুকে; করি দাও হৃদয় বিকল,
অঞ্চল ধরিতে গেলে পালাও চঞ্চল
কলকণ্ঠে হাসি, অসীম আকাঙ্খারাশি
জাগাইয়া প্রাণে, দ্রুতপদে উপহাসি
মিলাইয়া যাও নভোনীলিমার মাঝে।

এখানেও একই কথা রহস্যময়ীটির উদ্দেশে:

কোন বিশ্বপার
আছে তব জন্মভূমি। সংগীত তোমার
কত দূরে নিয়ে যাবে, কোন কল্পলোকে
আমারে করিবে বন্দী, গানের পুলকে
বিমুগ্ধ কুরঙ্গসম? এই যে বেদনা,

এর কোনো ভাষা আছে? এই যে বাসনা
এর কোনো তৃপ্তি আছে? এই যে উদার
সমুদ্রের মাঝখানে হ'য়ে কর্ণধার
ভাসায়েছ সুন্দর তরণী, দশ দিশি
অস্ফুট কল্লোলধ্বনি চির দিবানিশি
কী কথা বলিছে কিছু নারি বুঝিবারে
এর কোনো কূল আছে?...

হাসিতেছ ধীরে
চাহি মোর মুখে, ওগো রহস্যমধুরা।
কী বলিতে চাও মোরে প্রণয়বিধুরা
সীমন্তিনী মোর, কী কথা বুঝাতে চাও।
কিছু ব'লে কাজ নাই—শুধু ঢেকে দাও
আমার সর্বাঙ্গমন তোমার অঞ্চলে,...

কিন্তু বিস্তৃত বর্ণনা সত্ত্বেও 'বিদেশিনী' 'মানসসুন্দরী'তে সংহত রূপ পায়নি। চিত্রকল্প, ঘটনা এবং ভাষার সাদৃশ্য দেখাতেই 'মানসসুন্দরী' থেকে এতো পংক্তি উদ্ধৃত করা হ'লো। 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'র প্রায় সব তথ্যই 'মানসসুন্দরী'তে বিবৃত হয়েছে আমরা দেখতে পাই। কিন্তু 'মানসসুন্দরী'তে রহস্যময়ীটিকে বিচিত্রভাবে কবি অনুভব করেন, কখনো সে আর কিছু নয় কবির কবিতা, কখনো বিশ্বপ্রকৃতি, কখনো পরিচালিকা ও নিয়তি, কখনো এমনকি কবিরই কবিপ্রতিভা। 'মানসসুন্দরী'তে কিছুক্ষণ পরপরই রহস্যময়ীটি রূপান্তরিতা হচ্ছে; এবং এভাবে বহু বিচিত্র রূপে কবির উদ্দিষ্টা হচ্ছে সে। আর 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'য় সে কেবল 'বিদেশিনী'; হ'তে পারে বহুবিচিত্ররূপের একটিমাত্র আধার এই 'বিদেশিনী', কিন্তু শুরু থেকে শেষাবধি এই কবিতায় একই ভঙ্গিতে সে হয়েছে কবির উদ্দিষ্টা।

'সোনার তরী' এবং 'চিত্রা'র আরো এবং আর কয়েকটি কাব্যগ্রন্থের কিছু কবিতা ও কিছু গান থেকে নানা ভাবে আমরা 'বিদেশিনী'কে বের ক'রে আনতে পারি, কিন্তু প্রয়োজন নেই। সেসব কবিতায় 'বিদেশিনী'র এমন কোনো নতুন রূপ উদ্‌ঘাটিত হয়নি, যা 'মানসসুন্দরী' ও 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'য় অনুপস্থিত।

দু'টি গানের উল্লেখ করবো এবার। 'আমি চিনি গো চিনি তোমারে ওগো বিদেশিনী'; এ গানটিতেও আছে সিন্ধুর কথা, সিন্ধুপারের কথা। এই 'সিন্ধুপার' 'মানসসুন্দরী'তে হয়েছিল 'বিশ্বপার'। 'বিদেশিনী'র বাস বিশ্বপারে, সিন্ধুপারে। শারদপ্রাতে কবি তাকে দেখেছেন, মাধবী রাত্রিতেও। এই অভিজ্ঞতার কথা তিনি 'জীবনস্মৃতি'তে স্মরণ করেছেন আবারো। সুরের মন্ত্রগুণে 'বিদেশিনী'র এক অপরূপ মূর্তি জেগে উঠেছে কবির মনে। 'বিদেশিনী'কে কবি বিশেষিত করেছেন 'জীবনস্মৃতি'র পাতায় 'বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বিমোহিনী' ব'লে। গানের সুর তাঁকে নিয়ে উপস্থিত করেছে 'বিদেশিনী'র দ্বারে এবং তিনি 'বিদেশিনী'র উদ্দেশে বলছেন :

ভুবন ভ্রমিয়া শেষে আমি এসেছি নূতন দেশে
আমি অতিথি তোমারি দ্বারে ওগো বিদেশিনী ।।

এই 'বিদেশিনী'ও 'মানসসুন্দরী' এবং 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'র 'বিদেশিনী' অভিন্ন-হৃদয়া।

আর একটি গান 'উদাসিনী বেশে বিদেশিনী কে সে নাইবা তাহারে জানি'। প্রথম পংক্তিতেই দেখা মেলে আমাদের পরিচিতা 'বিদেশিনী'র। এ 'বিদেশিনী'কে বলা হয়েছে 'উদাসিনী', 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' এবং 'মানসসুন্দরী'র 'বিদেশিনী'ও কি তা-ই ছিল না ? 'মানসসুন্দরী'তে কবি রহস্যময়ীটিকে জানতে চাচ্ছেন, পেতে চাচ্ছেন সম্পূর্ণ ক'রে, 'বহু-বাল্যকালে' দেখা হত দুইজনে আধ চেনাশোনা' ব'লে শৈশবের সুখের দিনগুলি স্মরণ করিয়ে দিতে চাচ্ছেন; আর 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'য় 'বিদেশিনী'টি রবীন্দ্রনাথের পরিচিতা নয়, কবি তাকে জানবার ইচ্ছায় তার অনুসরণ করেছেন, তাকে জানতে, তার উদ্দেশ্য জানতে অত্যন্ত ব্যাকুল হয়েছেন; কিন্তু এই গানে আমরা দেখি 'বিদেশিনী'কে জানার আশা কবি পরিত্যাগ করেছেন, উদাসী হয়ে তিনিই বলছেন 'নাই বা তাহারে জানি', বলছেন : 'রঙে রঙে লিখা আঁকি মরীচিকা মনে মনে ছবিখানি।' কবি যেন বুঝতে পেরেছেন 'বিদেশিনী' মরীচিকার মতই, কোনোদিনই তাকে পাওয়া যাবে না আর। কবি যেখানে বসে আছেন হঠাৎ আবিষ্কার করলেন সেটি একটি ভাঙ্গা ঘাট—'বিদেশিনী'র তরী কবেই এ ঘাট ছেড়ে মহাসমুদ্রে তীর-গতিতে পাড়ি দিয়েছে। কবি অবশ্য ব্যাকুল নন আর 'বিদেশিনী'র সন্ধানে ছুটতে। 'যারা চলে যায় ফেরে না তো হায় পিছু পানে আর কেউ' জেনেও কবি মুগ্ধ আলস্যে ব'সে থেকে পলায়মান ঢেউ গুনতে পারছেন। শেষ দু'টি পংক্তিতে কবি বলছেন :

মনে জানি, কারো নাগাল পাবনা—তবু যদি মোর উদাসী ভাবনা
কোনো বাসা পায় সেই দুরাশায় গাঁথি সাহানায় বাণী ।।

মনে মনে কবি নিশ্চিত 'বিদেশিনী'র সন্ধান পাওয়া যাবে না। সুতরাং বাসনাও নেই আর, ভাবনা যা আছে তা-ও 'উদাসী'। এখন মন যদি কোথাও শান্তি পায় তো পাক কিন্তু এই 'উদাসী ভাবনা'-ও যে দুরাশা তা-ও কবি ব'লে দিচ্ছেন।

৩

রক্তমাংসের বিদেশিনী ভিক্তরিয়া ওকাম্পো তাঁর কোন্ বিশেষ গুণে ও রূপে তেষট্টি বৎসর বয়সের রবীন্দ্রনাথকে মুগ্ধ করেছিলেন জানিনা, রবীন্দ্রনাথের অনুরাগের সঙ্গে 'বিদেশিনী'-মোহেরও সাধর্ম্য কেন যেন বারবার খুঁজে পাই আমরা। 'বিদেশিনী'র প্রতি আশৈশবলালিত আকর্ষণ ভুলে যেতে পারি না কিছুমাত্র যখন তাঁর ওকাম্পোর উদ্দেশে নিবেদিত কবিতাগুচ্ছ পাঠ করি এবং তখন এই সূত্রটিও যেন আপন আবরণ খুলে দেয় ধীরে ধীরে যে, যে'-বিদেশিনী' এক অপার্থিব সত্তা, কখনো বিশ্বপ্রকৃতি, কবিতা কিংবা কবির আপন কবিপ্রতিভা, নিয়তি বা পরিচালিকা ( এসব পরিচয়ই তো আমরা আলোচিত রচনাগুলিতে পেয়েছি ) সেই 'বিদেশিনী'র সঙ্গে পৃথিবীর কোনো না কোনো মানসীর ( অস্তিত্বময়ীর ? ) যোগ শুরু থেকেই আভাসিত হ'য়ে ছিল। ভিক্তরিয়া ওকাম্পো যে-ভঙ্গিতে কবির উদ্দিষ্টা হন, সেই ভঙ্গিটির আবহমান আংশিক উপস্থিতিই এই বোধের জন্ম দেয়।

ওকাম্পোর উদ্দেশে রচিত একটি কবিতায় আছে : 'জানি না তো ভাষা তব, হে নারী, শুনেছি তব গীতি/প্রেমের অতিথি কবি, চিরদিন আমারি অতিথি।' আরেকটিতে আছে : 'আজ হতে কার পরশ লাগি/পথ তাকিয়ে রইব জাগি ;' 'বিদেশী ফুল' কবিতায় : 'হাসিয়া দুলালে শুধু মাথা/চারিদিকে মর্মরিল পাতা/আমি কহিলাম জানি জানি,/সৌরভের বাণী/নীরবে জানায় তব আশা।' 'শেষ বসন্ত' কবিতায় : 'হঠাৎ তোমার চোখে/দেখিয়াছি সন্ধ্যালোকে/আমার সময় আর নাই।' এবং 'রাত্রি যবে হবে অন্ধকার/বাতায়নে বসিয়ো তোমার। সব ছেড়ে যাব, প্রিয়ে,/সমুখের পথ দিয়ে,/ ফিরে দেখা হবে না তো আর।'

উদ্ধৃত পংক্তিগুলোতে আমরা পাই 'অতিথি'র চিরচেনা ব্যবহার, নীরবতা ও হাসি, শূন্যময়তা, 'সৌরভ' ও 'সন্ধ্যা'র চুম্বক, সময়হীনতার পূর্বপরিচিত রেশ। এরকম আরো বহু পংক্তি আছে ভিক্তরিয়া ওকাম্পোর উদ্দেশে রচিত কবিতাগুচ্ছে, যেখানে আলোচিত রচনাগুলির ভাবানুষঙ্গ হয়েছে পরিস্ফুট। পংক্তির পর পংক্তি উদ্ধৃতি সাজানোর প্রয়োজন নেই আমাদের আর ; 'বিদেশিনী'র পরিচয়ের সূত্র পর্যাপ্ত পরিমাণেই ছড়ানো হয়েছে বোধ হয়।

'প্রেয়সী' ও 'ঈশ্বরী', 'শাশ্বতী', 'বিশ্বপ্রকৃতি', 'নিয়তি' ও 'পরিচালিকা', 'কবিতা' বা কবির 'কবিপ্রতিভা'—এর কোন্‌টি 'বিদেশিনী'? অথবা সবক'টিই কবির উদ্দিষ্টা 'বিদেশিনী'?

বিচারের ভার প্রত্যেক পাঠকের একার ওপর, কেউ সহায়ক হতে পারে না ব'লে আমার ধারণা।

পরিশিষ্ট

বছর দেড়েক আগে এ-প্রবন্ধটির কাঠামো রচিত হয়েছিল (এখন যা হ'লো তা-ও বোধ হয় কাঠামোই, শুধু আগেরটির চেয়ে সামান্য বিস্তৃত ও পরিমার্জিত এই যা), তখন অনেক কিছু না ভেবে কৈশোরিক উৎসাহ নিয়ে রবীন্দ্রজীবনের খুঁটিনাটি তথ্যগুলি ঘেঁটেছি আর কাজে লাগাবো ভেবেছি, জগদীশ ভট্টাচার্যের 'কবিমানসী' আমাকে তখন উৎসাহিত করেছে সব চেয়ে বেশী; কবিতার ছত্রে ছত্রে কবিজীবনের গোপন রহস্য আবিষ্কার করার ঝোঁকে ও উত্তেজনায় তখন দিনরাত কিভাবে যে কেটেছে আমিই জানি। তখনো বুঝিনি ওটা ঠিক পথ নয়, এবং আমার প্রবণতা অডেন-এর ভাষায় idle curiosity ছাড়া আর কিছু নয়। ভাগ্য ভালো, খুব বেশী দিন আমার উত্তেজনা বাঁচেনি। দি ন্যু আমেরিকান লাইব্রেরী ও দি ন্যু ইংলিশ লাইব্রেরী প্রকাশিত শেক্‌স্‌-পীয়রের সনেট সংকলনের অডেন-লিখিত ভূমিকা আমার সংযম আরো বাড়িয়েছে।

আমার প্রবন্ধে কবির জীবনে উঁকিঝুঁকি দেবার যে চেষ্টা আছে তা যে idle curiosity আমি মনে করি না। অডেন-এর বক্তব্যের আলোকে আমার কথা বলবো এবার।

অডেন চটেছেন শেক্‌স্‌পীয়রের একশ্রেণীর সমালোচকের প্রতি যাঁরা আজ অত্যন্ত সচেষ্ট শেক্‌স্‌পীয়রের জীবনের গোপন রহস্যের আবরণ উন্মোচন করতে, যাঁদের প্রবণতাই হ'লো কে ছিলেন শেক্‌স্‌পীয়রের সেই 'বন্ধু'টি, কে 'ডার্কলেডী', কে সেই 'প্রতিদ্বন্দ্বী কবি' সন্ধান করা ও তাঁদের সঙ্গে শেক্‌স্‌পীয়রের সম্পর্ক আবিষ্কার করা। অডেন বলছেন:

Their illusion seems to me to betray either a complete misunderstanding of the nature of the relation between art and life or an attempt to

rationalize and justify plain vulger idle curiosity. অডেন সুন্দরভাবে এই idle curiosityকে ব্যাখ্যা ক'রে বলেছেন: A great deal of what today passes for scholarly research is an activity not different from that of reading somebody's private correspondence when he is out of the room because he is in his grave.

হ্যাঁ, অডেনের সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত। আমাদের দেশেও আমরা এই শ্রেণীর স্কলারদের দেখেছি, দেখছি এবং এদের সংখ্যা দিন দিনই বেড়ে চলেছে, কবির কবিতার চেয়েও কবির 'জীবনচরিত'ই তাদের বেশী টানে, জীবনকে ঘিরেই তারা সস্তা আলোচনায় উৎসাহী হন। এই শ্রেণীর লেখকদের ওপর সবার চটার কারণ রয়েছে এবং এদের অপচেষ্টা যে অত্যন্ত নিন্দনীয় এতে বোধহয় কারো দ্বিমত নেই।
কিন্তু এই প্রসঙ্গের সিদ্ধান্তে অডেন যখন বলেন:

Further it should be borne in mind that most genuine artists would prefer that no biography be written. A genuine artist believes he has been put on earth to fulfil a certain function determined by the talent with which he has been entrusted. His personal life is, naturally of concern to himself and, he hopes, to his personal friends, but he does not think it is or ought to be of any concern to the public. The one thing a writer, for example, hopes for, is attentive readers of his writings, তখন কিছু প্রশ্ন মনে উঁকি দেয়। তাই কি? কোনো সৎ লেখকই কি চান না তাঁদের জীবনকাহিনী প্রকাশ করতে? কোনো রকম জীবনকাহিনী? অন্তত 'জীবনস্মৃতির'র মতো? লেখার সঙ্গে লেখকের সম্পর্ক তা হ'লে সব সময়ই distinct? মানি: Even if one could question a poet himself about the relation between some poem of his and the events which provoked him to write it, he could not give a satisfactory answer because even the most "occasional" poem, in the Goethean sense, involves not only occasion but one whole life experience of one poet, and he himself cannot identify all the contributing elements.

কিন্তু তবু যেহেতু মহৎসাহিত্যেও কোথাও কোথাও থাকে কবির একেবারে ব্যক্তিগত জীবনের গভীরতম উপলব্ধির কথা রচয়িতার জীবনকে একেবারে বাদ দিয়ে তার আস্বাদ নিতে পারি না বোধহয়। আমরা—বিংশ শতাব্দীর ষষ্ঠ দশকের মানুষেরা কী ক'রে পারবো কবির বিশুদ্ধতম শিল্পাংশের সঙ্গে একাত্ম হ'তে কবিকে কিছুমাত্র না জেনে?

একটি ভালোবাসার কবিতার পেছনে কবির ভালোবাসার অভিজ্ঞতা কতটুকু না জেনে আমরা কি পারবো সন্তুষ্ট হ'তে, বিশেষত যখন জানি সম্ভব নয় ভালোবাসার অভিজ্ঞতা ছাড়া ভালোবাসার গভীরতম উপলব্ধি সঞ্জাত কবিতা রচনা ?

আসলে শেক্স্পীয়রের প্রসঙ্গ ব'লেই অডেন এভাবে বলেছেন কথাগুলি আমার মনে হয়, দান্তের প্রসঙ্গ হ'লেও কি তিনি পারতেন ঠিক এভাবেই বলতে ? আমার সন্দেহ হয়।

সীমার প্রশ্ন, অধিকারের প্রশ্ন আছে বলা যায়। কবির জীবন চর্চায় কে সীমা ছাড়াচ্ছেন, কার অনধিকার চর্চা হচ্ছে তা আমরা অবশ্যই দেখবো। এইভাবে চক্ষুষ্মান থেকে আমরা যদি মহৎ রচয়িতাদের রচনার সঙ্গে মিলিয়ে তাঁদের জীবনের দিকে তাকাই তবে সেখানেও দেখতে পাবো স্বর্গীয় দীপ্তি কেননা এটা বোধহয় সত্যি যে কোনো বড় শিল্পীই বড় হ'তে পারেন না জীবনেও যদি তিনি সৎ না হন, বড় না হন।

অডেনের কিছু কথা অত্যন্ত সত্যি, অত্যন্ত বড়, আর কিছু কথায় আমার মনে প্রশ্ন জেগেছে। হ'তে পারে তা অডেনের কিছু কথা অনুধাবন করার শক্তি আমার নেই ব'লে, এই বিংশ শতাব্দীর ষষ্ঠ দশকের আমি একজন অত্যন্ত সাধারণ পাঠক বলে।

# কবিতা-প্রসঙ্গ

শিপ্রা রক্ষিত

কবিতা সম্পর্কে কিছু লিখতে বসে আমি প্রথমেই বিদগ্ধ পাঠক-পাঠিকাদের কাছে মার্জনা চেয়ে নিচ্ছি। তারা যদি আমার রচনায় জ্ঞানের পরিপক্কতা দেখতে চান তবে তাদের নিরাশ হতে হবে। কারণ আমি জ্ঞানমার্গের পথিক নই।

কবিতা আমরা কেন পড়ি? এটা একটা জিজ্ঞাসা আমাদের অনেকের কাছে। এ প্রশ্নটাও অনেকটা সেরকম --- আমরা কি? আমরা কেন? কবিতা পড়ি আমার ভাল লাগে বলে---ভালবাসি বলে। জীবনে যা পাই না---যা পেয়েও হারাই তাকে কবিতার মাঝে অন্তরঙ্গ সুষমায় পেয়ে থাকি বলে। এতসব কথার মধ্য দিয়েও তাকে বোঝানো যায় না। এ এমন একটা বোধ যার কোন সঠিক সংজ্ঞা নেই। ব্যাখ্যা করে যার যথাযথ রূপ দেয়া যায় না। 'কবিতা বলে তাকেই যা বিবরণ নয়, বর্ণনা নয়, মন্তব্য নয়; যা জীবনের মুকুরমাত্র না হয়ে জীবনের সমান্তর এক সৃষ্টি হয়ে ওঠে; বুদ্ধির অতীত এক চঞ্চলতার নিক্ষেপ করে আমাদের, যেখানে বহু ধ্বনি ও প্রতিধ্বনি দ্যুতি ও ছায়া পরস্পরে মিশ্রিত হয়ে অনির্বচনীয়ের আভাস এনে দেয়'। তবে কবিতার সংজ্ঞা কালে কালে রূপ বদলায়। চর্যাপদের মধ্যে যে কবিত্বের আস্বাদ আমরা পাই তা তেমন স্বতঃস্ফূর্ত নয় যেমন পরবর্তী কালের কবিদের মধ্যে দেখি; চর্যাপদের কবিরা যেন জোর করে নিজেদের সরিয়ে রাখতে চেয়েছেন জীবন থেকে---জীবনের প্রাণময় উচ্ছল রূপের মোহ থেকে---কিন্তু তাঁদের নিজেরই অজান্তে কখন একান্তে প্রাণের গভীরতম ও গোপনতম কথাটি বেরিয়ে গেছে। এজন্যই চর্যাপদের ভাষা ও সাধনতত্ত্বের বেড়া ভেদ করেও তা আমাদের প্রাণে ঝঙ্কার তোলে। বড়ু চণ্ডীদাসের ইন্দ্রিয়বিলাসী উন্মত্ততার মধ্যেও এমন এক ব্যাকুলতা আছে যা ক্ষণকালের জন্য

পাঠক-হৃদয়কে মুগ্ধ করে। বাংলা কবিতার ক্রমবিকাশের ধারা লক্ষ্য করাটা আমার উদ্দেশ্য নয়। তবু কবিতা কালে কালে যে বিশেষ রূপ পেয়েছে তার থেকে এক বিশেষ জীবনভূমি ও তৎসঞ্জাত কবিমনের সাক্ষাত পাই। কৃষ্ণকীর্তনের পথ থেকে একদিন বৈষ্ণব কবিতার ধূসর পরিমণ্ডল পেরিয়ে বাংলা কবিতা মধুসূদন, বিহারীলালে এসে পূর্ণতার আয়োজনে ব্যাপৃত হয়েছে। তারপরে রবীন্দ্রনাথ এক বিরাট অধ্যায়। এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের সর্বগ্রাসী আলো চারদিকের সবকিছুর ওপরে স্থির হয়ে রইল অনেকদিন ধরে। কিন্তু কবিপ্রাণ পরিবর্তনের মুখাপেক্ষী, সে পুরাতনকে নূতন করে তুলতে চায়—নিজেরও নব মূল্যায়ণে প্রয়াসী। তিরিশের কবিরা তাই এলো রবীন্দ্র বিরোধিতার ধ্বজা উড়িয়ে। এ বিরোধিতা তাঁকে অস্বীকার করে নয়—তাঁকে স্বীকার করে নেয়ার চরম উপলব্ধির মধ্য থেকেই জন্ম নিলেন জীবনানন্দ, বুদ্ধদেব প্রমুখ কবিরা। এলেন আরো অনেকে—অমিয় চক্রবর্তী, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দে, প্রেমেন্দ্র মিত্র। পুরাতন মূল্যবোধ একে একে বিদায় নিল। জন্ম হল নূতন অনেক কিছুর। মনস্তত্ব, বিজ্ঞান, জীবনের ক্লেদ, গ্লানি, বীভৎসতা, যুগের যন্ত্রণা, যান্ত্রিক জীবনের প্রতি অনীহা; এসব পরস্পর বিরোধী সবকিছু মিলে আধুনিক কবিতার পরিধি গেল অনেকখানি বেড়ে। কবিতার সংজ্ঞা, তার রূপসজ্জা অনেকাংশে বদলে গেল। যে সংজ্ঞা দিয়ে আমরা বিহারীলাল, মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথের কবিতা বিচার করি তা আধুনিক কবিতার বেলায় সম্পূর্ণ খাটে না। বুদ্ধদেব বসু বলছেন, 'একে বলা যেতে পারে বিদ্রোহের, প্রতিবাদের কবিতা, সংশয়ের, ক্লান্তির, সন্ধানের, আবার এরই মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে বিস্ময়ের জাগরণ, জীবনের আনন্দ, বিশ্ববিধানে আস্থাবান চিত্তবৃত্তি। আশা আর নৈরাশ্যের, অন্তর্মুখিতা বা বহির্মুখিতা, সামাজিক জীবনের সংগ্রাম আর আত্মিক জীবনের তৃষ্ণা'।

আধুনিক কবিতার ব্যাপারে প্রগল্‌ভ হয়ে ওঠার সুযোগ এড়ানো গেল না। কারণ এই আধুনিক কবিতার ব্যাপারেই সাধারণের অনীহা প্রবল। দুর্বোধ্যতার অভিযোগে জর্জরিত কাব্যলক্ষ্মীর দুঃখে সহানুভূতিশীল না হয়ে থাকা যায় না। এখন প্রশ্ন আমরা যারা কবিতা পড়ি বা না পড়ি তাদের প্রসঙ্গে। আমরা যারা সাহিত্যের ছাত্র-ছাত্রী, কবিতা পড়ি পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত বলে, আবার ব্যক্তিগত ভাবে ভাল লাগে বলেও। কবিতার সূক্ষ্ম বিচার বিশ্লেষণেও মেতে উঠি আমরা, কবিতার সাথে কবিআত্মারও সন্ধান করি,—আবার অনেক সময় পরীক্ষার খাতায় 'জীবনদেবতা' বা 'বিশ্বানুভূতি'র চরমতম প্রকাশ বর্ণনা করতে গিয়ে বিচিত্র দ্বন্দ্বে দোলায়িত হই। যারা একটু বিষয়ী তারা কবিতা বা তথাকথিত সাহিত্যের ধার ধারেন না; তাদের কাছে এটা নেহাত

পাগলামি। মানুষের চিত্তবৃত্তির দুই রূপ। কবিতা কারও রিক্ত, মৃত প্রাণে প্রাণের জোয়ার আনে, দুঃখে সান্ত্বনা দেয় আবার কারও কাছে বিরক্তি বা অর্থহীন প্রলাপে পর্যবসিত হয়। কিন্তু এতে কবিতার কোনো মানহানি হয় না। যে ভালোবাসতে জানে না তাকে কি ভালোবাসা শেখানো যায়। কিম্বা যার চিত্তবৃত্তিতে সেই বিশেষ আবহটা নেই যা কবিতার মতোই কোমল, মর্মস্পর্শী তার মধ্যে কি জোর করে এমন একটা প্রবণতাকে সঞ্চার করানো যায়! কিছুদিন আগে আমাকে একজন রবীন্দ্রচর্চাকে আরও প্রাগ্রসর করে তোলার জন্য তাঁর কাব্য-কবিতার প্রচারের কথা বলেছিল। তিরিশোত্তর কাব্য আন্দোলনের কবিরা এক পয়সায় একটি কবিতা বিক্রী করেছিলেন, উদ্দেশ্য ছিল তাঁদের কবিতার প্রচার। কিন্তু তাতেই কি তাঁদের কবিতা সবচেয়ে বেশি ফলপ্রসূ হয়েছিল ? না, তাঁদের নূতন ভাবধারা, আঙ্গিক, বিষয়বস্তু ও জীবনদর্শনই সবচেয়ে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিল ? দ্বিতীয়টা সবদিক থেকে সত্য। তেমনি রবীন্দ্রচর্চার বেলায়ও তাঁকে বোঝাটাই বড় কথা। তাঁর কবিতা যদি কাউকে আনন্দ দেয় সেটাই তাঁর সার্থকতা—তাঁর সবচেয়ে বড় চরিতার্থতা। নিছক প্রচারের ঢাকঢোল বাজিয়ে রবীন্দ্রচর্চা বা তাঁর কাব্য কবিতার সাথে অনেককে পরিচয় করিয়ে দেয়া বৃথা। এ প্রচারণার ফলে শুধু বসবার ঘরের আলমারীগুলোর আভিজাত্য ও গৃহমালিকের সংস্কৃতিপরায়ণ মনোভাব কপট সংস্কৃতির উল্লাসে জমে উঠবে। কবিতা এমন এক অনির্বচনীয় শিল্পবস্তু যার সক্রিয় প্রচারণার প্রয়োজন নেই। সে আপনা থেকে হৃদয়ের প্রয়োজনে, জীবনের প্রয়োজনে মনকে অধিকার করে নেবে—সত্তাকে ঘিরে থাকবে ললাটলিপির মতো। 'তার সঙ্গে তর্ক চলে না, তা আমাদের উপযোগের অধীন নয়। আমাদের সেবা করে না সে, দখল করে নেয়'।

'Every man is a poet when he is in love'.—পাশ্চাত্যের কোন এক বিদগ্ধ দার্শনিকের উক্তি। কিন্তু এটাই কবিতা সম্বন্ধে সর্বশেষ কথা নয়। কবিতার সবচেয়ে বড় কথা এ হচ্ছে বেদনার শিল্পমণ্ডিত রূপ। বেদনার গভীরতাই এখানে আনন্দে রূপান্তরিত। আদি কবি যে প্রেরণায় প্রথম কবিতা উচ্চারণ করেছিলেন—তার পশ্চাতে ভালোবাসা ছিল ; সে ভালোবাসা ক্রৌঞ্চমিথুনের মিলন-সুখাতুর সম্পর্কে নিহিত। তার চেয়েও মহত যা তা হোল মৃত্যুজনিত বিচ্ছেদের বেদনা। এ বেদনায় তাঁর অন্তর বিদীর্ণ হয়ে গিয়েছিল—বেদনা থেকে, শোক থেকে জাত বলেই তার নাম 'শ্লোক'। কান্নাই আনন্দের উৎস। দুঃখই কবিতার প্রাণ। সাহিত্যে ক্লাসিক ও রোমান্টিক দুটি কথা আছে—রোমান্টিকতার সবচেয়ে প্রধান লক্ষণ একটা সূক্ষ্ম বেদনার অনুভূতি সব সময় কবিকে, তার আত্মাকে ক্লিষ্ট করে। এই

অনুভূতি সকল কবিরই—শুধু প্রকাশভঙ্গীর পার্থক্য তাঁদের মধ্যে ব্যবধান এনেছে। বীররসের পরাকাষ্ঠা যিনি দেখিয়েছেন সেই প্রাচীন কবি হোমারও হেক্টরের মৃত্যুতে প্রেমে, মমতায় কাতর হয়ে উঠেছেন। কবির যে বেদনা তা তার সৃষ্টি-ব্যাকুলতার মধ্যে—আমরা যারা সৃষ্টি করতে পারি না তাদের যন্ত্রণা আরও বেশি। 'অলৌকিক আনন্দের ভার বিধাতা যাহারে দেন তার বক্ষে বেদনা অপার'—কবির সৃষ্টির এই অলৌকিক আনন্দের সাথে নিজেদের বেদনাকে প্রত্যক্ষ করতে পারি বলেই আমরা কবিতা ভালোবাসি। অসীম শক্তি কবিতার। কোন এক স্বনামধন্য দেশপ্রেমিকের ব্যক্তিগত চিঠির কথা মনে পড়ছে এ প্রসঙ্গে। তিনি লিখেছেন, 'অসীম শক্তি কবিতার। কারাপ্রাচীরের অন্তরালে বৈচিত্র্যহীন এক একটা দিন আসে আর যায়, আমি খ্যাত, অখ্যাত এমন কি সংবাদপত্রের সাম্প্রতিকতম কবিতাগুলোও যত্নসহকারে পড়ি—অনেক ব্যথা ভুলিয়ে দেয়—অনেক যন্ত্রণাময় একঘেঁয়ে দিনকে সুখাবহ করে তোলে'।

'ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে'—জ্ঞানের মত পবিত্র আর কিছু নেই। জ্ঞানের মত আনন্দময়ও তেমন কিছু নেই। একথা কি কবিতার বেলায়ও প্রযোজ্য নয়! অবশ্য এ কথার মানে এ নয় যে কবিতাকে হতে হবে রক্ষণশীল। রক্ষণশীলতায় পবিত্রতা নেই, আছে গোঁড়ামী। কবিতার যে পবিত্রতা তা ধর্মীয় পবিত্রতার পর্যায়ে পড়ে না। কবিতার পরিধি সীমাবদ্ধ নয়। সীমাবদ্ধতা আর যা কিছুর জন্যই হোক না কেন কবিতার জন্য হতে পারে না। অন্ততঃ আজ পর্যন্ত হয়নি। মানুষের সুন্দরতম বৃত্তিগুলো বাদ দিয়েও জীবনের গ্লানি, ক্লেদ, স্খলন, পতন, ত্রুটি, সবকিছুই কবিতার বিষয়বস্তু হতে পারে। জীবনের সংঘাত, বিদ্রোহ, প্রতিবাদ, যন্ত্রণা সব নিয়েই তো কবিতা। এই সবকিছুর সমন্বিত রূপই হচ্ছে পবিত্রতার প্রতীক। জ্ঞান পবিত্র—কবিও আত্মজ্ঞানের সাধনা করেন। প্রজ্ঞার আলোকে আপন সত্তাকে তন্ন তন্ন করে সন্ধান করেন।

'তুলা ধুনি ধুনি আঁসু রে আঁসু।
আঁসু ধুনি ধুনি নিরবর সেসু'।

কবি এমনি করেই নিজেকে জানেন। হাজার বছর আগে যে কবি একথা বলেছেন তাঁর সাধনার পশ্চাতে নিগূঢ় ধর্মের একটা তত্ত্ব ছিল। সেই তত্ত্বজ্ঞানের আলোকে তিনি নিজেকে তন্ন তন্ন করে খুঁজেছেন। সেই সন্ধানের আলোকে পরমজ্ঞানকে উপলব্ধি করতে চেয়েছেন নিজের মধ্যে। কবি সৃষ্টির মাধ্যমে তাঁর সত্তার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করেন আর সেই স্বরূপকেই আমরা কবিতা রূপে পাই। রবীন্দ্রনাথও সমগ্র জীবন

ধরে সত্তার স্বরূপ উদ্ঘাটনের সাধনা করেছেন। কবি যা সৃষ্টি করেছেন তার মধ্যে নিজেকে ও কাব্যকলাকে তুলে ধরেছেন, আত্মার একান্ত নিবিড় আলোয় নিজেকে জানার সাধনা করেছেন। এ কথা শুধু রবীন্দ্রনাথের বেলায় নয় --- কবি মাত্রেই প্রযোজ্য। প্রত্যেক যথার্থ কবিই স্বীয় স্বরূপ আবিষ্কারের আনন্দে উদ্ভাসিত। এই কবি প্রাচীন, মধ্যযুগীয় কিম্বা আধুনিক যে যুগেরই হোক না কেন। কবিতা আমরা ভালবাসি অজান্তে এক অনির্বচনীয় রূপের নেশায় বুঁদ হয়ে --- একে ধরা যায় না, ছোঁয়া যায় না---শুধু উপলব্ধি করা যায়।

সবশেষের কথা, কবিতা আজকাল পড়েন ক'জনে। যারা পড়েন তারা সংখ্যায় নিতান্ত নগণ্য। একদল আছেন যারা বলকারক 'টনিক' গেলার মত স্কুল, কলেজের পাঠ্য-তালিকাভুক্ত কবিতার শ্রাদ্ধ করেন। যারা নাকি স্বভাবে অত্যন্ত বেশিরকম **Practical** (?) তারা কবিতাকে ছোঁয়াছে রোগের মত মনে করেন। আধুনিক কবিতার আকৃতি প্রকৃতি ও দুর্বোধ্যতা নিয়েও তারা ব্যঙ্গ, বিদ্রূপে মশগুল। এক কথায় কবিতার ব্যাপারে তারা চরম উন্নাসিক। তবে কি কবিতার ভবিষ্যত অন্ধকার। এমন দিনও কি আসবে যখন কবিতার একটিও পাঠক থাকবে না? রবীন্দ্রনাথের মত কালজয়ী প্রতিভাও সংশয়ী হয়ে উঠেছিলেন তাঁর কবিতার ভবিষ্যত ভেবে। তবে তাঁর সংশয় অহেতুক। আমাদের সংশয় কিন্তু অহেতুক নয় --- আজকের দিনে কবিতা সবচেয়ে অনাদৃত, সাহিত্যের অন্যান্য শাখার চেয়ে। কিন্তু আমরা আশাবাদী। এতবড় একটা দুর্দিনের সম্ভাবনাকে মনের মধ্যে লালন করবার মত দুর্ভাগ্যের সূচনা এখনও হয় নি। কেন না কবিতার আদর আমাদের দেশে ছিল, আছে এবং থাকবেও। কারণ কবিতা মানুষের আত্মার শান্তি, মনের আনন্দ, প্রাণের আরাম আর কবির ভাষাতেই বলি, **'If winter comes can spring be far behind'.**

# রোসাঙ্গ রাজসভা ঃ আলাওল সমস্যা

ম, আ, আওয়াল

## *রোসাঙ্গ রাজসভা ঃ বাঙালী ও বাংলা সাহিত্য*

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে পশ্চিম থেকে আগত মুসলমানরা বাংলা দেশের সিংহাসন দখল করার অনেক আগে থেকে পূর্ব দিকের একমাত্র নদীবন্দর চট্টগ্রাম আরবদের বিশ্রাম-স্থান ও উপনিবেশে পরিণত হয়। আরাকান থেকে মেঘনা নদীর পূর্ব তীরবর্তী বিস্তীর্ণ ভূভাগটি খ্রীষ্টিয় অষ্টম শতাব্দী থেকে আরবী বণিকদের কর্মতৎপরতায় মুখর হয়ে উঠে-ছিল। রোসাঙ্গের জাতীয় ইতিহাস থেকে জানা যায়, রোসাঙ্গরাজ মহতইঙ্গ সন্দয়ের (Mahatoing Tsandaya 788-810 A. D.) রাজত্বকালে কিছু সংখ্যক মুসলিম বণিক 'রন্‌বী' (রামরী) দ্বীপে জাহাজ ভেঙ্গে উঠে পড়লে রোসাঙ্গ রাজের আদেশে তারা সেখানে বসবাস করতে থাকে।[১] খ্রীষ্টিয় দশম শতাব্দীতে চট্টগ্রামে আরবদের প্রভাব এত বেড়ে গিয়েছিল যে, এই সময় এই অঞ্চলে একটি ক্ষুদ্র মুসলিম রাজ্য স্থাপিত হয় এবং এর অধিপতি সুলতান নামে পরিচিত ছিলেন। ৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে রোসাঙ্গরাজ সুলতইঙ্গ সন্দয় (৯৫১-৯৫৭) 'থুরতন'কে ('সুলতান' শব্দের আরাকানী অপভ্রংশ) পরাজিত করেন এবং দিগ্বিজয়ের চিহ্ন স্বরূপ 'চেত্তগৌং' অর্থাৎ চট্টগ্রাম নামক স্থানে এক প্রস্তর নির্মিত বিজয় স্তম্ভ স্থাপন করে স্বরাজ্যে ফিরে যান। 'চেত্তগৌং' শব্দের অর্থ 'যুদ্ধ করা অনুচিত'।[২] অনেকের মতে চেত্তগৌং থেকে চট্টগ্রাম শব্দের উদ্ভব।

চীনা পরিব্রাজকদের বিবরণী, ইবনে বতুতার বিবরণী, হজ্বব্রত উদযাপনের পথে চট্টগ্রামে আগত মুজফফর শমৃশ্ বলখীর চিঠি সমূহ থেকে (এগুলো তিনি গিয়াসুদ্দীন

১. আরকান রাজসভায় বাঙ্গালা সাহিত্য : আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ ও মুহাম্মদ এনামুল হক
২. J. A. S. B. Vol. XIII Part—I, 1844.

আযম শাহের নিকট লিখেছিলেন), জোআঁ-দে-বারোসের 'Da Asia' গ্রন্থ, শিহাবুদ্দীন তালিশের গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে চট্টগ্রাম বিভিন্ন সময়ে বাংলা দেশের সুলতানের শাসনাধীনে ছিল। অবশ্য আরাকানী কিম্বদন্তী অনুসারে রোসাঙ্গরাজ মেংখরি (১৪৩৪-৫৯) চট্টগ্রামের রামু জয় করেছিলেন এবং তাঁর পুত্র ও পরবর্তী রাজা বসৌপিউ ( Basaupyu ১৪৫৯-৮২) চট্টগ্রাম শহর জয় করেছিলেন। স্থানীয় প্রবাদ, রোসাঙ্গের ইতিহাস এবং 'রাজমালা'র সাক্ষ্য বিশ্লেষণ করলে বুঝা যায় যে চট্টগ্রামের অধিকার নিয়ে গৌড়, ত্রিপুরা ও রোসাঙ্গরাজদের মধ্যে প্রায়ই যুদ্ধ হত।[৩]

রোসাঙ্গ রাজবংশ অতি প্রাচীন। এই বংশের আদিপুরুষ সান্দথুরীয় ( চন্দ্রসূর্য)। তিনি (১৪৬-১৯৮ খ্রীষ্টাব্দ) দিন্নাওয়াতী বা ধন্যাবতীতে রাজত্ব করতেন। সেই থেকে ক্রমান্বয়ে রাজধানী বৈশালী, পিনস্যা বা চম্পাবৎ, পারীন, লঙ্গীয়েত ও ম্রোহং-এ তাঁর বংশের বিভিন্ন শাখা ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় ১৫০০ বৎসরের অধিক কাল ধরে আরাকানে রাজত্ব করতে থাকেন।[৪] খ্রীষ্টিয় অষ্টম শতাব্দী থেকে আরাকানে মুসলিম অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হলেও পঞ্চদশ শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত রোসাঙ্গ রাজসভায় মুসলমান অমাত্যরা তেমন প্রভাব বিস্তার করতে পারেননি। রোসাঙ্গরাজ মেং-সও-মৌন (Mengtsau Mwun১৪০৪-১৪৩৪) ওরফে নরমিখলা (Narameikh'a) ১৪০৪ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসন আরোহন করে অ্যানানথিউ (Ananthiu) নামক একজন সামন্তরাজের ভগ্নি সও-বংগীও ( Tsaw-bongyo )-কে অপহরণ করে বিবাহ করলে অ্যানানথিউ ভগ্নির প্রতি অত্যাচারের প্রতিশোধ নেবার মানসে আভারাজ মেং-শোঅই বা মিনকউং ( Meng Tshwai বা Minhkaung ১৪০১-১৪২২ খ্রীষ্টাব্দ)-এর নিকট প্রতিকার প্রার্থনা করে। মেংশোঅই ত্রিশহাজার সৈন্য নিয়ে রোসাঙ্গ আক্রমণ করে ১৪০৬ খ্রীষ্টাব্দে মেং-সও-মৌনকে পরাজিত করেন। মেং-সও-মৌন পালিয়ে গিয়ে গৌড়ের সুলতান দ্বিতীয় শামশুদ্দীনের (১৪০৬-১৪০৯) কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করেন। তিনি রোসাঙ্গরাজকে সাদরে ও সসম্মানে গ্রহণ করে আশ্রয় দান করেন।[৫] অন্যমতে, ''বর্মীরাজা পাইইনসিও ওরফে মেঙখামঙ কর্তৃক আরাকানরাজ মেঙসা-মাউ ওরফে নরমিখলা ১৪০৪ খ্রীষ্টাব্দে রাজ্যচ্যুত হয়ে গৌড়ের সুলতান গিয়াসুদ্দীন আযম শাহের (১৩৮৯-১৪০৯) আশ্রয় গ্রহণ করেন।[৬]

৩. সুখময় মুখোপাধ্যায়। ৪. ডঃ আহমদ শরীফ।
৫. আরকান রাজসভায় বাঙ্গালা সাহিত্য।
৬. ডঃ আহমদ শরীফ। সুখময় মুখোপাধ্যায়ও স্বীকার করেছেন যে ১৪০৬ খ্রীষ্টাব্দে গিয়াসুদ্দীন আযম শাহ গৌড়ের সুলতান ছিলেন।

ছাব্বিশ বৎসর পর জলালুদ্দীন (১৪১৪-১৪৩১) সিংহাসন পুনরুদ্ধারের জন্য মেং-সও-মৌনকে সাহায্য করেন।

Phare ও Harvey-এর 'History of Burma'তে এই সম্বন্ধে যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে তার সংক্ষিপ্ত সার,—আরাকান দেশের একজন রাজা ব্রহ্মরাজের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে নিজের রাজ্য হারান। রাজ্য হারিয়ে তিনি দেশ ছেড়ে পালিয়ে গিয়ে বাংলার রাজার আশ্রয় গ্রহণ করেন। বাংলার রাজাকে তিনি শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধে সাহায্য করাতে রাজা তাঁকে রাজ্য উদ্ধারের জন্য সাহায্য করতে সম্মত হন। প্রথমে একজন মুসলমান সেনাপতিকে ( Phare-এর বিবরণীতে এর নাম বলা হয়েছে উলুখেং বা 'ওয়ালী খান) তাঁর সঙ্গে দেওয়া হয়, কিন্তু সে বিশ্বাসঘাতকতা করে আরাকানরাজের শত্রুর সঙ্গে যোগ দেয় এবং আরাকানরাজকে বন্দী করে। আরাকানরাজ কোন রূপে পালিয়ে এসে বাংলার রাজাকে সব জানান। তখন বাংলার রাজা বিশ্বস্ততর লোকের উপর তাঁর রাজ্য উদ্ধারের ভার দেন এবং এইবার আরাকান রাজের রাজ্য উদ্ধার হয়। কিন্তু এই উপকারের বিনিময়ে তাঁকে বাংলার রাজার সামন্ত হতে হয়। তখন থেকে আরাকান রাজাদের মুদ্রার উপরে ফার্সী অক্ষরে মুসলমানী নাম লেখার প্রথাও চালু হয়।[৭]

ওয়ালী খাঁ ( Ulu-Kheng ) বিশ্বাসঘাতকতা করে আরাকান সামন্তরাজ সেংকা'র ( Tsenka ) সাথে যোগ দিয়ে মেং-সও-মৌন'কে বন্দী করেন। রোসাঙ্গরাজ কৌশলে পালিয়ে গিয়ে জালালুদ্দীনকে সবকিছু জানান। জালালুদ্দীন দুজন সেনাপতি সহ তাঁকে পুনরায় পাঠালে তাঁরা ওয়ালী খাঁকে হত্যা করে রোসাঙ্গ-সিংহাসন অধিকার করেন। তাঁদের সঙ্গে যে সকল মুসলমান রোসাঙ্গে আগমন করেছিলেন তাঁরা ম্রোহং (Mrohaung) নামক স্থানে সন্ধিকন ( Sandikan ) মসজিদ প্রতিষ্ঠিত করেন। সিংহাসন পুনরুদ্ধারের পর নরমিখলা আরও চার বৎসর গৌড়ের সুলতানের করদরাজ রূপে রাজত্ব করেন। এই সময় থেকেই আরাকানে মুসলিম সাংস্কৃতিক ও শাসনতান্ত্রিক প্রভাব প্রসার লাভ করতে থাকে। রোসাঙ্গরাজেরা তাঁদের মুদ্রায় কলেমা উৎকীর্ণ করতে থাকেন এবং মুসলমানী নাম গ্রহণ করতে থাকেন। তাঁরা মুদ্রায় ফারসী অক্ষরও ব্যবহার শুরু করেন। নরমিখলার পরে রোসাঙ্গ রাজেরা গৌড়ের সুলতানের সাথে কোন সম্পর্ক রাখেননি। কিন্তু সম্পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের পরও তাঁরা মুসলমানী নাম ও মুদ্রায় ফারসী অক্ষরে কলেমা উৎকীর্ণের প্রথা উচ্ছেদ করেননি। বাংলার মুসলমান সুলতান-দের সাথে সদ্ভাব না থাকা সত্ত্বেও রোসাঙ্গরাজেরা মুসলিম রীতিনীতি, সংস্কৃতি অনুসরণ করতে দ্বিধাবোধ করতেন না, মুসলিম অমাত্যদের গুরুত্বপূর্ণ পদসমূহের ভার অর্পণে কুণ্ঠিত হতেন না। এর কারণ:

৭. সুখময় মুখোপাধ্যায়

প্রথমতঃ রোসাঙ্গ রাজগণ তাঁদের সভ্যতা, সংস্কৃতি, রাষ্ট্রনীতি ও আচার-ব্যবহার হতে অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ ও উন্নত মুসলমান সভ্যতা, সংস্কৃতি, রাষ্ট্রনীতি ও আচার ব্যবহারের প্রভাব হতে মুক্ত হতে পারেন নি। প্রতিবেশী দেশ বা জাতির উন্নততর সংস্কৃতি ও সভ্যতা অপেক্ষাকৃত অনুন্নত জাতি বা দেশের সভ্যতা-সংস্কৃতিকে স্বভাবতই প্রভাবিত করে।

দ্বিতীয়তঃ বর্মীদের আক্রমণের ভয়ে নরমিখলা ১৪৩৩ খৃষ্টাব্দে লাঙ্গিয়েত(Launggyet) থেকে রাজধানী চট্টগ্রামের অনতিদূরে ম্রোহং ( Mrohaung )-এ স্থানান্তরিত করেন। ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রোসাঙ্গের রাজধানী এখানে ছিল। মুসলিম অধ্যুষিত চট্টগ্রামের নিকট রাজধানীর অবস্থিতি মুসলমানদের রোসাঙ্গে আগমনের অন্যতম কারণ। ভাগ্যান্বেষণে রোসাঙ্গ রাজসভার সংস্পর্শে আসার একটা প্রবণতা মুসলমানদের ছিল।

তৃতীয়তঃ গৌড়ের সুলতানদের সাথে রোসাঙ্গ রাজগণের সম্বন্ধ সন্তোষজনক না থাকলেও মুসলমান জাতির প্রতি তাঁদের বিদ্বেষ ছিল না। মগ জাতি স্বভাবতই ধর্মীয় গোঁড়ামী ও সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত। ধর্মীয় বাধাবন্ধনহীন বিবাহনীতি তার অন্যতম উদহরণ।

চতুর্থতঃ রাজ্য ও যুদ্ধ পরিচালনায় মুসলমানদের একটি সহজাত পারদর্শীতা আছে। যার ফলে তারা অন্য ধর্মাবলম্বী এবং রাজ্যশাসন ও যুদ্ধ পরিচালনায় অপারদর্শী কর্মবিমুখ মগদের পরিবর্তে রোসাঙ্গ রাজদের দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ হয়েছিল।

"পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে চাটিগাঁ বাঙলা-সংস্কৃতির অন্যতম কেন্দ্র হইয়াছিল। শ্রীচৈতন্যের কয়েকজন প্রধান অনুচর ছিলেন এই অঞ্চলের লোক। সেই সূত্রে বৈষ্ণবতার জোয়ারও এখানে প্রবল ভাবে আসিয়াছিল। সূফী পীরদের প্রভাবতো ছিলই। সেই হইতে কাব্য ও সঙ্গীতকলার চর্চাও এখানে ভালো করিয়া চলিতে থাকে। চাটিগাঁ হইতে এই সংস্কৃতির ঢেউ অনতিবিলম্বে পৌঁছাইয়াছিল আরাকানে তথাকার রাজসভাসদদের মারফৎ"।[৮]

রোসাঙ্গ রাজসভায় মুসলমানী প্রভাব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়ে সপ্তদশ শতাব্দীতে তা চরমসীমায় উপনীত হয়। এই সময় রোসাঙ্গ রাজসভা এবং তথাকার মুসলিম অমাত্যদের সভায় বাংলা সাহিত্যচর্চা প্রবলভাবে পরিলক্ষিত হয়।

৮. সুকুমার সেন।

বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে রোসাঙ্গরাজদের প্রত্যক্ষ কোন সহযোগীতা কিম্বা পৃষ্ঠপোষণা স্বীকার করা যায় কিনা সেটা বিতর্ক সাপেক্ষ। দৌলতকাজী, মরদন, আলাওল ও আব্দুল করিম খন্দকার—এঁদের কেউই কোন রোসাঙ্গরাজের প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় তাঁদের সাহিত্যকর্মে নিয়োজিত ছিলেন বলে কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি। কিন্তু রোসাঙ্গরাজদের অবদান তবুও অবশ্যস্বীকার্য। তাঁদের অধীনস্থ কর্মচারীদের পৃষ্ঠপোষকতায় বাঙালী কবিরা তাঁদের কাব্যসমূহ রচনা করেন। রাজদরবারের অনুকূল পরিবেশ ব্যতীত তা সম্ভবপর হতো না। যে কয়জন রোসাঙ্গ রাজের শাসনামলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধনে বাঙালী কবিগণ তাঁদের প্রতিভার পূর্ণপরিচয় দিতে সমর্থ হয়েছিলেন তাঁদের নাম দেওয়া গেল:

১। থিরি-থু-ধম্মা রাজা (Thiri-thu-dhama Raja)—১৬২২-৩৮ খ্রীষ্টাব্দ।
২। নরবদিগ্যি (Narabadigyi)—১৬৩৮-৪৫ খ্রীষ্টাব্দ।
৩। থদোমিন্তার (Thado-Minter)— ১৬৪৫-৫২ খ্রীষ্টাব্দ।
৪। সান্দ থুধম্মা (Sanda-Thudhama)—১৬৫২-৮৪ খ্রীষ্টাব্দ।

যদিও রোসাঙ্গরাজদের নাম বাংলা সাহিত্যের উৎকর্ষের জন্য স্মরণীয় কিন্তু তাঁদের অমাত্যরাই পূর্ণ কৃতিত্বের দাবীদার। মুসলিম অমাত্যবৃন্দই সাহিত্য রচনার জন্য কবিদের প্রত্যক্ষভাবে অনুপ্রাণীত করেছেন। আশরাফ খান, মাগন ঠাকুর, শ্রীমন্ত সোলায়মান, সৈয়দ মুসা, সৈয়দ মুহম্মদ খান এবং নবরাজ মজলিস—এই কয়েকজন অমাত্যের নাম উল্লেখের অপেক্ষা রাখে।

## আলাওল সমস্যা

আলাওল বাংলা সাহিত্যের একটি অবিস্মরণীয় নাম। মধ্যযুগের সাহিত্যাকাশ তাঁর প্রতিভার ভাস্বর দ্যুতিতে আলোকিত। মহাকবি নামের সার্থক অধিকর্তা তিনি। হিন্দু মুসলিম উভয় সংস্কৃতির সমন্বয় ঘটেছিল তাঁর মধ্যে। তিনি বাংলা, সংস্কৃতি, আরবী ও ফারসী ভাষায় সুদক্ষ ছিলেন। ভাষা জ্ঞান ব্যতীত আলাওল নানা শাস্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন। তাঁর রচনা থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে তিনি প্রাকৃত পিঙ্গল, যোগশাস্ত্র, তসউফ, কামশাস্ত্র, সঙ্গীতবিদ্যা, অশ্বচালনা বিদ্যা প্রভৃতি অনেক বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। ভাষা ও ভাবে তিনি হিন্দুর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সূত্রানুসরণে যে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন তা একাধারে কবির উদারতা এবং এদেশীয় নিজস্ব লৌকিক

ভাব-ভাবনার প্রতি অতি প্রবণতার প্রমাণ দেয়।[১] "পদ্মাবতী কাব্যে আলাওলের গভীর পাণ্ডিত্যের পরিচয় আছে। কবি পিঙ্গলাচার্য্যের মগন, রগণ প্রভৃতি অষ্টমহা-গণের তত্ত্ববিচার করিয়াছেন ; খণ্ডিতা, বাসকসজ্জা ও কলহান্তরিতা প্রভৃতি অষ্টনায়িকার ভেদ ও বিরহের দশ অবস্থা পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে আলোচনা করিয়াছেন, আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র লইয়া উচ্চাঙ্গের কবিরাজী কথা শুনাইয়াছেন, জ্যোতিষ প্রসঙ্গে লগ্নাচার্য্যের ন্যায় যাত্রার শুভাশুভের এবং যোগিনীচক্রের বিস্তারিত ব্যাখ্যা করিয়াছেন ; একজন প্রবীণা এয়োর মত হিন্দুর বিবাহাদি ব্যাপারের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম আচারের কথা উল্লেখ করিয়াছেন ও পুরোহিত ঠাকুরের মত প্রশস্তি বন্দনার উপকরণের একটি শুদ্ধতালিকা দিয়াছেন, এতদ্ব্যতীত টোলের পণ্ডিতের মত অধ্যায়ের শিরোভাগে সংস্কৃত শ্লোক তুলিয়া দিয়াছেন। ......তিনি বয়ঃসন্ধি বর্ণনায় একজন রসজ্ঞ বৈষ্ণব।[২]

আলাওলের কাব্যে আরবী ফার্সী শব্দের ব্যবহার অত্যন্ত কম। জায়সীর মত তিনি দেশী শব্দ পেলে বিদেশী শব্দ ব্যবহার করেননি। জায়সীর মত তিনিও রামায়ন, মহাভারত, ভাগবত-কাহিনীর অজস্র উল্লেখ করেছেন। মৎস্যেন্দ্রনাথ, গোরক্ষনাথ ও গোপীচন্দ্র-ময়নামতী কাহিনীর ইঙ্গিত উভয় কবিই করেছেন। আলাওলে উপরন্ত বিদ্যাসুন্দর কাহিনীর উল্লেখ আছে।[৩] কিন্ত এর মধ্যে আলাওলের সুফীবাদ সম্ভূত উদারতা ও জাতীয় কাব্য-ঐতিহ্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগের পরিচয় যেমন আছে তেমনি রয়েছে একটি অভিনব প্রত্যাশার সমাধি। আলাওল মধ্যযুগের শক্তিশালী মুসলিম কবি। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য পৌরাণিক আখ্যান বর্ণনার গতানুগতিকতায় ভারাক্রান্ত। শব্দ ব্যবহারে সংস্কৃতের অহেতুক আনুগত্য অভিনবত্বহীন। বিভিন্ন ভাষায় পারদর্শী আলাওল বাংলা সাহিত্যে আরবী ফারসী শব্দের যথোপযুক্ত ব্যবহারে বাংলা সাহিত্যে নতুন রসের আস্বাদনে সহায়তা করতে পারতেন। উপমাদি সংকলনের ব্যাপারেও তাঁর হিন্দু ঐতিহ্যপ্রীতি কিছু কম হলে সম্ভবত মুসলমানী প্রাচীন কাহিনীর উল্লেখ উপভোগের সীমানা বাড়িয়ে দিতে পারত। হিন্দু ভাবরূপের প্রতি অধিক আকর্ষণের ফলে আলাওল বাংলা সাহিত্যকে যে প্রধান সম্পদ থেকে বঞ্চিত করলেন, তা হল স্বকালের বাঙালী মুসলমানের সমাজ ও পরিবার জীবনের চিত্র। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে হিন্দু সমাজের নানা স্তরের জীবন কাহিনীর বর্ণনা থাকলেও মুসলমানদের কথা প্রায় অনুপস্থিত। মুসলিম কবি আলাওল বাংলা সাহিত্যের এই অভাব মোচন করবার মত শক্তিশালী ছিলেন।

১. ক্ষেত্রগুপ্ত।
২. দীনেশ সেন। ৩. সুকুমার সেন।

আলাওল প্রধানত অনুবাদক ; অনুবাদে তাঁর মৌলিকতার প্রকাশ ঘটেছে।

'রচিলুঁ বহুল গ্রন্থ নানা আলাঝালা'।

(সয়ফুলমুলক বদিউজ্জামাল)

কিংবা—'বহু গ্রন্থ রচিলুঁ মোহন্ত সবনামে'।

(সেকান্দরনামা)

প্রভৃতি চরণ পাঠে বুঝা যায় যে আলাওল অনেক গ্রন্থের রচয়িতা ছিলেন। কিন্তু এই পর্যন্ত তাঁর যে সব গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে সেগুলোর পরিচয় নিম্নে দেওয়া গেল :

১। রাজা থদোমিন্তারের সময়ে মাগন ঠাকুরের আদেশে হিন্দী কবি মালিক মুহাম্মদ জায়সীর 'পদুমাবৎ' কাব্যের অনুবাদ করেন ১৬৪৮ খ্রীষ্টাব্দে 'পদ্মাবতী' নামে।

২। থিরি সান্দ থুধম্মার সময়ে শ্রীমন্ত সোলায়মানের আদেশে দৌলত কাজীর 'সতীময়না লোর চন্দ্রানী'র উত্তরাংশ 'রতনকালিকা আনন্দ বর্মা' উপাখ্যান রচনা করেন ১৬৫৯ খ্রীষ্টাব্দে।

৩। থিরি সান্দ থুধম্মার সময়ে ফারসী উপাখ্যান অবলম্বনে 'সায়ফুল মুলক বদিউজ্জামাল' রচনা করেন। এর প্রথমাংশ রচনা করেন মাগন ঠাকুরের আদেশে ১৬৫৮ খ্রীষ্টাব্দে, দ্বিতীয়াংশ রচনা করেন মাগন ঠাকুরের মৃত্যুর পরে সৈয়দ মুসার আদেশে ১৬৬৯ খ্রীষ্টাব্দে।

৪। থিরি সান্দ থুধম্মার সময়ে সৈয়দ মুহম্মদ খানের আদেশে ১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দে নিজামী গঞ্জাবীর 'হপ্তপয়কর' কাব্যের অনুবাদ করেন 'সপ্তপয়কর' নামে।

৫। থিরি সান্দ থুধম্মার সময়ে শ্রীমন্ত সোলায়মানের আদেশে ১৬৬৪ খ্রীষ্টাব্দে ইউসুফ গদার 'তোহফাতুন নেসায়েহ্' অনুবাদ করেন 'তোহফা' নামে।

৬। থিরি সান্দ থুধম্মার সময়ে নবরাজ মজলিসের আদেশে ১৬৭১ খ্রীষ্টাব্দে নিজামী গঞ্জাবীর 'সেকান্দরনামা' অনুবাদ করেন। এটিই তাঁর শেষ রচনা।

এছাড়াও তিনি সঙ্গীতশাস্ত্র (রাগ তালনামা) এবং রাধাকৃষ্ণ রূপক নিয়ে গীত রচনা করেন।

আলাওল তাঁর রচনার কোন জায়গায় আত্মপরিচয় পরিষ্কার ভাবে দেননি। ফলে তাঁর পরিচয় হয়েছে গবেষণার বিষয়। তাঁর রচনা সমূহের বিভিন্ন স্থানে আত্মপরিচয় দানের যে সামান্য প্রয়াস আছে সে স্থান সমূহের বিচার বিবেচনার মাধ্যমে গবেষকরা আলাওলের পরিচয় উদঘাটনের চেষ্টা করেছেন।

আলাওলের নাম নিয়ে বিভিন্ন মতবাদ প্রচলিত আছে। ডঃ সুকুমার সেনের মতে, "আলাওল (আরবী 'অলঅব্বল' অর্থাৎ প্রথম) কবির 'তখল্লুস' বলিয়া বোধ হয়। প্রকৃত নাম চাপা পড়িয়া গিয়াছে।" আবার কেউ কেউ 'আল-আউয়াল' রূপে আলোয়াল লেখেন। আলাওলের পুথিগুলোর সর্বত্র আলাওল লিখিত আছে। কচিৎ আলায়ল আছে। আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ কবির প্রকৃত নাম আলাওল সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। তাঁর মতে কবির প্রকৃত নাম আলাউল (হক) ছিল। লোকমুখে বিকৃত হয়ে বর্তমান রূপ ধারণ করেছে। স্বরসঙ্গতির নিয়মানুসারে আলাউলের আদ্যাক্ষরের আ'কারের প্রভাবে 'উ' 'ও' হয়েছে।[৪]

কবির জন্মস্থান ও জন্মসন সঠিক ভাবে নির্ধারণ করা একটি দুরূহ ব্যাপার। একমাত্র অনুমানের উপর নির্ভর করা ছাড়া আর কোন উপায়ে আলাওলের জন্মসন নির্ণয় করা সম্ভব নয়। আলাওলের জন্মসন সম্বন্ধে বিভিন্ন মত প্রচলিত রয়েছে :

ক। তিনি 'পদ্মাবতী' অনুবাদের কয়েক বৎসর পূর্বে রোসাঙ্গে উঠিয়া পড়িয়াছিলেন এবং এই সময়ে তিনি পূর্ণ প্রৌঢ় বয়স্ক হইলে, তাঁহার বয়স ন্যূনাধিক ৪৫ বৎসরের অধিক ছিল বলিয়া মনে হয় না। 'পদ্মাবতী' অনুবাদের শেষ সময় ১৬৫২ খ্রীষ্টাব্দ। সুতরাং কবি আনুমানিক (১৬৫২-৪৫) ১৬০৭ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৬৭৩ খ্রীষ্টাব্দে কবি 'সেকান্দরনামা' রচনার পর আর বেশীদিন জীবিত এবং রোসাঙ্গে ছিলেন বলিয়া (পূর্ব বর্ণিত কারণে) মনে হয় না। স্বদেশে আসিয়াও তিনি বেশী দিন জীবিত ছিলেন না। তিনি স্বদেশে আসিয়া যদি আনুমানিক ৭ বৎসরও জীবিত থাকেন তবে ১৬৮০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

—আরাকান রাজসভায় বাঙ্গালা সাহিত্য :
আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ, এনামুল হক।

খ। সৈয়দ মুছা নামক এক সদাশয় ব্যক্তি তাঁহাকে আশ্রয় দিয়া 'ছয়ফুল মুল্লুক ও বদিউজ্জমাল' পুথির অবশিষ্টাংশ রচনা করিতে আদেশ করেন, তখন কবি ভগ্নবীণায় পুনরায় তার যোজনা করিলেন, কিন্তু তখন তিনি অতি বৃদ্ধ --- বয়োগত বনিতাবিলাসের গীত কণ্ঠে উঠিতে চাহে না। আলাওয়াল এই দায়িত্ব গ্রহণে প্রথমতঃ অসম্মত হইয়াছিলেন, কিন্তু সৈয়দ মুছা তাঁহার দেশবিখ্যাত যশের কথা বলিয়া পীড়াপীড়ি করিলেন। ১৬৫৮ খৃঃ অব্দে সুজার মৃত্যু হয়, তাহার অন্যূন ২০ বৎসর পূর্ব্বে কবির ৪০ বৎসর বয়সে 'পদ্মাবতী' রচনার কাল ধরিলে তিনি ১৬১৮ খৃঃ অব্দে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

—বঙ্গভাষা ও সাহিত্য : দীনেশ সেন।

৪. ডঃ আহমদ শরীফ।

গ। সম্ভবতঃ আলাওল ১৬১০ খ্রীষ্টাব্দে রণক্ষত হইয়া আরাকানে আসেন। কেননা ঐ সময় গঞ্জালেস আরাকান রাজসভায় ছিলেন। সম্ভবতঃ তিনি ১৬৭৩ খ্রীষ্টাব্দে আনুমানিক ৮১ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন। এই হিসেবে তাঁহার জন্ম আনুমানিক ১৫৯২ খ্রীষ্টাব্দে হয়।

—'পদ্মাবতীর' ভূমিকা, ডঃ শহীদুল্লাহ্ সম্পাদিত।

ঘ। আলাউলের জন্মসন যদি আনুমানিক ১৬০৫ খৃঃ ধরা যায়, তাহলে সর্বদিকে সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়। কেননা এতে 'পদ্মাবতী' রচনা কালে কবির বয়স ৪৬/৪৭ হয়, তখন কবির মনে অন্ততঃ যৌবন ছিল। এর ৮ বৎসর পরে 'সায়ফুলমুলক' রচনা কালে কবির বয়স ৫৫/৫৬ হয়, তাই তিনি বার্ধক্যের জন্য আক্ষেপ করেছেন:

'বৃদ্ধকাল হৈল এবে শক্তি টুটি আসে'।

—'সয়ফুলমুলক' রচনা কালে।

'যৌবনকালের সম মন না উল্লাসে।'

—'পদ্মাবতী' রচনা কালে।

আলাউল ১৬৭৩ থেকে ১৬৮০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে পরলোক গমন করেন।

—ডঃ আহমদ শরীফ

ঙ। ১৬২২ খ্রীষ্টাব্দের দিকে তিনি আরাকানে উপস্থিত হন এবং তখন তাঁর বয়স সম্ভবতঃ ষোল বৎসর। সে হিসেবে তাঁর জন্মসন হয় আনুমানিক ১৫৯৬ কিংবা ১৫৯৭ খৃষ্টাব্দ।

—সৈয়দ আলী আহসান।

গবেষকদের বিভিন্ন মত ও আলাওলের রচনা সমূহের বিভিন্ন উদ্ধৃতির আলোচনা করে আমাদের একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে হবে। কবির প্রথম রচনা 'পদ্মাবতী'। 'পদ্মাবতী'তে আত্মপরিচয় জ্ঞাপক চরণ সমূহের কিছু এইরূপ:

কহিতে বহুল কথা দুঃখ আপনার।
রোসাঙ্গে আসিয়া হৈলুঁ রাজ আসোয়ার॥
বহু বহু মুসলমান রোসাঙ্গে বৈসন্ত।
সদাচারী, কুলীন, পণ্ডিত, গুণবন্ত॥
সবে কৃপা করন্ত সম্ভাষি বহুতর।
তালিম-আলিম বলি করন্ত আদর॥

এইখান থেকে জানা যায় যে কবি রোসাঙ্গ এসে 'রাজ আসোয়ার' বা রাজার অশ্বারোহী বাহিনীতে যোগ দেন এবং কবি নিজেকে তখন ছাত্র (তালিম আলিম) বলেছেন।

সৈয়দ আলী আহসান সাহেব কবির এই 'তালিব-আলিম' ও তার সৈন্যবাহিনীতে যোগ দেওয়ার স্বীকারুক্তি থেকে এই সিদ্ধান্তে পৌছেছেন যে কবি যখন রোসাঙ্গে পৌছেন তখন তাঁর কিশোর বয়স। "সম্ভবতঃ তাঁর বয়স ষোল থেকে কুড়ি-একুশের মধ্যে। অশ্বারোহী সৈনিক হতে হলে ষোল থেকে কম বয়স যুক্তিযুক্ত হয় না। আবার তালিব-আলিম পর্যায়ভুক্ত থাকতে হলে কুড়ি-একুশের উর্ধ্বে বয়স যেতে পারে না"।[৫] কিন্তু পদ্মাবতীর রচনা কাল,

যুগ যুগ ভাবরস সন্দ নিত্য দসা।
জে জন তাহাত রত পুরিবেক আসা॥

লিপি বিশারদ বাবু হরিদাস পালিতের মতে 'যুগ যুগ ভাবরস' একটি তারিখ। এই তারিখের সংখ্যা অদ্যাবধি অনির্ণীত। 'সন্দ নিত্য দসা' আর একটি তারিখ, এর সংখ্যা ১০১৩। এই ১০১৩ যে মঘীসন তাতে সন্দেহ নেই। ১০১৩ মঘীতে (১০১৩+৬১৮) ইংরেজী ১৬৫১ খ্রীষ্টাব্দ ছিল। সুতরাং ১৬৫১ খ্রীষ্টাব্দে থদোমিন্তারের রাজত্বকালে (১৬৪৫--১৬৫২) 'পদ্মাবতী' রচিত হয়।[৬]

সৈয়দ আলী আহসান এই সনটির সমিচীনতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করলেও 'পদ্মাবতী' রচনার আনুমানিক সনের (১৬৪৮) সাথে এই সনের পার্থক্য অতি সামান্য। 'পদ্মাবতী'র এগার বৎসর পরে রচিত 'সয়ফুলমুলক বদিউজ্জামালে'র প্রথম অংশে কবি তাঁর বৃদ্ধ বয়সের আভাস দিয়েছেন:

বৃদ্ধকাল হৈল এবে শক্তি টুটি আসে।
যৌবন কালের সম মন না উল্লাসে॥

সুতরাং আমরা এইরূপ মনে করতে পারি যে কবি এমন এক বয়সে পদ্মাবতী রচনা করেন যার এগার বৎসর পরে কবিকে বৃদ্ধ বয়সের জন্য আক্ষেপ করতে হয়। যতদূর সম্ভব রোসাঙ্গে পৌছবার অল্পকাল পরে কবি 'পদ্মাবতী' রচনায় হাত দেন। এই সম্বন্ধে দুটি কারণের উল্লেখ করা যায়:

এক। প্রথম রচনা পদ্মাবতীতে কবি নরবদিগ্যি ও নব অভিষিক্ত রাজা থদোমিন্তারের সম্পর্ক নির্ণয়ে ভুল করেছিলেন। কিন্তু 'সয়ফুলমুলক বদিউজ্জামালে'র প্রথমাংশ রচনা কালে কবির এই ভ্রম সংশোধন হয়ে যায়। 'পদ্মাবতী'তে ভুল করার জন্য যতদূর সম্ভব দায়ী রাজবাড়ীর সদস্যদের সম্বন্ধে কবির জ্ঞানের অভাব। রোসাঙ্গে পৌছার স্বল্প সময়ের মধ্যে 'পদ্মাবতী' রচনায় হাত দেওয়ার ফলে তা ঘটেছিল বলে ধারণা করা যায়। আমরা 'পদ্মাবতী'র রচনা কাল ১৬৪৮ খ্রীষ্টাব্দ বলে ধারণা করে নিয়েছি।

৫. সৈয়দ আলী আহসান। ৬. রোসাঙ্গ রাজসভায় বাঙ্গালা সাহিত্য।

দুই। আলাওলের মত কোন প্রতিভা সুদীর্ঘকাল (১৬১২ থেকে ১৬৪৮ পর্যন্ত) লোক চক্ষুর অন্তরালে ছিল---একথা বিশ্বাস করা যায় না।

সুতরাং ১৬১২ খ্রীষ্টাব্দে আলাওল রোসাঙ্গে পৌঁছেন বলে শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান যে ধারণা করেছেন, তা যুক্তিযুক্ত বলে মনে হচ্ছে না। সৈয়দ আলী আহসান সাহেব আরও মন্তব্য করেছেন যে আলাওল পর্তুগীজদের বন্দীরূপে দিয়াঙ্গায় কিছুদিন কাটিয়েছিলেন। পর্তুগীজদের নথিপত্রে (ষোড়শ শতক) দিয়াঙ্গার উল্লেখ পাওয়া যায়।

১৫৯৬/৯৭ খ্রীষ্টাব্দ যদি আলাওলের জন্মসন হয়, তবে 'পদ্মাবতী' রচনা কালে তাঁর বয়স ৫২ থেকে ৫৫ বৎসরের মধ্যে পড়ে। এই বয়সে আলাওল 'পদ্মাবতী' রচনা করেছেন বলে বিশ্বাস হয় না।

ডঃ শহীদুল্লাহ গঞ্জালিসের প্রভাবে আলাওল রোসাঙ্গ রাজসভায় উচ্চপদ পাননি বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি গঞ্জালিসের কালের সাথে সামঞ্জস্য রেখে আলাওলের কাল নির্ণয়ে অবতীর্ণ হন। ডঃ শহীদুল্লাহ যে চরণ থেকে গঞ্জালেস নামটি আবিষ্কার করেছেন তাঁর যথার্থ্য সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে।

'না পাইলুঁ সহিদ পদ ছিল আয়ুলেস'।

'আয়ুলেস'কে বটতলার ছাপাখানায় ভ্রমবশতঃ 'আকুলেস' পড়া হয়। ডঃ আব্দুল গফুর সিদ্দিকী 'আকুলেস'-এর অর্থ খুঁজে না পেয়ে একে 'আঙ্গলেস'-এ পরিণত করেন। ডঃ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ এই 'আঙ্গলেস'কেই গঞ্জালেস করে ইতিহাসের সমর্থন খুঁজেছেন।[৭] ডঃ আহমদ শরীফ গঞ্জালেস প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত যুক্তিগুলো তুলে ধরেছেন:

ক। গঞ্জালেসের সাথে আরাকান রাজের কোন প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎ বা যোগাযোগ ঘটেনি। লিসবনের কৃষক সন্তান সাবিস্তিয়ান গঞ্জালেস তিবাউ ১৬০৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে আসে। ১৬০৭ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৬১৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তার বিভিন্ন বিশ্বাসঘাতকতার ইতিহাস পাওয়া যায়। ১৬১৭ খ্রীষ্টাব্দের পরে তার কোন খোঁজ পাওয়া যায় না।

খ। স্বার্থের খাতিরে আরাকান রাজ ও গঞ্জালেসের মধ্যে সাময়িক মিত্রতা ও সহযোগিতার ভাব গড়ে উঠলেও হৃদ্যতা জন্মায়নি বা পারস্পরিক সন্দেহ ঘোচেনি। তাই গঞ্জালেসকে আরাকান রাজদরবারে ভ্রাতুষ্পুত্র জামিন রাখতে হয়েছিল।

৭. ডঃ আহমদ শরীফ।

গ। ডক্টর শহীদুল্লাহ্ অনুমান করেন ১৬২০ খ্রীষ্টাব্দে আলাউল আরাকানে পেঁছেন, তখন গঞ্জালেসের সঙ্গে আরাকান রাজের কোন সম্বন্ধই ছিল না।

তদুপরি আলাওলের সাথে গঞ্জালেসের কোন ব্যক্তিগত শত্রুতা ছিল না। ধনলোভেই হার্মাদেরা লুঠ করত—শত্রুতা বশতঃ নয়। কাজেই লুণ্ঠনক্লিষ্ট ব্যক্তির খোঁজ নিয়ে তাঁর সঙ্গে শত্রুতা করার কল্পনাই অবান্তর।

'পদ্মাবতী' রচনার পর আলাওল 'সয়ফুলমুলক বদিউজ্জামাল' ছাড়াও অন্যান্য গ্রন্থে তাঁর বার্ধক্যের কথা উল্লেখ করেছেন।

ক। মুঞি আলাওল হীন, দৈববশ অনুদিন
বিধি বিড়ম্বিল বৃদ্ধকালে।
—তোহফা

খ। তান আজ্ঞা লঙ্ঘিতে না পারি কদাচিত।
যদ্যপিও জরাজীর্ণ চিন্তাকুল চিত॥
---সপ্তপয়কর।

সমরসচীব সৈয়দ মুহম্মদের আদেশে কবি 'সপ্তপয়কর' রচনা করেন। 'সপ্তপয়কর' ফারসী কবি নিজামী গঞ্জাবী'র 'খামসে'র অন্যতম কাব্য 'হপ্তপয়করে'র অনুবাদ। 'সপ্তপয়কর' ১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে অর্থাৎ সুজার রোসাঙ্গরাজের আশ্রয় গ্রহণের পরে ও তাঁর নিহত হওয়ার পূর্বে রচিত। 'সপ্তপয়করে' রোসাঙ্গরাজের প্রশস্তি গাইতে গিয়ে একস্থানে কবি উল্লেখ করেছেন,

দিল্লীশ্বর বংশ আসি যাহার শরণে পশি
তার সম কাহার মহিমা।

এখানে বুঝতে পারা যায় যে এই দিল্লীশ্বর বংশ শাহসুজা। সিংহাসন লাভের জন্য আওরঙ্গজেবের সাথে দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হয়ে বার বার পরাজয় বরণ করে শাহসুজা ব্রহ্মপুত্র নদ অতিক্রম করে চট্টগ্রাম হয়ে ১৬৬০ খ্রীঃ সপরিবারে আরাকান পেঁছেন। 'সপ্তপয়কর' রচনার সময়ে রোসাঙ্গরাজের সাথে তাঁর সম্পর্ক স্বাভাবিক ছিল।

'সয়ফুলমুলকে'র দ্বিতীয়াংশে কবি শাহসুজা ও রোসাঙ্গরাজের মধ্যে ঘটিত বিবাদ বিসম্বাদের উল্লেখ করেছেন:

তার পাছে শাহশুজা নৃপ কুলেশ্বর।
দৈব পরিপাকে আইল রোসাঙ্গ শহর॥

রোসাঙ্গ নৃপতি সঙ্গে করি বিসম্বাদ।
আপনার দোষ হোন্তে পাইল অবসাদ।।
যথেক মুসলমান তার সঙ্গী হৈল।
নৃপতির শাস্তি পাইয়া বহুলোক মৈল।।

'সয়ফুলমুলকে'র প্রথমাংশ রচনার পরে মাগন ঠাকুরের মৃত্যু হলে কবি রচনা স্থগিত রাখেন। অনেক দিন পরে সৈয়দ মুসার আদেশে কবি অবশিষ্ট অংশ রচনা করেন। কবির পাঠ থেকে জানা যায়, শাহশুজা ঘটিত ঘটনার নয় বৎসর পরে কবি 'সয়ফুলমুলক' রচনা করেন ('এই মতে চলি গেল নবম বৎসর।')। সুতরাং 'সয়ফুলমুলকের' শেষাংশের রচনা কাল পাওয়া যাচ্ছে ১৬৬৯ খ্রীষ্টাব্দে, কাব্যের ভাষায় 'মৃগাঙ্ক গগন রস' অর্থাৎ ১০ (মৃগাঙ্ক) ৭ (গগন) ৯ (রস)—১০৭৯ হিজরী বা ১৬৬৯ খ্রীষ্টাব্দ।

'সেকান্দরনামা' কবির শেষ রচনা। শাহশুজা নিহত হবার এগার বৎসর পরে কবি এই কাব্য রচনা করেন।

এহি মতে একাদশ অব্দ বহি গেল।
পুণরপি ভাগ্যোদয় প্রকাশিত হৈল।।

সুতরাং ১৬৭১ খ্রীষ্টাব্দে কবি 'সেকান্দরনামা' রচনা শুরু করেন। এই সময় কবি অতিশয় বৃদ্ধ হয়েছিলেন। কিছুদিন আগে কারাগারের অত্যাচার তাঁকে সহ্য করতে হয়েছিল। আর্থিক দিক থেকে তিনি অত্যন্ত কষ্টে দিন কাটাচ্ছিলেন।

মন্দকৃতি ভিক্ষাবৃত্তি জীবন কর্কশ।
পুত্রদারা সঙ্গে মুঞি হৈলুঁ (অঙ্গ হৈল) পরবশ।।
গুণহেতু মহাজন করন্ত আদর।
ভিক্ষা করি দেয় পুত্র-দারা রাজকর।।
...   ...   ...   ...
তবে আমি নিবেদিলুঁ হৈল বৃদ্ধকাল।
বিশেষতঃ রাজ দায় অধিক জঞ্জাল।।
নীরস হৈল অঙ্গ না প্রকাশে মতি।
তাহা শুনি মজলিসে দয়া হৈল অতি।।

'সেকান্দরনামা' কখন শেষ হয়েছিল; তা জানা যায়নি। যতদূর সম্ভব এরপর কবি আর কিছু রচনায় হাত দেন নি।

আলাওলের জন্মসন সম্বন্ধে ডঃ আহমদ শরীফের অনুমানই প্রণিধানযোগ্য। আলাওলের জন্মসন যদি আনুমানিক ১৬০৫ খৃষ্টাব্দ ধরা যায়, তা হলে সর্বদিকে সামঞ্জস্য রক্ষিত

হয়। কেননা এতে 'পদ্মাবতী' রচনাকালে কবির বয়স ৪৬/৪৭ হয়, তখন কবির মনে অন্ততঃ যৌবন ছিল। এর,৮ বৎসর পরে 'সয়ফুলমুলক' রচনা কালে কবির বয়স ৫৫/৫৬ বৎসর হয়, তাই কবি বার্ধ্যক্যের জন্য আক্ষেপ করেন। 'যৌবন কালের সম মন না উল্লাসে'—'সয়ফুলমুলক' রচনার সময়ে 'পদ্মাবতী'র কাল সম্বন্ধে যতদূর সম্ভব কবি এই কথাটি বলেছেন।[৮]

আলাওলের জন্মস্থান সম্বন্ধে পণ্ডিত সমাজে তীব্র মতানৈক্য রয়েছে। আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ সর্বপ্রথম আলাওলকে চট্টগ্রামের অধিবাসী বলে দাবী করেন। তাঁর মতে চট্টগ্রাম জেলার হাটহাজারী থানার জোবরা গ্রামে আলাওলের জন্ম। ডঃ শহীদুল্লাহর মতে আলাওলের জন্ম ফরিদপুর জেলার হাবেলী ফতেয়াবাদ পরগণার জালালপুর গ্রামে।

আত্মপরিচয় দিতে গিয়ে আলাওল যে সমস্ত চরণে তাঁর জন্মস্থান ও পিতৃ পরিচয় দিয়েছেন সে সমস্ত উদ্ধৃতি এখানে দেওয়া গেল :

১। মুলুক ফতেয়াবাদ গৌড়েতে প্রধান।
তাহাতে জালালপুর অতি পুণ্য স্থান।।
মজলিস কুতুব তথাত অধিপতি।
মুই দীনহীন তান অমাত্য সন্ততি।।
কার্যহেতু যাইতে পন্থে বিধির ঘটন।
হার্মাদের নৌকা সঙ্গে হৈল দরশন।।
বহুযুদ্ধ আছিল শহীদ হৈল তাত।
রণক্ষতে ভোগযোগে আইলুঁ এথাত।।
—পদ্মাবতী

২। মুঞি পরদেশী এক আলাউল হীন।
রোসাঙ্গে পড়িলুঁ আমি আপনা কুদিন।।
গৌড় মধ্যে প্রধান ফতেয়াবাদ দেশ।
অতি পুণ্যবন্ত স্থান নাহি পাপলেশ।।
মধ্যভাগে বহে তার গঙ্গা ভাগীরথী।
... ... ... ...
মজলিস কুতুব এই রাজ্যের ঈশ্বর।
তাহান অমাত্য সুত মুঞি সে পামর।।

৮. ডঃ আহমদ শরীফ।

দৈবগতি কার্যহেতু যাইতে নৌকাপন্থে।
দরশন হইলেক হার্মাদ সহিতে॥
শহীদ হইলেক বাপ যুঝি বহুতর।
রণক্ষতে রোসাঙ্গে আইলুঁ একসর॥
নিজ দুঃখ কথেক কহিমু বিরচিয়া।
রাজ-আসোয়ার হৈলুঁ এথাত আসিয়া॥

---সয়ফুলমুলক বদিউজ্জমাল (প্রথমাংশ)

৩। গৌড় মধ্যে মুলুক ফতেয়াবাদ শ্রেষ্ঠ।
বৈসে সামাজিক লোক উক্তি ভক্তি শিষ্ট॥
বিস্তর দানিশবন্দ খলিফা সুজন।
আউলিয়া সবের বহুল গোড়স্থান॥
হিন্দুকুল শ্রোত্রিয় যে ব্রাহ্মণ সজ্জন।
মধ্যে ভাগীরথী ধারা বহে অনুক্ষণ॥
মজলিস কুতুব এথাতে অধিপতি।
তাহান অমাত্যসুত মুই হীনমতি॥
কার্যহেতু যাইতে পন্থে নৌকার গমনে।
দৈবগতি দেখা হৈল হার্মাদের সনে॥
বহুযুদ্ধ করি শহীদ হৈল পিতা।
রণক্ষতে ভাগ্যবশে আম্মি আইলুঁ এথা॥
কথেক আপনা দুঃখ কহিমু প্রকাশি।
রাজ আসোয়ার হৈনু রোসাঙ্গেত আসি॥

---সতীময়না লোরচন্দ্রানী।

৪। গৌড় মধ্যে মুলুক ফতেয়াবাদ ভূম।
বৈসে সাধু সৎলোক দেশ মনোরম॥

... ... ... ... ...

ভাগীরথী গঙ্গাধারা বহে মধ্য রাজ্য॥
রাজ্যেশ্বর মজলিস কুতুব মহাশয়।
মুই ক্ষুদ্রমতি তান অমাত্য তনয়॥
কার্যহেতু পন্থ ক্রমে আছে কর্মলেখা।
দুষ্ট হার্মাদ সঙ্গে হই গেল দেখা॥

বহুযুদ্ধ করিয়া শহীদ হৈল বাপ।
রণক্ষতে রোসাঙ্গে আইলুঁ মহাপাপ।
না পাইলুঁ সহিদ পদ ছিল আয়ুলেশ।
রাজ-আসোয়ার হৈলুঁ আসি এই দেশ॥

...     ...     ...     ...

এই মতে সুখে গোঞাইলুঁ কথকাল।
বিধিবশে অবশেষে পড়িল জঞ্জাল॥
শাহশুজা রোসাঙ্গে আইল দৈবগতি।
হতবুদ্ধি পাত্রসব দিল হতমতি॥
আপনার দোষ হস্তে পাএ অবসাদ।
একপাপী আমারেহ দিল মিথ্যাবাদ॥
কারাগারে পৈলুঁ আমি না পাই বিচার।
মথ ইথি বসতি হইল ছারখার॥
শালাসনে মৈল যেই দিল অপবাদ।
অস্থানে পড়িয়া পাইলুঁ বহু অবসাদ॥

—সেকান্দরনামা।

উপরোক্ত উদ্ধৃতিগুলো থেকে জানা যায় যে মজলিস কুতুবের কোন অমাত্যের সন্তান আলাওল। মজলিস কুতুব ফতেয়াবাদের শাসক ছিলেন। ফতেয়াবাদের জালালপুর নামক স্থানে কবি পিতার সাথে বাস করতেন। কোন কার্যোপলক্ষে নদীপথে চলার সময় হার্মাদ জলদস্যু কর্তৃক পিতাপুত্র আক্রান্ত হন। পিতা অনেকক্ষণ যুদ্ধ করে শহীদ হন। অনেক দুঃখ পাওয়ার পর আলাওল রোসাঙ্গে এসে উপস্থিত হন। তথায় তিনি রাজ আসোয়ারের ( Royal body-guard ) চাকরী নিয়ে বাস করতে থাকেন।

মজলিস কুতুবের রাজ্য ফতেয়াবাদ জিলায়। **N. K. Bhattasali** তাঁর **'Bengal chief's struggle for Independence in the reign of Akbar & Jahangir'** গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন:

"Majlis Kutub, Zamindar of Fatehabad, modern Faridpur. In the beginning of the Mughal rule, Murad Khan was the Zamindar of Fatehabad. He died about 1580 A. D. and his sons were one day assassinated by Mukundaram, Zamindar of Bhushna, lured by a false invitation. So Fatehabad was for some years in the possession of Mukundaram. But how Mukundaram was ousted and Majlis Kutub

came into possession is not recorded. Akbarnama speaks of Bhushna falling into the hands of the enemies and probably Fatehabad came into the possession of the rebellions chiefs at the same time, and was appointed to Majlis Kutub. When Islam Khan sent forces against Majlis Kutub, Musa Khan sent Majlis help in the shape of a number of war boats. This shows that they were in alliance".

ইসলাম খানের সময় (১৬০৮-১৩) মজলিস কুতুবকে ফতেয়াবাদের শাসক দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। মুসা খানের সাহায্য পাওয়া সত্ত্বেও মজলিস কুতুব ইসলাম খানের সেনাপতি হাবিবুল্লাহকে ঠেকিয়ে রাখতে পারেন নি। ভাওয়ালের বাহাদুর গাজী (As we find him on the side of Musa Khan, fighting the Imperial forces during the viceroyalty of Islam Khan)[১] শেষ পর্যন্ত ভয় পেয়ে ইসলাম খানের কাছে আত্মসমর্পণ করেন। ইসলাম খান তাঁদের সামরিক শক্তি হরণ করে নিয়ে তাঁর অধীনস্ত জায়গীরদার রূপে নিযুক্ত রাখেন।

'আইন-ই-আকবরী'র মতে ফতেয়াবাদ পরগণার কেন্দ্রীয় দফতর ছিল 'হাবেলী ফতেয়াবাদ' মহলের কোন এক জায়গায়। বর্তমান ফরিদপুর শহর উক্ত 'হাবেলী ফতেয়াবাদে'র অন্তর্গত হলেও ওটা ইংরেজ আমলে গড়া শহর। 'বাহারিস্তান-ই-গয়বী'তে ফতেয়া-বাদের জালালপুর নাম পাওয়া যায়।

আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ ও জনাব এনামুল হক রচিত 'আরকান রাজসভায় বাঙ্গালা সাহিত্যে' আলাওলের জন্মস্থান সম্বন্ধে বলা হয়েছে, "তাঁহার জন্মস্থান যে চট্টগ্রাম জেলায় ছিল তাহাতে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই ; কেননা আলাওল কবিকে আজ পর্যন্ত চট্টগ্রামবাসী মুসলমানেরাই বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন এবং তাঁহার সমুদয় কাব্যের প্রাচীন হস্তলিপি ও তাঁহার কীর্ত্তিচিহ্ন চট্টগ্রামেই আবিষ্কৃত হইয়াছে। আমরা স্থানীয় ভাবে অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিয়াছি,— চট্টগ্রাম জেলার হাটহাজারী থানার 'জোবরা' নামক এক গ্রাম আছে। এই গ্রামেই আলাওলের প্রতিষ্ঠিত সুবৃহৎ দীর্ঘিকা (যাহা এখনও 'আলাওলের দীঘি' নামে পরিচিত) এবং এই বিখ্যাত দীঘির পূর্ব্ব ধারে চারিকানি পরিমিত স্থানব্যাপী কবির বাস্তুভিটা ও তাহার উত্তরপূর্ব কোণে কবির পাকা কবর অদ্যাপি বর্তমান থাকিয়া তাঁহার অমর স্মৃতি বহন করিতেছে। এখন এই ভিটার অংশ বিশেষে কবির বংশধরগণ দীনভাবে অবস্থিতি করিতেছেন। সুতরাং অনুমান করা যাইতে পারে যে, আলাওলের পিতা এই জোবরা গ্রামেরই স্থায়ী অধিবাসী ছিলেন। খুব সম্ভব এই স্থানেই আলাওলের জন্ম হয়।

১. N. K. Bhattasali.

তাঁহার জীবনের পরবর্তী ঘটনা আমাদের এই অনুমানের পক্ষে সাক্ষ্য দান করিতেছে।"

চট্টগ্রাম গৌড়ের অন্তর্গত, যদিও দীর্ঘকাল রোসাঙ্গরাজের অধীনে ছিল। চট্টগ্রাম শহর থেকে অনতিদূরে, বর্তমানে যেখানে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে, তার নিকটে হালদা নদীর মোহনার সন্নিকটে ফতেয়াবাদ নামে একটি গ্রাম আছে, কিন্তু জালালপুর নেই। ফতেয়াবাদের স্বল্প দক্ষিণে অবস্থিত জালালাবাদ পাহাড় জঙ্গলাকীর্ণ একটি স্থান। সেখানে কোনকালে কোন জনপদ ছিল বলে মনে হয় না। 'তবে শহরের উপকণ্ঠ বটে। কবি যেখানে বহুকাল থেকে এসেছেন, সে জায়গার নাম ভুল হবার কথা নয়'।[১০]

'ভাগীরথী গঙ্গাধারা বহে মধ্য রাজ্য।'—ডঃ এনামুল হক গঙ্গাধারা অর্থে নদী ব্যবহার করেছেন, কিন্তু ভাগীরথী শব্দের কোন অর্থ করেননি। তাঁর আলোচনায় তিনি 'ভাগীরথী' ও 'জালালপুর' শব্দ দুটিকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করেছেন।

হাটহাজারী থানায় যে দীঘিটি 'আলাওলের দীঘি' নামে পরিচিত এবং 'আরকান রাজসভায় বাঙ্গালা সাহিত্য' গ্রন্থে আলাওলের জন্মস্থান চট্টগ্রাম নির্ণয়ে অন্যতম প্রমাণ স্বরূপ উপস্থাপিত করা হয়েছে তার সত্যতা সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান সর্বপ্রথম এইদিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তাঁর মতে এই দীঘি সম্বন্ধে ঐতিহাসিক প্রমাণ লোক-প্রচলিত ধারণার সম্পূর্ণ বিপরীত।

আলাওলের দীঘির পাড়ে যে মসজিদ রয়েছে তার দেওয়ালে আঁটা একখানি শিলালিপির কথা 'The Journal of the Bihar & Orissa Research Society', Vol-IV 1918-এ আলোচনা করা হয়েছে:

"The inscription is stuck in the walls of a masjid with masonary walls and a thatched roof which is said to have been built on the site of an ancient masjid at Hathajari in the Chittagong district of Bengal. It is stated by the attendents that the masjid was built by the well-known Bengali Poet Alawal Khan and that the inscription was originally fixed over the entrance of old mosque. The inscription itself does not mention Alawal Khan, but record the erection of mosque by the Majlis Ali Rasti Khan on the 25th day of Ramadan, 875 A. H.=1473 A. D. during the reign of Rukun-ud-din Barbak Shah, son of Mahmud Shah".

১০. ডঃ আহমদ শরীফ।

শিলালিপিটির বাংলা প্রতিলিপি:

"এয়া আল্লাহ মেফুতাহল আবওয়াব বতারিখ বিস্ত পাঞ্চুম মাহে রমযানল্ মুবারেক সনে সমনিয়া অ-সব-ইমারত অ-সমানিয়া মেয়াতিন ফি আহাদে সুলতান রুকন-উদ-দীন আদ্দুনিয়া আবুল মুযাফফর 'বরবক শাহ সুলতান ইবনে মাহ্‌মুদ শাহ্ সুলতান খুল্লাইল্লাহ মুলকহু অ-সুলতানতা হাযাল মসজিদে মজলিনুন ইলমুন আলাহির্ রহমান অল্ গোফরান বেনা কর্দা রাস্তি খান"।[১১]

বাংলা অনুবাদ:

"হে দ্বারসমূহের উদ্‌ঘাটনকারী আল্লাহ! ৮৭৮ হিজরী (১৪৭৩ খ্রীঃ) পবিত্র রামজান মাসের ২৫ তারিখে সুলতান মাহমুদ শাহের পুত্র, দ্বীন দুনিয়ার স্তম্ভ, বিজয়ী সুলতান বরবক শাহের সময়ে,—আল্লাহ তার রাজ্য ও রাজত্ব অক্ষুণ্ণ রাখুন—ধর্ম প্রচারকদের উপবেশন স্থান এই মসজিদ রাস্তি খান কর্তৃক নির্মিত। আল্লাহ তাঁর প্রতি ক্ষমা ও কৃপা দান করুন"।

প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের নানা জায়গায় রাস্তি খানের নাম পাওয়া যায়। কবীন্দ্র পরমেশ্বর তাঁর মহাভারতে পৃষ্ঠপোষক পরাগল সম্বন্ধে বলেছেন, "রাস্তিখান তনয় বহুল গুণনিধি"। পরাগল খান আলাউদ্দীন হুসেন শাহের রাজত্ব কালে চট্টগ্রাম অঞ্চলের লস্কর বা শাসনকর্তা ছিলেন। সুতরাং তাঁর পিতা রাস্তি খান বরবক শাহের আমলে চট্টগ্রামে খুব উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন বলে মনে করা হয়। রাস্তি খান কী পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তা জানা যায় তাঁর অষ্টম অধস্তন পুরুষ মুহাম্মদ খানের রচিত 'মক্তুল হোসেন' কাব্য থেকে। এই কাব্যে মুহাম্মদ হোসেন তাঁর বিস্তৃত বংশ পরিচয় দিয়েছেন এবং লিখেছেন যে রাস্তি খান 'চট্টগ্রাম দেশপতি' ছিলেন। সুতরাং রাস্তি খান ও পরাগল

১১. ডঃ আহমদ শরীফ কর্তৃক গৃহীত উপরোক্ত পাঠকে সৈয়দ আলী আহসান সাহেব ত্রুটিপূর্ণ মনে করেন, তিনি 'The Journal of the Bihar and Orissa Research Society', Vol. IV, 1918 থেকে নিম্নোক্ত পাঠ গ্রহণ করেছেন বলে জানিয়েছেন।

"ইয়া মুফতিহুল আবওয়াব ইন্নাহু বিতারিখ বিস্ত ও পঞ্চম মাহ রমযানুল মুবারক সন সমান ও সাবঈনা ও সমানমিয়াতা ফী আহদে সুলতান রুকনুদ্দুনইয়া ওয়াদ্দীন আবুল মুযাফফর বারবাক শাহ আস সুলতান। ইবন মাহমুদ শাহ আস সুলতান খাল্লাদাল্লাহ মুলকাহু ও সুলতানাহু হাযাল মসজিদু মজলিসি আলা আলাইহির রহমত ওয়াল গুফরান বিনা করদাই রাস্তি খান।"

সৈয়দ আলী আহসান কৃত অনুবাদ:

"হে দ্বারসমূহ উন্মোচনকারী। নিশ্চয়ই ইহা সন ৮৭৮ হিজরীর পবিত্র রমযান মাসের ২৫শে তারিখে সুলতান রুকনুদ্দীন আবুল মুযাফফর বারবাক শাহ ইবনে সুলতান মাহমুদ শাহের (আল্লাহ তাঁহার রাজশক্তি চিরস্থায়ী করুন) শাসনকালে মজলিস-ই-আ'লার (তাঁহার প্রতি রহমত ও ক্ষমা) এই মসজিদ রাস্তি খান কর্তৃক নির্মিত।"

খান উভয়েই চট্টগ্রামের শাসনকর্তা বা লস্কর ছিলেন। তাঁর পৌত্র ছুটি খানও বাংলার সুলতানের লস্কর ছিলেন। তিনি সম্ভবতঃ ত্রিপুরার অধিকৃত অঞ্চলের শাসনকর্তা ছিলেন।[১২]

চট্টগ্রামের এককালীন শাসনকর্তা রাস্তি খানই যে এই মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। মসজিদের পাশে স্বভাবতই একটি পুকুর থাকে। 'পুকুর বিহীন মসজিদ কল্পনাও দুঃসাধ্য। অতএব মসজিদ যখন রাস্তি খানের, দীঘিও রাস্তি খানের না হয়ে যায় না। সম্ভবতঃ কোন অজ্ঞাতনামা আলাউল দীঘির পাড়ে ঘর করেন। তাঁর বংশধরগণ সুপরিচিত কবি আলাউলকেই নাম-সাদৃশ্যবশতঃ তাঁদের পূর্বপুরুষ বলে চালিয়ে দিয়েছেন'।[১৩]

একটা কথা স্থির নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে আলাওল তাঁর জীবনের প্রথম দিকে পিতার সঙ্গে ফরিদপুরে কাটিয়েছেন। কিন্তু এমন কোন যুক্তি বা প্রমাণ নেই যার উপরে ভিত্তি করে আলাওলের জন্ম ফরিদপুরে বলা যায়। হতে পারে আলাওলের পিতা চাকুরী হেতু সপরিবারে তথায় বাস করতেন। এ'থেকে অনুমান করা যায় আলাওলের জন্ম ফরিদপুর---তবে তা একান্ত অনুমান মাত্রই। "সম্প্রতি লোক মুখে শুনতে পাচ্ছি, যে জালালপুর এক সময়ে পদ্মাগর্ভে বিলীন হয়ে গিয়েছিল, পুরনো দলিল দস্তাবিজ অনুসারে ঠিক তার জায়গায় একটি নতুন চর উঠেছে। ......(খবরটি) যদি সত্য হয়, তবে আমাদের সব বিতর্কের অবসান হবে"---এই মন্তব্যের দ্বারা ডঃ আহমদ শরীফ সাহেব কি বুঝাতে চেয়েছেন বলা যায় না। বিলীন হয়ে যাওয়া একটি চরের স্থানে নতুন একটি চরের উদ্ভব পূর্বতন চরের সম্বন্ধে কোন তথ্য দানে সহায়তা করবে---এ কথা বলা যায় না। আশা করি এব্যাপারে তিনি বিস্তৃত ব্যাখ্যা দিবেন।

জোবরা গ্রামে আলাওলের বংশধর রয়েছে বলে যে ধারণা, তা অনুমান নির্ভর মাত্র। আলাওল জোবরা গ্রামে বসতি স্থাপন করলে আঠার শতকের শেষার্ধের কবি মুকিম কখনো বলতেন না যে আলাওল "গৌড়বাড়ী রইল আসি রোসাঙ্গের ধাম"।

জনাব মাহবুবুল আলম তাঁর 'চট্টগ্রামের ইতিহাস' গ্রন্থে আলাওলের একটি 'বংশ-লতিকা' আরাকান থেকে আবিষ্কার করেছেন বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এই বংশ লতিকায় আলাওলের পিতার নাম নেই এবং তাঁর পরের পঞ্চম পুরুষ সম্বন্ধে কোন সংবাদ

১২. সুখময় মুখোপাধ্যায়। ১৩. ডঃ আহমদ শরীফ।

পরিবেশন করা হয়নি। এই বংশ-লতিকাটিতে আলাওলকে তাঁর পিতার কনিষ্ঠ সন্তান বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আলাওলের বড় তিন ভাইয়ের নামও এখানে পাওয়া যায়। প্রত্যেকের নামের শেষে শাহ্ উপাধি এবং পূর্বে সৈয়দ উপাধি জুরে দেওয়া হয়েছে। আলাওলের কোন ভনিতায় শাহ বা সৈয়দ উপাধি পাওয়া যায় না। তদুপরি আলাওলের আত্মকথন অংশে স্পষ্ট বলা হয়েছে যে পিতাপুত্র দু'জনই নদীপথে যাত্রা করেছিলেন। পরিবারের অন্য কেউ তাঁদের সহযাত্রী ছিল বলে কোথাও ঘুনাক্ষরে বলা হয়নি। এমতাবস্থায় আলাওলের বড় তিন ভাই কোথা হতে আরাকানে গিয়ে উপস্থিত হলেন বুঝা যায় না।

আলাওল তাঁর শেষ রচনা 'সেকান্দরনামা'য় খেলাফৎ প্রাপ্তির কথা উল্লেখ করেছেন:

সৈয়দ শহীদ শাহ্ রোসাঙ্গের কাজী।
জ্ঞান অল্প আছে বলি মোরে হৈল রাজী॥
দয়াল চরিত্র পীর অতুল্য মহৎ
কৃপা করি দিল মোরে কাদেরী খিলাফৎ॥

কিন্তু তিনশত ভনিতার কোথাও আলাওল সৈয়দ উপাধি ব্যবহার করেননি। সুতরাং বংশ লতিকাটি নিঃসন্দেহে আমাদের বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠেনি।

যতদূর সম্ভব আলাওল দৈব দুর্বিপাকে রোসাঙ্গে পৌঁছার পর থেকে তাঁর শেষ জীবন রোসাঙ্গে কাটিয়েছিলেন। থদোমিন্তারের রাজত্বকালে (১৬৪৫-১৬৫২) আলাওল রোসাঙ্গে পৌঁছেন। শেষ জীবনে তিনি চরম আর্থিক দৈন্যের মধ্যে কালাতিপাত করেন।

আয়ুলেশ আক্ষা ছিল রাখে বিধাতাএ।
সব ভিক্ষা জীবরক্ষা ক্লেশে দিন জাএ॥
—সয়ফুলমুলক (দ্বিতীয়াংশ)।

মন্দকৃতি ভিক্ষাবৃত্তি জীবন কর্কশ।
পুত্রদারা সঙ্গে মুঞি হৈলুঁ পরবশ॥
—সেকান্দরনামা।

এই চরম আর্থিক দৈন্যের সময়ে রোসাঙ্গ ছেড়ে বাইরে গিয়ে বাস করা আলাওলের পক্ষে আর্থিক কারণে সম্ভব ছিল না। 'সেকান্দরনামা' রচনার সময়ে (১৬৭১) কবি রোসাঙ্গে অবস্থান করছিলেন। ১৬৬৬ খ্রীষ্টাব্দে সুবাদার শায়েস্তা খান উত্তর চট্টগ্রাম মোঘল অধিকারভুক্ত করে নেন।[১৪] সুতরাং রোসাঙ্গরাজ-অমাত্যের প্রিয়পাত্র আলাওলের পক্ষে শত্রুর রাজ্যে বাস করা সম্ভবপর ছিল না।

১৪. J. N. Sarkar, History of Bengal, Vol.-II. ও The Cambridge History of World, Vol. IV. ( The Moghal Period.) Edited by Sir Richard Burn,

চট্টগ্রাম জেলার রামু থেকে প্রায় ১০০ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত বর্মার জেলা শহর ম্রোহং-এ আলাওলের কবর রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। 'এই ম্রোহং বা রোসাঙ্গ শহর অঞ্চল এখন চট্টগ্রামবাসীর নিকট 'পাথুরে কেল্লা' নামে পরিচিত। পাথুরে কেল্লার ভগ্নাবশেষ দৃষ্টে স্থানটি এনামে নির্দেশিত হয়। এখানে আলাউলের কবর আছে'।[১০] অধ্যাপক মনসুরউদ্দীন বলেন, "আলাওলের কবর আকিয়াবের সন্নিকটস্থ Myanktang বা নয়া শহরে অবস্থিত"। তিনি আরো বলেন যে, "আরাকানী মগী হরফেও আলাওলের রচনা প্রচলিত রহিয়াছে"।

আলাওলের রচনাসমুহের আত্মপরিচয় জ্ঞাপক অংশ থেকে জানা যায় যে আলাওল ৫০ দিন কারাবাস করতে বাধ্য হন:

বহুল যন্ত্রণা দুঃখ পাইলুম ক্লেশ।
গর্ভবাস আছিলাম পঞ্চাশ দিবস।।

—সয়ফুলমুলক (দ্বিতীয়াংশ)।

আওরঙ্গজেবের হাতে পর্যুদস্ত হয়ে শাহগুজা রোসাঙ্গরাজের কাছে আশ্রয় গ্রহণ করেন। কিন্তু ঘটনাচক্রে রোসাঙ্গরাজের হাতে তিনি প্রাণ হারান। তাঁর সঙ্গী সাথীদের অনেকে রোসাঙ্গরাজ থিরি-সান্দ-থুধম্মার কোপ-দৃষ্টির শিকারে পরিণত হন। 'সয়ফুলমুলক বদিউজ্জামাল' কাব্যের দ্বিতীয়াংশ রচনাকালে কবি এর কথা প্রথম উল্লেখ করেন:

তার পাছে শাহগুজা নৃপ কুলেশ্বর।
দৈব পরিপাকে আইল রোসাঙ্গ শহর।।
রোসাঙ্গ নৃপতি সঙ্গে করি বিসম্বাদ।
আপনার দোষ হস্তে পাইল অবসাদ।।
যথেক মুসলমান তার সঙ্গী হৈল।
নৃপতির শাস্তি পাইয়া বহুলোক মৈল।।
মির্জা নামে এক পাপী সত্য ধর্ম ভ্রষ্ট।
নিগ্রহ করিয়া বহুলোক করে নষ্ট।।
যার সঙ্গে ছিল তার তিল মন্দ ভাব।
অপরাধী করি তারে পাইলেক লাভ।।
নিকটে মরণ জানি ইচ্ছাগত পাপ।
যে জন মাগএ আগি নর্ক মাগে আপ।।

১০. ডঃ আহমদ শরীফ।

এজিদ প্রকৃতি সেই দাসীর নন্দন।
মিথ্যা কহি বহু লোক করাইছে বন্ধন।।
আয়ুযুক্ত সব নষ্ট পড়িল অস্থান।
পাপরাশি ধর্মনাশি মৈল শালবান।।
আম্মারেহ অপরাধ দিল পাপীছারে।
না পাইয়া বিচার পড়িলুম কারাগারে।।

'সেকান্দরনামা'য়ও কবি এই সম্বন্ধে বলেছেন:

শাহশুজা রোসাঙ্গে আইল দৈবগতি।
হতবুদ্ধি পাত্রসব দিল হতমতি।।
আপনার দোষ হন্তে পাএ অবসাদ।
এক পাপী আমারেহ দিল মিথ্যাবাদ।।
কারাগারে পৈলুঁ আমি না পাই বিচার।
যথ ইতি বসতি হইল ছারখার।।
শালাসনে মৈল যেই দিল অপবাদ।
অস্থানে পড়িয়া পাইলুঁ বহু অবসাদ।।

'এজিদ প্রকৃতি দাসীর নন্দন' মীর্জার মিথ্যা অপবাদে কবিকে অনেক দুঃখকষ্ট লাঞ্ছনা সইতে হয়েছে। কারামুক্তির পরেও কবি জীবনে আর শান্তি পাননি। বিপর্যয়ের তীব্র ঝড়-ঝঞ্ঝায় আলাওলের জীবন পূর্ণ। হার্মাদের সাথে দ্বন্দ্বে আমরা প্রথম আলাওলের সাক্ষাৎ লাভ করি। নিদারুণ দারিদ্র্যের সাথে মর্মান্তিক সংগ্রামে তাঁর জীবনের সমাপ্তির আভাস পাই। দিয়াঙ্গার পর্তুগীজ বন্দীশিবিরেও তিনি হয়ত কিছুদিন কাটিয়ে জীবনের অভিজ্ঞতার ঘট পূর্ণ করেছিলেন। তাঁর জীবন-ঘটনা সমূহের প্রক্ষেপ তাঁর কাব্যেও ঘটেছে। আলাওলের কাব্যের প্রকৃত আস্বাদ জীবনের একটা বিপুল সমুন্নত ও তরঙ্গিত রূপের বিশিষ্টতায়। 'আলাওলের জীবনে বিপর্যয় প্রচুর, কিন্তু স্মিত হাস্যে কবি তাকে জয় করেননি মুকুন্দরামের মত কিংবা ভারতচন্দ্রের মত বক্র ব্যঙ্গ দৃষ্টিতে তাকে আহতও করেননি। মুহূর্তে মৃত্যুর ফেনিল উন্মত্ততা উপকণ্ঠ ভরে পান করার উদ্দাম উল্লাস অনুভব করেছেন। জীবনের ঘটনা থেকে কবির ব্যক্তিত্ব এই জিজ্ঞাসাকেই আকর্ষণ করে নিয়েছে'।[১৬]

আলোচনান্তে এইটুকু অনুমান করা যায় যে ১৬০৫ খ্রীষ্টাব্দে আলাওল জন্মগ্রহণ করেন। জন্মগ্রহণ যেখানেই করে থাকুন না কেন, প্রথম যৌবন কবি পিতার সাথে ফতেয়াবাদে (আধুনিক ফরিদপুর) বাস করতে থাকেন। পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের

১৬. ক্ষেত্রগুপ্ত।

ফতেয়াবাদে অবস্থান সম্পর্কে কবি কিন্তু কিছু বলেননি। কোন কার্যোপলক্ষে তিনি পিতার সাথে কোন স্থানে, বিশেষ করে পূর্ববঙ্গের নিম্ন অঞ্চলের কোন স্থানে যাওয়ার সময়ে হার্মাদ জলদস্যুদের হাতে পড়েন। তাঁর পিতা নিহত হন এবং কবি রোসাঙ্গরাজ থদোমিন্তারের রাজত্বকালে (১৬৪৫-১৬৫২) রোসাঙ্গে এসে পৌঁছেন। রোসাঙ্গে পৌঁছে তিনি 'রাজ আসোয়ার'-এর চাকরী নেন। অল্প সময়ের মধ্যে তিনি মাগন ঠাকুরের দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ হন। রোসাঙ্গরাজ নরবদিগ্যি ( Narabadigyi ১৬৩৮-৪৫) মৃত্যুকালে বিশ্বস্ত অমাত্য মাগন ঠাকুরকে তাঁর একমাত্র কন্যার অভিভাবক নিযুক্ত করেন। নরবদিগ্যির মৃত্যুর পর মাগন ঠাকুর নরবদিগ্যির ভ্রাতুষ্পুত্র থদোমিন্তারের সাথে রাজকন্যার বিবাহ দেন। এই থদোমিন্তারের সময় আলাওল আরাকান পৌঁছেন বিধায় অতি অল্প সময়ের মধ্যে মৃত রাজার সাথে থদোমিন্তারের সম্পর্ক নির্ণয়ে ভুল করেন:

সলিম শাহের বংশ যদ্যপি হইল ধ্বংস
নৃপগৃহ হৈল রাজ্যপাল।
রাজসুখ ভোগ মূল কি দিব তাহার তুল
রসভোগে গোঞাইল কাল॥
একপুত্র এক কন্যা সংসারেতে ধন্য ধন্য
জন্মিলেক নৃপতি সম্ভব।
চলিতে ত্রিদিবস্থান পুত্র কৈলা রাজ্যদান
যারে দেখি লজ্জিত বাসব॥
সাদউ মেঙদার নাম রূপেগুণে অনুপাম
মহাবুদ্ধি ভাগ্য অনুরেখ।

—পদ্মাবতী

কবির প্রথম রচিত কাব্যে এই ভুল হয়েছিল। 'সয়ফুলমুলক' রচনাকালে কবির এই ভুল সংশোধন হয়ে যায়:

নৃপতিগিরির কন্যা পরমা সুন্দরী।
সাদউ মেঙ নৃপের ছিল মুখ্য পাটেশ্বরী॥
সাদউ মেঙদার যদি গেল পরলোকে।
ব্রতধর্ম আচরি রহিল স্বামী শোকে॥
শ্রীচন্দ্র সুধর্মা নৃপতিক শিশু দেখি।
সকল অমাত্যগণ হৈল একমুখী॥
দণ্ডবৎ হইয়া মহাদেবীর গোচর।
কহিতে লাগিলা সবে বিনয় উত্তর॥

শিশুনৃপে কেমনে পালিব বসুমতী।
পুত্রে রাজা করিয়া আপনে পাল ক্ষিতি।।
ঈশ্বর দুহিতা তুহ্মি ঈশ্বর বনিতা।
তোহ্মা বিনু কেবা আছে ঈশ্বর পালয়িতা।।
রাজ্য কর্তা পুন নৃপ হইব যখন।
ব্রতধর্ম আচরি দেবী রহিও তখন।।
এথেক বিনয় যদি কৈলা পাত্রগণ।
পুত্রতুল্য করে দেবী রাজ্যের পালন।।
হেনমত কোথা আর নাহি দেখি শুনি।
রাজ্যের ঈশ্বর রাজগৃহে তপস্বিনী।।
তাহান অমাত্য শ্রেষ্ঠ শ্রীযুত মাগন।
শিশুকালে বৃদ্ধরাজা কৈলা সমর্পণ।।
যথেক সম্পদধন দুহিতাক দিল।
তান হস্তে আনিয়া সকল সমর্পিল।।
মুখ্য পাটেশ্বরী যদি হৈলা যশস্বিনী।
মুখ্যপাত্র হইয়া মাগন গুণনিধি।।

থদোমিন্তারের সিংহাসন আরোহনের অল্প কাল পরে রোসাঙ্গে এসে পৌঁছেন বলে কবি উপরোক্ত ভুল করেন। ১৬৪৫ খ্রীষ্টাব্দে থদোমিন্তারের অভিষেক সম্পন্ন হয়। এথেকে ধারনা করা যায় যে ১৬৪৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে আলাওল রোসাঙ্গে আসেন।

মাগন ঠাকুরের আদেশে কবি 'পদ্মাবতী' ও 'সয়ফুলমুলক বদিউজ্জামাল' কাব্য রচনা করেন। 'সয়ফুলমুলক' রচনা সমাপ্তির পূর্বে মাগন ঠাকুর মৃত্যুবরণ করেন:

আদেশেএ মুখ্যপাত্র শ্রীযুত মাগন।
সয়ফুলমুলক পুথি করিতে রচন।।
সাঙ্গ না হৈথে পুথি পাইল পরলোক।
কথকাল মনে মোর আছিলেক শোক।।

মাগন ঠাকুরের মৃত্যুর পর তিনি শ্রীমন্ত সোলায়মানের পৃষ্ঠপোষকতায় 'সতীময়না লোর চন্দ্রানী' রচনা করেন। দৌলত কাযী এই কাব্যের প্রথম দুখণ্ড রচনা করেন। তিনি থিরি-থু-ধম্মার (Thiri-thu-dhamma) সমর সচিব আশরাফ খাঁর আদেশে ১৬২২ থেকে ১৬৩৮ এর মধ্যে তাঁর কাব্য রচনা সমাপ্ত করেন।

শ্রীযুত সোলেমান মহাগুণবন্ত।
পরদেশী পাইলে আদরে পোষন্ত॥
মহা হরষিত হৈল পাইয়া আহ্মারে।
অন্ন বস্ত্র দানে নিত্য পোষন্ত আদরে।

... ... ... ...

প্রসঙ্গ হইল লোরচন্দ্রানীর কথা।
অসাঙ্গ রহিল এই রস কাব্য গাথা॥

... ... ... ...

এথেক ভাবিয়া সোলেমান মহামতি।
হরষেতে আদেশ করিল আহ্মাপ্রতি॥
এই খণ্ড পুস্তক পুরাও আমার নাম।

শ্রীমন্ত সোলেমানের পর সৈয়দ মুসার পৃষ্ঠপোষকতায় তিনি 'সয়ফুলমুলকে'র অসমাপ্ত অংশ রচনা করেন:

ছৈদ মুসা নামে এক পুরুষ মহন্ত।
অভিন্ন বদন রূপ মহাগুণবন্ত।
আহ্মি বৃদ্ধ ফকিরেরে অতি বহুতর।
তালিম-আলিম বলি করএ আদর॥
দানে পরিপুরন্ত পোষন্ত অনুক্ষণ।
প্রেমবশে মান্যরসে বাঁধা মোর মন॥
একদিন ডাকিয়া যে আপন আলএ।
ধহল করিয়া কহিলা যে মহাশএ॥
পুস্তকর আজ্ঞাকারী শ্রীযুত মাগন।
আছিল তোহ্মার শিষ্য মোর বন্ধুজন॥
খণ্ডবাক্য আছিল পুস্তক মনোহর।
সমাপ্ত হইলে রস হএ বহুতর॥
আহ্মার গৌরব মনে তাহার বচন।
আজ্ঞা করি তোষ যথ পাঠকের মন॥

১৬৬৩ খ্রীষ্টাব্দের দিকে তিনি সৈয়দ মুহাম্মদ খানের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। সৈয়দ মুহাম্মদ খান সভা-কবি ছিলেন, 'মুখ্য সেনাপতি সৈদ মহাম্মদ'। তাঁর আদেশে কবি 'সপ্তপয়কর' কাব্য রচনা করেন:

এহি মহাপুরুষ বিশেষ পালয়িতা।
পিতার সমান শাস্ত্রে বলে অন্নদাতা॥

তান আজ্ঞা লঙ্ঘিতে না পারি কদাচিত।
যদ্যপি পিঞ্জরা জীর্ণ চিন্তাএ পীড়িত॥
যদি বা অযোগ্য আমি গ্রন্থ রচিবার।
তান ভাগ্যলোকে হৈল সমুদ্র সাঁতার॥

—সপ্তপয়কর।

শ্রীমন্ত সোলায়মানের আদেশে কবি ১৬৬৪ খ্রীষ্টাব্দে কোরান-হাদিস, কেয়াজ-এজমা, লৌকিক বিশ্বাস-সংস্কার ,সামাজিক রীতিনীতি ও লোকাচার সমন্বিত একমাত্র আধ্যাত্মিক কাব্য 'তোহফা' রচনা করেন।

মজলিস নবরাজের পৃষ্ঠপোষকতায় আলাওল শেষ জীবন অতিবাহিত করেন:

শ্রীমন্ত মজলিস অতুল মহত্ত্ব।
নবরাজ পাইয়া যদি হৈল মহাসাত্ত্ব॥
মধুর বচন মোর শুনিয়া রসন।
সাদরে আনিয়া আমা কৈল সভাসদ॥
অন্নবস্ত্রে তুষিয়া পোষন্ত নিরন্তর।
তান দানে সুসময়ে শুধি রাজকর॥

এই দান কিন্তু কবি সহজ চিত্তে গ্রহণ করতে পারেননি। তিনি ভিক্ষাবৃত্তির সাথে এর তুলনা করে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। নবরাজ মজলিসের আদেশে তিনি শেষ কাব্য 'সেকান্দরনামা' (১৬৭১) রচনা করেন:

এথ ভাবি আমা প্রতি করিল আদেশ।
মোর নামে গ্রন্থ রচ যত্নে সবিশেষ॥
তবে আমি মনেতে ভাবিয়া কৈলু সার।
সিকান্দরনামা সম গ্রন্থ নাহি আর॥

এরপরে সমস্ত জীবন তিনি রোসাঙ্গেই অতিবাহিত করেন। চট্টগ্রামের অবস্থান রোসাঙ্গের নিকটে বলে এবং রোসাঙ্গ রাজসভার অমাত্যদের অধিকাংশের বাসস্থান কিংবা পিতৃভূমি চট্টগ্রাম বিধায় আলাওলের কাব্যসমূহের পাণ্ডুলিপিগুলো চট্টগ্রামবাসীদের ঘরে সংরক্ষিত হতে দেখা যায়। বাংলা ভাষাভাষী চট্টগ্রামবাসীদের মুখেই আলাওলের নাম অধিকতর প্রচারিত হওয়ার কারণও চট্টগ্রামের অবস্থান রোসাঙ্গের নিকট হওয়াতে। চট্টগ্রামের অবস্থান যে রোসাঙ্গের নিকট শুধু তা নয়, মাঝে মধ্যে স্বল্প কিছুকালের বিরতি ছাড়া ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত চট্টগ্রামের একটা বৃহৎ অংশ রোসাঙ্গ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এরই ফলে চট্টগ্রামবাসীরা আজ আলাওলের পাণ্ডুলিপিগুলোর উত্তরাধিকারী রূপে গৌরববোধ করতে পারছেন।

# নীলদর্পণ পাঠের ভূমিকা

মমতাজউদ্‌দীন আহমেদ

দীনবন্ধু তাঁর পিতৃদত্ত নাম নয়—সে নাম গন্ধর্বনারায়ন মিত্র। কলুটোলা ( পরে হেয়ার স্কুল নাম হয় ) স্কুলের সতীর্থরা গন্ধর্ব-এর অপভ্রংশ "গন্ধ-গন্ধ" করে তাঁকে বিব্রত করতো, সেজন্য গন্ধর্বনারায়ণ মিত্র নাম পাল্টে দীনবন্ধু মিত্র নাম নিতে হলো, কিন্তু তাঁর প্রথম নাটক নীলদর্পণে (নীলদর্পণং/নাটকং) দীনবন্ধু নামটাও তিনি উল্লেখ করেননি। ১৮৬০ সালের একজন বাঙালী রাজকর্মচারীর পক্ষে জলে বাস করে কুমীরের সংগে বিবাদ সহজ কথা ছিল না। তবু দীনবন্ধু বিবাদচিত্রের সত্যনিষ্ঠ দর্পণ বেঁধেছিলেন। সম্ভবত মেঘনার বুকে নৌকায় নীলদর্পণ রচনারত দীনবন্ধুর মৃত্যু হলে সত্য দর্পণখানি চিরতরে হারিয়ে যেত। ভাগ্যক্রমে দীনবন্ধু আর নীলদর্পণ রক্ষা পাওয়াতে বাংলা নাটকের একটি উজ্জ্বল লক্ষণ আর রাজনৈতিক ইতিহাস সম্বলিত একটি মূল্যবান দলিল রক্ষা পেল।

১৮৬০ এর সেপ্টেম্বর মাসে ( শকাব্দ ১৭৮২, ২রা আশ্বিন ) নীলদর্পনং/নাটকং/ ঢাকার বাঙ্‌লা বাজার বাঙ্গালাযন্ত্রে রামচন্দ্র ভৌমিক কর্তৃক মুদ্রিত হয়েছিল। নীলকর-বিষধর-দংশনকাতর-প্রজানিকর/ক্ষেমঙ্করেণ কেনচিৎ পথিকেনাভি প্রণীতং নাটকটি সর্বপ্রথম অভিনীত হয়েছিল ঢাকার পূর্ববংগীয় রঙ্গভূমির উদ্যোগে ১৮৬১ সালের মে মাসের শেষে বা জুনের প্রথম দিকে। কলিকাতায় প্রথম অভিনয় তার এক বছর পরে।

নীলদর্পণ উদ্দেশ্যমূলক রচনা। অকৃত্রিম সহানভূতিশীলতা, স্বদেশ প্রীতি ও সেন্টি-মেণ্ট প্রবণতার উত্তেজনায় ঈশ্বরগুপ্তের ভাবশিষ্য দীনবন্ধু অকস্মাৎ এটি রচনা করেন। 'বৈঠকী মেজাজ' ও বিলক্ষণ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার উত্তাপ দীনবন্ধুর প্রায় সবকটি নাটকে বিদ্যমান। সধবার একাদশী, বিয়ে পাগলা বুড়ো প্রভৃতির নির্মাণে বৈঠকী

আলাপাচার যথেষ্ট, নীলদর্পণে সহানুভূতিশীলতা ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সম্পদই প্রধান। নীলদর্পণের বিষয়-পটভূমি বিস্তৃত, চরিত্রগুলোও বিচিত্র এবং স্বদেশ প্রীতির সেন্টিমেন্টে উত্তপ্ত। দীনবন্ধুর কাব্য মেজাজ আর নাট্যরসের জন্য এটি বিলক্ষণ গুরুভার। স্বদেশ প্রেমরসিক ঈশ্বরগুপ্তের ভাবরসিক শিষ্য অকস্মাৎ নীলদর্পণের মত একটি সিরিয়স রসগম্ভীর আঁটঘাট বাঁধা নাটক লিখে ভবিষ্যতে আর এমন গাঢ়তার সংগে সম্পর্ক রাখতে পারেননি। শুধু তাঁর "সুরধনী" কবিতাটি পরবর্তীকালের এমনি একটা প্রচেষ্টা মাত্র। নীলদর্পণের রাজনৈতিক ভাগ্য দীনবন্ধু আঁচ করেছিলেন—কিন্তু সেন্টিমেন্ট উত্তেজনাকে শ্রদ্ধা করতেন বলে নীলদর্পণ প্রকাশে সংকুচিত হননি। বিবেকের নির্দেশে "নীলকর-বিষধরদংশন-কাতর" নানা স্থলের পথিক সরকারী কর্মচারী দীনবন্ধু নীলদর্পণ প্রকাশ করে মহৎ সাহসের কাজ করেছিলেন। ব্রিটিশ সরকারের সংগে নীলকর-ব্যবসায়ী-ইংরেজদের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ছিল না কিন্তু পরোক্ষ সম্পর্কের আড়ালে নীলকরদের সংগে ইংরেজ রাজকর্মচারীদের ভালমন্দ স্বার্থের ঐক্য ছিল। এরা এক জাতি, ঔপনিবেশিক স্বার্থে ঐক্যমত; শুধু ব্যক্তিগত সম্পর্কে যখনই দরকষাকষি হতো তখন ব্যবসায়ী নীলকররা রাজপ্রতিনিধিদের প্রলুব্ধ করতো নানা উপঢৌকনে। প্রলুব্ধ মুগ্ধ রাজকর্মচারীরা বিবেককে বিসর্জন দিত। ইংরেজ রাজকর্মচারীরা ছ সাত মাসের সমুদ্র পথ পাড়ি দিয়ে ভারতে এসেছে। স্বজন স্বদেশের জন্য ব্যাকুলতা তাদের নীলকর স্বজনের প্রতি নির্ভরশীল করাতো—ওদের সাহচর্য তাদের প্রয়োজন ছিল। নীলকুঠির জমিদার-ব্যবসায়ীরা সপরিবারে স্বজনকে সংগ দিত আর প্রলুব্ধ বিবেক বিসর্জিত রাজপ্রতিনিধির কাছ থেকে ব্যবসায়ী সুযোগগুলো হাতিয়ে নিত। নীলকরদের মনগড়া দুঃখে রাজকর্মী সহজেই অভিভূত হতো কেননা তারা তাদের দৈহিক-আর্থিক প্রয়োজনের সুচারু তদারক করতো। এমন সুযোগ ও পৃষ্ঠপোষকতা এবং সরকারী উদারতা না থাকলে প্রায় কপর্দকশূন্য নীলকররা কালক্রমে অবিশ্বাস্য ধনপতি সামন্তপ্রভু হতে পারতোনা। নীলদর্পনে এ সবের ইংগিত ও রেখাচিত্র আছে। এমন নাটকের নাট্যকার হওয়া নিরাপদ নয়—দীনবন্ধু সে সংকোচেই নাম উল্লেখ করেন নি, কিন্তু গোপন করবার জন্য খুব সচেষ্টও বোধ হয় ছিলেন না।

•

নীলদর্পণ বাঙালী গ্রামজীবনের এমন এক অগ্নিমুহূর্তে রচিত যখন প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ নীলচাষী নীলবিরোধী সংগ্রামে শপথসংহত এবং বাঙলা সরকারের সেক্রেটারী নীলচাষীদের দুঃখ সচেতন (পাদ্রী লং-এর ব্যক্তিগত বন্ধু) সিটনকারের নেতৃত্বে (১৮৬০ সালের ৩১শে মার্চ) নীল কমিশনের কিছুটা উদার সুপারিশগুলি নীলকর দ্বারা অমান্য হয়েছে। বাঙালী জাতীয় চেতনায় তখনও ফারায়জী-সাঁওতাল-কৃষক বিদ্রোহ এবং

সিপাহী মহাবিপ্লবের স্পৃহাগুলো স্মৃতি স্বাক্ষর হয়ে আছে। এসব স্মৃতির অগ্নিকণা গুলো গ্রামবাংলাকে উত্তপ্ত ও সংহত করেছে।

কলিকাতা হিন্দু কলেজের পরিচিত ছাত্র (১৮৫০-১৮৫৫ পর্যন্ত) দীনবন্ধু অল্প বয়সে পিতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে রাজধানীতে এসেছিলেন, দারিদ্র তাকে কষ্টসহিষ্ণু করেছিল, তাঁর মেধা উচ্চ শিক্ষার আর্থিক সহায়ক হয়েছিল। জনসন সেক্সপীয়র তাঁর পাঠ্য ছিল (দীনবন্ধুর রচনায় ম্যাকবেথের প্রচুর উধৃতি লক্ষ্য করার মত)। ঈশ্বরগুপ্ত তাঁর কাব্য ও রসগুরু ছিলেন, (দীনবন্ধুর স্বভাবশিল্পী মনটার সংগে ঈশ্বরগুপ্তের মার্জিত অস্তিত্ব সর্বক্ষণ বিদ্যমান), বিদ্যাসাগর, প্যারীচাঁদ, প্যারীচরণ, রাজা রাধাকান্ত তাঁর শুভাকাংখি ছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন ব্যক্তিগত বন্ধু (দুজনের মধ্যে 'তুমি' সম্বোধন চলতো। একে অপরকে গ্রন্থ উৎসর্গ করেছেন—নবীন তপস্বিনী বঙ্কিমকে, মৃনালিনী দীনবন্ধুকে), নাটুকে রামনারায়ণের সংগে জন্মভূমির ঐক্যসূত্রে তাঁর যোগাযোগ হওয়া অসম্ভব ছিলনা। উনবিংশ শতাব্দীর নাগরিক বুদ্ধিবাদ ও যুক্তিবাদী বাঙালী নবজাগরণের বিশিষ্ট ধর্ম সমাজ সংস্কার আন্দোলনের প্রগতিবাদী ভুমিকায় দীনবন্ধুর বিশ্বাস ছিল, বিধবা বিবাহ, বহুবিবাহ-বিরোধিতায় এবং স্ত্রীশিক্ষার প্রতি দীনবন্ধুর শ্রদ্ধা ছিল। আবার ঈশ্বরগুপ্তীয় "প্রকৃত-বাঙালী" গ্রাম্য জীবনাচরণ ও মজ্জাগত সংস্কারে দীনবন্ধু সনাতনী আকাঙ্খা থেকেও সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন না। নাগরিক বুদ্ধিবাদ আর গ্রাম্য অর্বাচীনতার মধ্যে দীনবন্ধু বিরোধী সংঘাতকে উৎপন্ন করেননি বরং আশ্চর্য রকম বুঝাপড়া করে দুই-এর মধ্যে একটি 'সেতু' নির্মাণ করেছিলেন। ঈশ্বরগুপ্তের নাগরিকতায় গ্রাম্যতা প্রবল, দীনবন্ধুর গ্রাম্যতায় নাগরিকতা অধিক এই যা পার্থক্য। দুজনের রুচিতে আর মানসে যখনই প্রত্যক্ষ সমসাময়িক কাল বিসদৃশ ঠেকেছে তখনই একজন ব্যঙ্গের তীক্ষ্নতায় সরব অন্যজন হাস্যের কৌতুকে তীক্ষ্ন হয়ে উঠেছেন। দুটি জীবনাচরণের মধ্যে বিরোধকে বৃহৎ করে দেখার মন দীনবন্ধুর ছিল না, কিন্তু ব্রাহ্ম সমাজচিন্তাপুষ্ট দীনবন্ধু নাগরিক কৃত্রিমতা আর গ্রাম্য আচরণে দুর্বলতার মধ্যে হাসি মস্করার উপাদানকে সহজেই খুঁজে নিতেন। নীল দর্পণের বিষয়গুণ ও দুঃখ গাঢ়তার জন্য হাসি মস্করা সম্ভব ছিল না, কিন্তু ভবিষ্যতের নাটকগুলি বিষয় অপেক্ষা মেজাজের সমধর্মিতার জন্য দীনবন্ধুর আয়াস প্রয়াসের যত্নে ও লালিত্যে অধিক অন্তরঙ্গ বৈঠকী ও মেজাজী মনে হয়। সমসাময়িক জীবনাচরণের মধ্যে মনোমত সরস চরিত্র সন্ধান ও দুর্বলতাকে হাস্যকৌতুকের জনপ্রিয় উপাদান করতে গিয়ে দীনবন্ধু যেন এক বদ্ধতার মধ্যে আবদ্ধ—নবীন তপস্বিনী থেকে কমলেকামিনী পর্যন্ত কোন নাট্য-প্রহসনেই তাঁর বদ্ধদশা ঘুচেনি—প্রত্যক্ষতার স্কেচ অংকনে এ সবের সাময়িক স্বীকৃতি জুটেছে কিন্তু, শিল্পমুক্তির মহত্ব এদের

স্বল্প। সধবার একাদশীর সরসতা বারবার ছিটিয়েছেন তিনি কিন্তু বিষয় বিন্যাসের দুর্বলতায় ও বৈচিত্র স্বল্পতার জন্য সধবার একাদশীর গৌরব আর কোনটার নেই। কাহিনীর জড়ত্বে চরিত্রের গতিহীনতায় দীনবন্ধুর পরবর্তী সংলাপসরস নাটকগুলি মঞ্চগুণ পায়নি, পাঠোপযোগী হয়েছে মাত্র।

চৌদ্দ বছরের অবিরত নাট্য সাধনার সাতটির মধ্যে সর্বপ্রথমের নীলদর্পন বিষয়বস্তুর স্বাতন্ত্রে, চরিত্রের অবিচ্ছিন্নতায় ও সহানুভূতির গাঢ়তায় দীনবন্ধুর একক বিশিষ্ট ও স্বতন্ত্র রচনা। ইতিপূর্বের পাঁচ বছরের ভ্রাম্যমান ডাক বিভাগীয় চাকুরী জীবনের সুযোগে নিম্ন-মধ্য বঙ্গভূমির একটি সংঘর্ষময় করুণ জীবন পরিচয় ও সমসাময়িক ধ্বংসোন্মুখ আর্থিক সংকট বিশ্লেষণ দীনবন্ধুকে বিলক্ষণ ব্যথিত ও উচ্চকন্ঠ করেছিল। এ কোন ব্যক্তিগত চরিত্রের চরিত্র স্খলন ও দুর্বলতার কৌতুক নয় বা খণ্ডতার সরস উপলব্ধি নয়; এখানে ব্যক্তি তার সামগ্রিকতায়, জীবন তার নিদারুণ পরীক্ষায়, ও সমস্ত বাংলা দেশ তার অখণ্ডতায় তার কাছে পরিচিত। শহর থেকে দূরে একক সৃষ্টি পরিকল্পনায়, নির্জন মনোভূমির একাগ্রতায় একজন উৎকন্ঠিত উচ্চকন্ঠ বাঙালী কর্তৃক এটি রচিত। নীলদর্পণে বাঙালী নিজেকে দেখলো, আবেগ থরথর সেন্টি-মেন্টাল রোমাঞ্চকর দর্পণে জীবনের বিপর্যয়কে দেখামাত্র বিষাদে বিহ্বল, করুণায় সজল এবং প্রত্যক্ষতার উত্তপ্ততায় বাঙালী মাত্রই উচ্ছসিত হলো। এতদিন যে বিপর্যয়ের সংবাদগুলি হরিশ মুখোপাধ্যায়ের হিন্দুপেট্রিয়ট, আলালের ঘরের দুলাল, অক্ষয়দত্তের তত্ত্ববোধিনীতে পাঠ করে খণ্ড খণ্ড আবেগ সঞ্চার করতো সেগুলি এখন পরিপূর্ণতার রূপসজ্জায় পেয়ে পাঠক বা দর্শককে উচ্ছ্বসিত এবং ভাবপ্লাবী করলো। জীবনের এমন প্রত্যক্ষতা, পরিবেশের এমন স্পষ্টতা, বেদনার এমন ঘনআত্মীয়তা লাভ করে ভুক্তভোগী বাঙালী ও আত্মরক্ষা সচেতন বুদ্ধিজীবী বাঙালী মাত্রই নীলদর্পণকে মুহূর্তে বেদনার ও বিদ্রোহের সংগী করে নিলো। যমুনা বেষ্টিত চৌবেড়িয়ার কালাচাঁদ মিত্রের অন্যতম পুত্র গন্ধর্বনারায়ণ মিত্র দীনবন্ধু মিত্র নামে সত্যিই যেন দীন-বন্ধু হয়ে গেলেন। সংবাদ প্রভাকর-সাধুরঞ্জন পত্রিকার জামাই ষষ্ঠীর স্বল্পখ্যাত সরস কবি দীনবন্ধু প্রথম নাট্য প্রচেষ্টায় বিশিষ্ট এবং আলোচিত নাট্যকার হয়ে উঠলেন। সংস্কৃত কলেজের ছাত্রপ্রিয় বিশিষ্ট বাগ্মী অধ্যাপক-নাট্যকার রামনারায়ণ তর্করত্নের পুরস্কৃত কুলীনকুল-সর্ব্বস্ব, রাজা জমিদারদের দশহাজার টাকা ব্যয়ে প্রযোজিত সৌখীন রঙ্গমঞ্চে অভিনীত মধুসূদনের শর্মিষ্ঠা, কেশব সেন পরিচালিত উমাচরণের বিধবাবিবাহনাটক অপেক্ষা দীনবন্ধুর নীলদর্পণ অধিক আগ্রহ ও আবেগ সঞ্চার করলো। কলিকাতা নগরীর সামন্ত-সৌখীন রংগমঞ্চের সংগে যোগাযোগ বঞ্চিত, নাট্যরচনার পূর্ব অভিজ্ঞতাশূন্য দীনবন্ধু অচিরাৎ বাংলা নাট্য প্রযোজনাকে ঘেরাটোপ পৃষ্ঠপোষকতার সংকীর্ণ সৌখীন

..গান কোঠার সীমাবদ্ধতা থেকে একবারেই জনারণ্যের তেমাথায় উন্মুক্ত ক্ষেত্রে উপস্থিত করলেন।

তখনও ইউরোপীয় নাট্যরীতি প্রক্রিয়াগুলো বাংলার নাট্যকলায় সমুচিত অনুশীলিত নয়; সংস্কৃত নাটকের প্রস্তাবনা রীতি, রোমাঞ্চকর অপ্রাকৃত ঘটনা ও মিলনাত্মক পরিণতির যান্ত্রিক অনুবাদ মগ্নতা, সেক্সপীয়রের স্কুলপাঠ্য দুর্বল অনুবাদ ব্যস্ততার সেই শিক্ষানবিশী-কালে—মধুসূদনের মৌলিক প্রতিভার সামান্য মনোযোগ মাত্র বাংলা নাটক পেয়েছে; রামনারায়ণ যদিচ মৌলিক কিন্তু তার নাট্যসাধনা ইউরোপীয় রীতি দ্বারা উদ্বুদ্ধ নয়—এমতাবস্থায় দীনবন্ধুর নীলদর্পণের প্রত্যক্ষ জীবনসম্পদ উপাদানগুণের অপ্রতিরোধনীয় জনপ্রিয়তা বাংলা নাট্য উপাদানকে ক্রমাগতই প্রত্যক্ষ পারিপার্শিকতার দিকে, গৃহের সরস মাধুর্যের দিকে, নব জীবনাচরণের বিপন্ন কৌতুকের দিকে প্রবল ভাবে তাড়িত করলো। নীলদর্পণের বিশিষ্টতা এবং অভাবনীয় আগ্রহ সম্পর্কে দীনবন্ধু বোধকরি এত সচেতন ছিলেন না। চাকুরী জীবনের সুযোগে ,নীলকর-নীলচাষীদের প্রত্যক্ষ পরিচিতি এবং গ্রামীন অর্থনীতির একটি মোটামুটি ধারণার ফলে নির্জন প্রবাসে অকস্মাৎ যে নাটক তিনি লিখলেন তার বিষয়-চরিত্র-সংলাপ সকলই বাংলা নাট্যশিল্পের জন্য অভিনব। গ্রামীন লৌকিক প্রতিবেশে, সহানুভূতির উত্তাপে এবং প্রত্যক্ষতার সরল নিবিড়তার গুণে নাটকটির কলাকৌশল ও আঙ্গিক শৈথিল্য যতই থাকুকনা কেন, জীবনকে এত পূর্ণতার মধ্যে, দেশকে এত নিকট থেকে আর বোধ হয় আগে দেখা হয়নি।

দর্পণ খানিতে গ্রামীন বাংলার অবিকল ছবি ফুটে উঠলো। নিপীড়নের স্বচ্ছ ছবির মধ্যে বাংলা দেশের মুখ দেখা গেল। বিদেশী নীলকরের লোলুপ অত্যাচারী আচরণগুলি বিশ্বাস্য সংবাদের মত জ্বলজ্বল করে উঠলো। এতদিন বুদ্ধিজীবী 'কলিকাতা-বাবুভেয়েরা' নীলকর নিপীড়নের যে সংবাদ তত্ত্ববোধিনী, আলালের ঘরের দুলাল, হিন্দু পেট্রিয়টে পাঠ করে ক্ষণিকের জন্য কৌতুহলী হতো তারই অবিকল চিত্র দেখে সংবাদের সত্যতায় নিঃসন্দেহ হলো।

কিন্তু সর্বাপেক্ষা উত্তেজিত হলো নীলকর ব্যবসায়ীরা। বিষয়ের সত্যতা অস্বীকার করা তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না, কিন্তু সেজন্য তারা যত না সন্ত্রস্ত হয়েছিল, তার চেয়ে বেশী উত্তেজিত হয়েছিল নীলদর্পণের ইংরেজী অনুবাদে এবং সেই অনুদিত গ্রন্থখানি বিলেতে প্রেরণের ফলে। এদেশীয় ইংরেজ রাজকর্মচারীদের সহযোগিতা লাভের উপায় তাদের জানা ছিল, কিন্তু স্বদেশের ইংরেজ সরকারের সংগে তারা যে

ব্যবসায়ী লাভ লোকসানের ফাঁকিবাজি করছিল তার তথ্য সন্ধান হলে তাদের পায়ের নীচের মাটি চিরতরে সরে যাবে এ ভয় তাদের অমূলক ছিল না। নীলদর্পণ সজ্জন ইংরেজ রাজকর্মচারীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল, গোপণ পৃষ্ঠপোষকতাও পেয়েছিল, কিন্তু জমিদার-ব্যবসায়ী-নীলকরদেরকে বিষধর সদৃশ দংশন ক্ষিপ্ত করেছিল।

নীলদর্পণের কোন ঘটনা কোন চরিত্রই দীনবন্ধুর কৃত্রিম সৃজন নয়, শুধু বিন্যাসটুকু তাঁর।

সে সময়ের (ক) নদীয়ার গুয়াতেলির মিত্র পরিবার
(খ) চৌগাছার বিষ্ণুচরণ ও দিগম্বর
বাঁশ বেড়িয়ার বিশ্বনাথ
(গ) আচিবল্ড হিল্‌স্ কর্তৃক নদীয়ার-মাথুর বিশ্বাসের পুত্রবধূ হরমনি অপহরণ (১২ই ফেব্রুয়ারী ১৮৫৯)
(ঘ) ঝিনাইদহের নীলকর দেওয়ান মহেশ চট্টোপাধ্যায়
(ঙ) নদীয়া যশোহরের জমির মণ্ডল, হাজিমোল্লা, পাঞ্জুমোল্লা প্রভৃতি কৃষক
(চ) মোল্লাহাটি নীলকুঠির নীলকর লারমুর, আচিবল্ড হিল্‌স্, ফারলং
(ছ) পাদ্রী ডাফ ও পাদ্রী বমভাইটস
(জ) নদীয়ার অস্থায়ী ম্যাজিস্ট্রেট ডবলিউ, জে, হার্সেল (১৮৫৯-এর ২৮শে ফেব্রুয়ারী থেকে)
(ঝ) যশোহরের পুলিশ ইন্সপেক্টর গিরিশচন্দ্র বসু

প্রভৃতি প্রত্যক্ষ ব্যক্তিসমূহ নীলদর্পণের:

(ক) স্বরপুর গ্রামের গোলোকবসু পরিবার
(খ) নবীনমাধব, বিন্দুমাধব,
(গ) রোগ কর্তৃক ক্ষেত্রমণি অপহরণ
(ঘ) গোপীনাথ
(ঙ) তোরাপ ও অন্যান্য রায়ত, সাধুচরণ রায়চরণ
(চ) আই. আই. উড, পি. পি. রোগ—বেগুন বেড়ে কুঠির নীলকর
(ছ) ইন্দ্রাবাদ জেলখানা দৃশ্যে (চতুর্থ অঙ্ক/৩য় গর্ভাঙ্ক) উল্লেখিত পাদ্রী
(জ) ইন্দ্রাবাদ অমরনগরের প্রাক্তন সজ্জন ম্যাজিস্ট্রেট বলে উল্লেখিত।
(ঝ) জেল দারোগা

প্রভৃতি চরিত্রে রূপান্তরিত হয়েছে। এ ছাড়া বাংলা গভর্নর জি. পি. গ্রান্ট ও সেক্রেটারী সিটনকারের পরোক্ষ উল্লেখ আছে কাহিনীতে। ঢাকায় প্রকাশিত বাংলা নীলদর্পণ ইংরেজীতে অনুদিত হয় ১৮৬১ সালে, জুন মাসের ১৯ তারিখের আগে। ইংরেজী

"ইণ্ডিগো প্ল্যান্টিং মিরর"-এর মুদ্রক ছিলেন সি.এইচ. ম্যানুয়েল। কলিকাতা ওয়েলেসলি ষ্ট্রীটের প্রিণ্টিং এ্যাণ্ড পাবলিশিং প্রেস থেকে প্রকাশিত এই ইংরেজী নীলদর্পণের পাঁচশো কপির ব্যয়ভার বহন করেছিল স্বয়ং বাংলা সরকার। অনুবাদকার্য পরিচালনা ও পরিদর্শনা করেছিলেন বাংলা সরকারের সেক্রেটারী মিঃ সিটনকার এবং তাঁর বন্ধুপ্রতিম রেভারেণ্ড জেমস্ লং। তখন বাংলার ছোটলাট জি. পি. গ্র্যাণ্ট। সরকারী শীলকভারে "ইণ্ডিগো প্ল্যান্টিং মিরর" বিলেতের যেসব বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কাছে পাঠানো হয়েছিল—গ্ল্যাডষ্টোন, রিচার্ড কবডেন, জন ব্রাইট প্রমুখ তাঁদের অন্যতম। ১৮৬২ সালে লণ্ডনের বিখ্যাত প্রকাশক সিম্পকিন মার্শাল কোম্পানী নীলদর্পণের ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করেন। প্রখ্যাত চার্লস ডিকেন্স (১৮১২-৭০) এটি পড়ে তাঁর "অল দি ইয়ার রাউণ্ড" পত্রিকায় নাটকটির বিস্তর প্রশংসা করেন। যদিচ পাদ্রী লং-এর মতে বাংলা নীলদর্পণের অনুবাদকালে স্থূল অংশগুলো বাদ দেওয়া হয়েছিল অথবা পরিবর্তন করে অপেক্ষাকৃত মার্জিত করা হয়েছিল তবুও নীলদর্পণে নিজেদের আচরণ ও মত্ততার অবিকল ছবি দেখে এবং ১৭৭৯ সাল থেকে ১৮৬০ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন আইনের সুযোগে কায়েমী-স্বার্থ-নিশ্চিন্ত নীলকর ব্যবসায়ীদের বাঙালী কৃষকদের নিংড়ানো রক্তে সিক্ত অর্থের সিন্দুক ভয়ে উত্তেজনায় ও হলাহল দংশন ক্ষিপ্ততায় থরথর করে কেঁপে উঠেছিল। ক্ষিপ্ত নীলকররা ইংরেজী ভাষায় অনূদিত নীলদর্পণের বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করলেন আলিপুর কোর্টে। বেথুনের সুপারিশে তখন ব্ল্যাকঅ্যাক্ট আইন পাশ হওয়ার ফলে দেওয়ানী মামলা করার সুযোগ ছিল না। বাদী হলেন ইংরেজদের জমিদার-ব্যবসায়ী সংঘ The land holders and Commercial Association of British India. এটি সংগঠিত হয় ১৮৭৩ সালে। বাদী পক্ষে হলেন ইংলিশম্যান পত্রিকার সম্পাদক ওয়াল্টারব্রেট এবং হরকরার সম্পাদক ফোরবস। ওয়াল্টারব্রেট প্রতিবছর নীলকরদের পক্ষ থেকে এক হাজার টাকা নজরানা পেতেন, আর ফোরবস জমিদার-ব্যবসায়ী সংঘের সম্পাদক ছিলেন এবং মাত্র দেড় বছর আগে নিজেই নীলকর ছিলেন। ইতিপূর্বে কলিকাতা সুপ্রীম কোর্টের বিচারে "ইণ্ডিগো প্ল্যান্টিং মিরর" মুদ্রকের দশটাকা জরিমানা হয়েছিল। পাদ্রী লং-এর অনুমতিতেই মুদ্রাকর ম্যানুয়েল গ্রন্থখানির প্রকাশকের নাম বিচারকক্ষে প্রকাশ করেছিলেন। বলাবাহুল্য ম্যানুয়েল পাদ্রী লং-এর নাম বলেছিলেন। সুপ্রীম কোর্টের বিচারের পরেই "দি ইণ্ডিগো প্ল্যান্টিং মিররের" বিরুদ্ধে মানহানির মামলা দায়ের করা হয়।

মানহানি মামলার বিচারপতি ছিলেন স্যরভাণ্ট ওয়েলস। সতেরজন জুরীর মধ্যে ষোলজন বিদেশী, মাত্র মানিকজী রুস্তমজী ভারতীয়। নীলকর-জমিদার-ব্যবসায়ীদের পক্ষে কৌঁশলী পিটারসন ও কাউই।

পাদ্রী জেমস লং-এর পক্ষের কৌশলী ছিলেন এগলিংটন ও নিউমার্চ। নীলদর্পনের বিরুদ্ধে মানহানির কারণটা কি?

বিশেষতঃ নাটকটির দুটি অংশ:
(১) ভূমিকায় নাট্যকার লিখেছেন: রজতের কি আশ্চর্য আকর্ষণ শক্তি! ত্রিংশৎ মুদ্রালোভে অবজ্ঞাস্পদ জুডাস, খৃষ্ট ধর্মপ্রচারক মহাত্মা যীশুকে করাল পাইলেট করে অর্পণ করিয়াছিল; সম্পাদকযুগল সহস্র মুদ্রালাভ পরবশ হইয়া উপায়হীন দীন প্রজাগণকে তোমাদের করাল কবলে নিক্ষেপ করিবে আশ্চর্য কি?—
এই উক্তিটি ইংলিশম্যান ও হরকরার সম্পাদকযুগলকে রীতিমত অপমান করেছিল বলে ব্রেট-ফোরবসদ্বয়ের উত্তপ্ত হওয়া।
(২) নাটকটির চতুর্থ অঙ্ক/তৃতীয় গর্ভাঙ্কের প্রথমাংশের সংলাপ:

দারোগা ॥ বিন্দুমাধবকে কে ডাকিতে গিয়াছে?
জমাদার ॥ মনিরুদ্দি গিয়াছে। ডাক্তার সাহেব না এলে তো নাবান হইতে পারেনা।
দারোগা ॥ ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের আজ আসিবার কথা আছে না?
জমাদার ॥ আজ্ঞে না, তাঁর চারদিন দেরী হবে। শনিবারে শচীগঞ্জের কুটিতে সাহেবদের সাম্পিন পার্টি আছে, বিবিদের নাচ হবে। উড সাহেবের বিবি আমাদিগের সাহেবের সঙ্গে নইলে নাচিতে পারেন না, আমি যখন আরদালি ছিলাম দেখিয়াছি। উড সাহেবের বিবির খুব দয়া, একখান চিঠিতে এ গোরিবকে জেলের জমাদ্দার করিয়া দিয়াছেন।

১৮৬১ সালের ১৯, ২০ ও ২৪শে জুলাই মামলার শুনানী চলেছিল। ২৪শে জুলাই রায় দেন বিচারপতি মরড্যাণ্ট ওয়েলস।

লং-এর বিরুদ্ধে এ মামলায় ইংরেজদের অভিযোগ —"ইউরোপীয় হয়েও লং একজন Propagator of a slander of a most dangerous type. লং মহৎ ইংরেজদের Stabbed in the back, যে ছুরি এই ভয়ংকর লং শানিয়েছে অন্ধকারে বসে। তার মুদ্রিত নাটকটি ইংরেজদের পশুর চেয়েও অধম স্তরে নামিয়ে এনেছে আর তাদের মহান স্বদেশকে লোকের চক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করেছে।" কৌশলী পিটারসন (বাদীপক্ষের) আরো বল্লেন: ইংরেজ রাজত্ব আর ইংরেজ কর্মচারীদের অবস্থা এমনিতেই সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর অবস্থার মধ্যে হাঁস ফাঁস করছে। সিপাহী বিদ্রোহের ফলে তাদের অবস্থা এখন বড়ই বিপজ্জনক, এমতাবস্থায় পাদ্রী লং এসব যাচ্ছেতাই করে কিছুতেই রেহাই পেতে পারে না।

পাদ্রী লং পক্ষের কৌশলী এগলিংটন বললেন: যদি নীলদর্পণের বিরুদ্ধে মানহানির মামলা হয় তবে পৃথিবীর পুরাতন ও নতুন উৎকৃষ্ট সাহিত্য নিদর্শনগুলি নিষিদ্ধ করে দেওয়া হোক। মলিয়রের সাহিত্য পড়ুন ধর্মযাজক আর চিকিৎসকদের নিয়ে কি রকম বিষাক্ত বিদ্রূপ করেছেন নাট্যকার। ডিকেন্সের 'ওলিভারটুইষ্ট-এ কি আছে? ছোট ছোট ছেলেদেরকে দিয়ে অবৈধভাবে যে সমস্ত মর্মান্তিক কাজ করানো হয়— সেগুলির দিকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া আর সেই ওয়ার্কহাউসের জঘন্য ব্যবসা রহিত করা নয় কি? তাঁরই 'নিকোলাস-নিকোলবী' লেখা হয়েছিল ইয়র্কশায়ার স্কুলগুলোর আভ্যন্তরীণ নোংড়ামিকে নিন্দা করবার জন্য এবং তাকে চিরতরে নিশ্চিহ্ন করবার জন্য—তাই বলে কি লেখক চার্লস ডিকেন্সের বিরুদ্ধে কোন আইনগত বিচার দাবী করা হয়েছে?

এগলিংটন আরো বলেছিলেন: এটা মানহানির মামলা নয়। এর আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে অন্য কিছু। আমি তো দেখতে পাচ্ছি নীলদর্পণ লেখা হয়েছে বলে নীলকররা মোটেই বিষণ্ণ হয়নি—They looked very cheerful and not all like men Suffering from the sting of injurious calumnies. I do not think that there was a single planter who cared one farthing about the publication of Nildarpan. I belive that there was another motive for the prosecution, and not one alleged............if the planters had really felt themselve hurt, they would long ago have taken proceedings against the publishers of the native copies printed. If any copies did harm, surely they were the native ones.

কিন্তু বিচারকক্ষের সভাপতি ওয়েলস সাহেব স্বয়ং জুরিদের বুঝালেন:
নাটকটিতে সেই দৃশ্যটি বড়ই জঘন্য। এদেশের ইংরেজ-জুরি, রাজকর্মচারী, সৈন্য আর ব্যবসায়ীরা ইংলণ্ডের মধ্যবিত্ত ঘরের সন্তান। আর তাদেরি কন্যাদের নিয়ে কী ন্যক্কারজনক চিত্র আঁকা হয়েছে। অথচ এসব হতভাগিনী মহিলারা ওদের স্বামীর সঙ্গে সোনার ইংলণ্ড ছেড়ে এই অজপাড়াগাঁয়ে বাস করতে এসেছে, এরা কত দুঃখ কত কষ্টের মধ্যেই না দিন কাটাচ্ছে। আর এইসব মহিলাদের নিয়ে এসব কী লেখা হয়েছে দেখুন দেখি।

বিচারের রায় বেরুলো। "The least Judicial of all the Judges of the Supreme Court" বিচারপতি মরড্যাণ্ট ওয়েলসের বিচারে পাদ্রী জেমস্ লং দোষী। —এক হাজার টাকা জরিমানা আর এক মাসের কারাগার। রুশদেশে জন্ম ইউরোপীয়

সন্তান মানবতাবাদী মনীষী এবং ভারতীয় সমাজবিজ্ঞানের উৎসাহী সংগ্রাহক, বহুগ্রন্থ-প্রণেতা, বাংলা ভাষায় পারদর্শী পাদ্রী জেমস্ লং স্থির অকম্পিত সাহসের সঙ্গে বিচারের রায় শুনলেন, মুখে স্মিতহাসি টেনে বল্‌লেন: **What I have done now, I will do again.** কালী প্রসন্ন সিংহ জরিমানার একহাজার টাকা আদালত কক্ষেই শোধ করে দিলেন। রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ (মধুসূদনের নাটকের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক) পাদ্রী লং-এর কৌশলীর ব্যয় বহন করলেন।

নীলদর্পণ মামলার প্রতিক্রিয়া হলো সুদূর প্রসারী:

(ক) ইংলণ্ডে ইংরেজী ভাষায় নীলদর্পণ মুদ্রিত হলো।

(খ) ইংলণ্ডের বিশিষ্ট সংবাদপত্রসমূহ (ডেইলী নিউজ, স্পেকটেটর, স্যাটারডে রিভিউ, লণ্ডন রিভিউ, ফ্রেণ্ডস অফ ইণ্ডিয়া প্রভৃতি) বিচারপতি ওয়েলসের তীব্র নিন্দা করলো।

(গ) রাজা রাধাকান্তদেবের নেতৃত্বে কুড়িহাজার ব্যক্তির স্বাক্ষরিত প্রতিবাদপত্র গেল বড়লাটের কাছে।

(ঘ) বাংলা সরকারের সেক্রেটারী সিটনকার ১৮৬১ সালের ৮ই অগাষ্টে পদত্যাগ করলেন।

(ঙ) ফোরবসের হরকরা কাগজ গভর্ণর গ্র্যাণ্টের উদ্দেশ্যে ছড়া লিখলো:

Governor Grant is a terrible man
As he reigns in Alipore Hall
A Compound of Chenges and kublai khan
Temberlain Nadir and all.

১৯৬২ সালে নীলচাষীসহানুভূতিশীল বাংলার গভর্ণর গ্র্যাণ্ট পদত্যাগ করে ভারতছেড়ে চলে গেলেন।

(চ) এদেশের স্বভাব কবি আর গায়েনদের কণ্ঠে 'নীলদর্পণ-বিচার' ছড়ায়গানে সর্বজন জ্ঞাত হলো।

(১) নীলবানরে সোনার বাংলা কল্লে এবার ছারেখার
অসময়ে হরিশ মলো লংয়ের হলো কারাগার
প্রজার আর প্রাণ বাঁচানো ভার।..... (বিদ্যাভূনী-কৃত)

(২) নিদারুণ সেন্‌টেনস্ শুনে সিংহবাবু দয়াগুণে
হাজারটাকা দিলেন গুণে, ওয়ালটারগ্রেট তাই তাক হয়েছে।
মহারাণী তোমা প্রতি এক্ষণে এই মিনতি
ওয়েলস্ পাপে দাও মুকতি খিরাজ এই বলিতেছে।। (ধীরাজ-কৃত)

(ছ) নীলদর্পণ-এর নাট্যকার দীনবন্ধুমিত্র প্রথম নাট্যরচনাতেই সর্বজনস্বীকৃত এবং জনপ্রিয় হয়ে গেলেন।

নীলদর্পণ মানহানি মামলায় নীলকর জমিদার ব্যবসায়ী সংঘের জয় হলো বটে কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার নীলদর্পনের প্রকাশনা বা মঞ্চরূপায়ন কোনটিই বেআইনী ঘোষিত হলো না। কালীপ্রসন্ন সিংহ নিজ ব্যয়ে (১৮৬২ সালে) নীলদর্পণের দ্বিতীয় সংস্করণের সমস্ত কপি বিলি করলেন এবং শহর কলিকাতায় সৌখীন রঙ্গমঞ্চে নীলদর্পণ মঞ্চস্থ হলো। এ ঘটনার প্রায় অর্ধশতাব্দীকাল পরে ১৯০৮ সালে নীলদর্পণ বাজেয়াপ্ত করলেন বাংলা সরকার। ১৯০৮ সালে যে সময় যুগান্তর দলের ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকী প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডকে হত্যা করতে গিয়ে ভুলক্রমে কেনেডী দম্পতিকে হত্যা করেছিলেন সে সময় ছিল ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের এক বিশিষ্ট পর্যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে ১৮৭২ সালের ৭ই ডিসেম্বর শনিবার জাতীয় রঙ্গমঞ্চে (কলিকাতা ন্যাশনেল থিয়েট্রিকাল সোসাইটি — পরে নাম হয় ন্যাশনাল থিয়েটার) একটাকা এবং আটআনা প্রবেশপত্রের বিনিময়ে জনসাধারণের জন্য শ্রীধর্মদাস শূরের মঞ্চ-পরিচালনায় নীলদর্পণ অভিনীত হয়। ২১শে ডিসেম্বর দ্বিতীয় রজনী অভিনয়ের একদিন আগে ২০শে ডিসেম্বর প্রাগুক্ত ইংলিশম্যান পত্রিকায় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে লেখা হয়েছিল: The play of Nildarpan is shortly to be acted at the National theatre in Joransako, Considering that the Rev. Mr. Long was sentenced to one month's imprisonment for translating the play, which was Pronounced by the Highcourt a libel on Europeans, it seems strange that Government should allow its representation in Calcutta, unless it has gone through the hands of some Competent Censor, and the libellous parts been excised. ইংলিশম্যান পত্রিকার এ উস্কানীতে বাংলা সরকারের দপ্তরে সেরকম কোন প্রতিক্রিয়া হয়নি—কিন্তু উত্তরে নাট্যশালার সেক্রেটারী ২৩শে ডিসেম্বর তারিখে ইংলিশম্যান পত্রিকায় লিখেছিলেন: "নীলদর্পণ নাটকের মানহানিকর অংশ বাদ দেওয়া হইয়াছে। নীলদর্পণ নাটক অভিনয়ের উদ্দেশ্য বাংলা দেশের গ্রাম্যজীবনযাত্রার চিত্র দেখান, —ইংরেজদিগকে বিদ্রূপ করা নয়। ইংরেজ চরিত্রের প্রতি আমাদের যথেষ্ট শ্রদ্ধা আছে।"

নীলদর্পণ অভিনয় দেখবার জন্য প্রচুর জনসমাগম হয়েছিল। অনেকেই বসবার জায়গা পাননি, অনেকেই ফিরে গেছেন; সেদিন রজনারায়ণবসু (একাল সেকাল) এসেছিলেন। পুলিশের ডেপুটি কমিশনারও দর্শক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু অভিনয় কলা,

মঞ্চনির্দেশনা, আবহসংগীত, উপযুক্ত আলোর ব্যবস্থা প্রভৃতি কয়েকটি বিষয়ে সাধারণ সমালোচনা বা উন্নতিকল্পে প্রস্তাব ব্যতীত নীলদর্পণ নাটকটির বিষয়বস্তু সম্পর্কে তৎকালীন পত্রপত্রিকা কোনরূপ আপত্তি করেনি। একমাত্র ইণ্ডিয়ান মিরার পত্রিকায় (১৮৭২ সালের ২০শে ডিসেম্বর সংখ্যায়) একটি উদ্দেশ্য প্রণোদিত চিঠিতে নীলদর্পণ নাটকটির প্রযোজনা, অভিনয় এমনকি নাট্যকারকে নিন্দা কটূক্তি করা হয়েছে। এ পত্রলেখক স্বয়ং গিরিশচন্দ্র ঘোষ। ন্যাশনাল থিয়েটারের সংগে তাঁর ব্যক্তিগত সম্পর্ক বিচ্ছেদের ঈর্ষা-জ্বালায় গিরিশঘোষ চিঠিখানি লিখেছিলেন।

নীলদর্পণকে কেন্দ্র করে উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্য রঙ্গমঞ্চে ও জাতীয় চেতনায় বিশিষ্ট প্রভাব লক্ষ্য করা গেছে। 'দর্পণ' নামটির প্রভাব ও মোহে অনেকেই আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তথ্য ও সমসাময়িকতা বা লোকায়ত উপাদানকে সাহিত্য বিষয় করবার জন্য 'দর্পণ' নামকরণের বহুলতা সে সময় কম ছিল না। নীলদর্পণের সংগে দুজন বিশিষ্ট মনীষীর নাম প্রায় উল্লেখ করা হয়েছে। ইংরেজী অনুবাদের জন্য কবি মধুসূদনের নাম এবং মঞ্চাভিনয়ের ঘটনার সংগে বিদ্যাসাগরের নাম নীলদর্পণের সংগে অঙ্গীভূত হয়ে গেছে।

একরাত্রি অভিনয় দর্শনকালে রোগ কর্তৃক ক্ষেত্রমণির উপর পাশবিক নির্যাতনে বিদ্যাসাগর এতই উত্তেজিত হয়েছিলেন যে রোগের চরিত্রাভিনেতা নট অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তাফীকে তিনি স্বীয় পাদুকা নিক্ষেপ করেছিলেন। মুস্তাফী সাহেব সে পাদুকাকে বিজয়মাল্য হিসাবে গ্রহণ করে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছিলেন। ঘটনাটির সত্যতা সম্পর্কে আমরা মোটেই নিঃসন্দেহ নই। কেননা :

(ক) সে সময়ের পত্র-পত্রিকাতে এতখানি উজ্জ্বল ঘটনাটির কোন উল্লেখ নেই।

(খ) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর আদৌ নীলদর্পণ অভিনয় দেখেছিলেন কিনা তার প্রমাণ নেই।

(গ) রোগের ভূমিকায় নট অর্দ্ধেন্দু শেখর মুস্তাফী আদৌ অভিনয় করেননি। মুস্তাফী সাহেব চারটি ভূমিকায় অভিনয় করতেন—উডসাহেব, সাবিত্রী, গোলোকবসু এবং একজন চাষা-রায়ত। কিন্তু রোগ সাহেবের ভূমিকা অভিনয় করতেন নট অবিনাশ চন্দ্রকর। তাঁর রোগ সাহেবের ভূমিকায় অভিনয় সম্পর্কে অমৃতলালবসু বলেছেন—এই একটি পার্ট সে (অবিনাশকর) প্লে করিল; তেমনটি আর কেহ পারিল না। আমিও রোগ্ সাহেবের পার্ট প্লে করিয়াছি (অমৃতলাল বসু সাধারণতঃ সৈরিন্ধ্রীর ভূমিকায় অভিনয় করতেন) কিন্তু অবিনাশের মত হয় নাই।

নটী বিনোদিনী তাঁর 'আমার অভিনেত্রী জীবন' শীর্ষক প্রবন্ধে (১৩৩১, রূপরঙ্গ) লিখেছেন :

"স্থির করা হ'ল 'নীলদর্পণ' অভিনয় করতে হবে (১৮৭৫ মার্চ/এপ্রিল মাসে যখন লক্ষ্ণৌতে গ্রেট ন্যাশানাল থিয়েটার পশ্চিমে অভিনয় প্রদর্শনের জন্য যায়)। তখন এ নাটকখানির অভিনয় সবচেয়ে সুন্দর হ'ত, সব চেয়ে জম্‌ত। সে নাটকখানি অভিনয় করবার সময় সকলের কি আগ্রহ, কি উত্তেজনা!..........উড সাহেব অর্দ্ধেন্দুবাবু, তোরাপ মতিলাল সুর আর রোগ সাহেব সাজতেন অবিনাশ কর। অবিনাশবাবু দেখতে সুন্দর ছিলেন, তার উপর তাঁর স্বভাবটা ছিল একটু কাট্‌কাট্‌ মারমার গোঁয়ার গোবিন্দ গোছের, তাই নীলকুঠির সেই নির্দ্দয় স্বেচ্ছাচার সাহেব সাজলে তাঁকে ভারি সুন্দর মানাত। দেখলেই মনে হত, হ্যাঁ সত্যিকারের রোগ সাহেব। আর মানাত উড সাহেবের ভূমিকায় মুস্তফি সাহেবকে---আড়ে বহরে লম্বায় চওড়ায় দশাসই চেহারা। তারপর মতিলাল সুরের তোরাপ, সে তোরাপ আর হলোনা।......পশ্চিমে আরও ক'জায়গায় নীলদর্পণের অভিনয় হয়েছিল, কিন্তু লক্ষ্ণৌয়ের এই ঘেরা বাড়িতে যেমন জমেছিল, এমনটি আর কোথাও জমে নাই।.........অভিনয় আরম্ভ হ'ল।........ক্রমে ক্রমে সেই দৃশ্যটা এল, রোগ সাহেব ক্ষেত্রমণিকে ধরে পীড়ন করছে, আর ক্ষেত্রমণি নিজের ধর্মরক্ষার জন্যে কাতরপ্রাণে চীৎকার করে বলছে, "ও সাহেব, তুমি আমার বাবা, মুই তোর মেয়ে, ছেড়ে দে আমায় ছেড়ে দে।" তারপর তোরাপ এসে রোগ সাহেবের গলা টিপে ধরে গুঁতো দিয়ে কিল মারতে আরম্ভ করেছে,---অমনই সাহেব দর্শকদের মধ্যে হৈ চৈ পড়ে গেল। সব সাহেবেরা উঠে দাঁড়ালো, পিছন থেকে সবলোক ছুটে এসে ফুটলাইটের কাছে জমা হ'তে লাগল —সে একটা কাণ্ড। কতকগুলো লাল মুখো গোরা তরওয়াল খুলে ষ্টেজের ওপর লাফিয়ে পড়তে এল। আর পাঁচজনে তাদের ধরে রাখতে পারে না। সে কি হুড়োহুড়ি, কি ছুটোছুটি। ড্রপ তো তখনই ফেলে দেওয়া হলো---আর আমাদের সে কি কাঁপুনি, আর কান্না। ভাবলাম, আর রক্ষে নাই, এইবার ঠিক আমাদের কেটে ফেলবে"।---

নটী বিনোদিনীর আত্মবিবরণীতেও রোগের ভূমিকায় অবিনাশ করের নাম পাওয়া গেল। এবং অবিনাশ করের অভিনয় প্রশস্তি ও দীর্ঘ। ক্ষেত্রমণি-রোগ দৃশ্যটি (তৃতীয় অঙ্ক/তৃতীয় গর্ভাঙ্ক) নীলদর্পণ নাটকের (মোহিতলাল মজুমদারের মতে) অগ্নিময়ী এবং সে পরীক্ষায় দীনবন্ধু অত্যন্ত কৃতিত্বের সংগে উত্তীর্ণ হয়েছেন। এমন রোমাঞ্চকর ও শিহরণমূলক দৃশ্যটির সংগে 'বিদ্যাসাগর-কিংবদন্তী'র যোগাযোগ এখনও অবিশ্বাস্য বা অনাদৃত নয়। কিন্তু ঘটনাটির উদ্ভাবনা যে পরবর্তীকালের কল্পনা প্রসূত একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

মধুসূদন নীল দর্পণের অনুবাদক কিনা সে বিষয়েও আমরা নিঃসন্দেহ নই। কেননা :-

(ক) মধুসূদনের পত্রাবলীর মধ্যে বা তাঁকে লেখা বিভিন্নজনের পত্রাবলীর মধ্যে এ অনুবাদ কর্মের কোন উল্লেখ নেই। যদিও মধুসূদন রত্নাবলী এবং শর্মিষ্ঠা নাটক দুটি ইংরেজী অনুবাদ করেছিলেন,---বিভিন্ন প্রসংগে তার উল্লেখও আছে।

(খ) ১৮৬১ সালের মে-জুনমাসে (নীলদর্পণের অনুবাদের সময়) মধুসূধন মেঘনাদবধ কাব্য রচনায় বিশেষভাবে ব্যাপ্ত ও মগ্ন ছিলেন; এসময় নীলদর্পণ অনুবাদে স্বীকৃত হওয়া স্বাভাবিক মনে হয় না।

(গ) দীনবন্ধু মিত্রের সংগে সে সময় মধুসূদনের কোন যোগাযোগ থাকার সম্ভাবনা অতি সামান্য। দীনবন্ধু তখন কলিকাতার বাইরে ছিলেন।

(ঘ) বেলগাছিয়া রঙ্গমঞ্চের কর্তাব্যক্তিদের ব্যবহারে মধুসূদন সে সময় বিরক্ত হয়েছিলেন, কেননা তাঁর নিজের নাটক (কৃষ্ণকুমারী ও প্রহসন দুটি) বেলগাছিয়ায় মঞ্চস্থ হয়নি।

(ঙ) সমসাময়িক কালের ইংলিশম্যান পত্রিকায় পাদ্রী লংকেই নীলদর্পণের অনুবাদক বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

(চ) মীর মশররফ হোসেন বলেছেন: "ভারত বন্ধু লং দর্পণখানি বেলাতি সাজে সাজাইতে গিয়া কারাবাসী হইয়াছেন"।

(ছ) নগেন্দ্রবসু সঙ্কলিত বিশ্বকোষ (৮ম ভাগ) (প্রকাশকাল ১৮৯৭),-এ উল্লেখ আছে নীলদর্পণের ইংরেজী অনুবাদক পাদ্রী লং।

(জ) নীলদর্পণ অনুবাদ করবার মত ইংরেজী-বাংলা ভাষাজ্ঞান পাদ্রী লং-এর ছিল। এদেশের আঞ্চলিক ভাষা, প্রবাদ ও আচারবিধির প্রতি পাদ্রী লং-এর স্বাভাবিক আগ্রহও ছিল।

(ঝ) মধুসূদনই যে নীলদর্পণ ইংরেজীতে অনুবাদ করেন তা মাত্র বঙ্কিমচন্দ্র সে সময় উল্লেখ করেছেন: "ইহার ইংরেজী অনুবাদ করিয়া মাইকেল মধুসূদন দত্ত গোপনে তিরস্কৃত ও অপমানিত হইয়াছিলেন, এবং শুনিয়াছি শেষে তাঁর জীবন নির্বাহের উপায় সুপ্রীম কোর্টের চাকুরী পর্য্যন্ত ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন"। —দীনবন্ধুর ব্যক্তিগত বন্ধু বঙ্কিমচন্দ্র "রায়দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুরের জীবনী ও গ্রন্থাবলী"র সমালোচনা নামক রচনাটি দীনবন্ধু মিত্রের গ্রন্থাবলীর ভূমিকাস্বরূপ রচনা করতে গিয়ে (১৮৭৭) উক্তিটি লিপিবদ্ধ করেন। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের 'শুনিয়াছি' ভিত্তিক উক্তিটি যথার্থ নয়। কেননা ১৮৬১ সালের সে সময়ে মধুসূদন সুপ্রীম কোর্টে চাকুরী করতেন না---অতএব "চাকুরী ত্যাগ করিতে বাধ্য" হওয়ার প্রশ্নই উঠে না।

(ঞ) অনুবাদটির দুর্বল ভাষা ও গ্রন্থনাগুণে এটিকে মধুসূদনের রচনা বলে গ্রহণ করা কষ্টকর।

১৮৬০ সালের বাংলা নাট্য সৃষ্টির প্রারম্ভিক প্রচেষ্টার যুগে, বাংলা গদ্যরীতির 'অস্থিরতা'র কালে এবং নবজীবন উন্মেষের প্রভাতে দীনবন্ধুর নীলদর্পণ নির্মাণের শিথিলতায় চরিত্রবিকাশের কেন্দ্রচ্যুতির দুর্বলতায় এবং ভদ্রেতর চরিত্রের সংলাপ কৃত্রিমতায় বর্তমান-কালের শিল্পধারণায় সামান্য রচনা বলে বিবেচিত হলেও নাটকটির বিষয়বস্তুর ঐতিহাসিকতা এবং ভাবের রাজনৈতিক চেতনার জন্য গ্রন্থটি সম্পর্কে স্বদেশী এবং বিদেশী পাঠক বা দর্শক উচ্চকণ্ঠ হয়েছিল।

নাট্য মাধ্যম শুধু জীবনকে বিবৃত করে না, পরিদর্শন করায় এবং পাদপ্রদীপের আলোয় বিবৃত চরিত্রগুলি যথাসম্ভব রূপায়িত হয়। এ যৌথ শিল্প মাধ্যম সমষ্টির আগ্রহকে পরিতুষ্ট করে। এ কারণে নাটক সচরাচর আইনের কাছে, নিষেধের খড়গাঘাতে শাসিত হয়। মলিয়র, রাসিন, গোগোল, শ-এর সামাজিক বিদ্রূপ ধর্মী নাটকগুলি কর্তৃপক্ষ বা সমাজপতির উদারতা লাভে বারবার বঞ্চিত হয়েছে। নাট্যশিল্পের এই হতভাগ্য অদৃষ্টের জন্য ফিল্ডিং-এর মত নাট্যকার যাঁর ব্যঙ্গ বিদ্রূপ ও রসবোধ এ্যারিষ্টোফেনিস ও মলিয়র অপেক্ষা দুর্বল ছিল না, (ইংরেজী নাটকে যাঁকে সেক্সপীয়রের পরে আর একটি উল্লেখযোগ্য প্রতিভা হিসাবে বিবেচনা করা হতো তিনি শেষ পর্যন্ত নাট্যরচনা ছেড়ে উপন্যাস লিখেছেন) ওয়ালপোল সরকারের শাসন ব্যবস্থার দুর্নীতি সম্পর্কে উচ্চকণ্ঠ ফিল্ডিং-এর নাটকগুলোর টুঁটি চিপে ধরেছিলেন তদানীন্তন সরকার। সরকারের হাতে তখন ১৭৩৮ এর সেন্সর আইনের খড়গটি ঝকঝক করছিল।

বার্ণার্ড শ এর Mrs. warren's Profession নাটকটিরও একই ভাগ্যদশা ঘটেছিল। নাটকটির বিরুদ্ধে আইনের এই নিষ্ঠুর ব্যবহার সম্পর্কে উত্তেজিত 'শ বলেছেন: "Lord Chamberlain's Examin of Plays, a gentleman who robs, insults and suppresses me as irresistibly as if he were the Tsar of Russia and I the meanest of his subject." —সে সময় 'শ (১৮৯৮) বিরক্ত হয়ে ভাবছিলেন তিনিও ফিল্ডিং-এর মত নাটক রচনা চিরতরে জলাঞ্জলি দিবেন। নাটক ও নাট্যকারের উপর সুবিধাভোগী কর্তৃপক্ষের এ আচরণ চিরকালের একটি অভ্যস্ত ধারা।

কিন্তু সেসময় নীলদর্পণকে নিয়ে নীলকররা যতখানি ক্ষিপ্ত হয়েছিল, ইংরেজ সরকার ততখানি তীক্ষ্ণ হতে চায়নি। নীলচাষীদের দুর্ভাগ্য ইংরেজ সরকার তখন উপলব্ধি করেছে, মহাবিপ্লবের পর সরকার তখন ভারতবর্ষ সম্পর্কে শাসন ব্যবস্থার পরিবর্তিত নীতি গ্রহণ করতে ইচ্ছুক, এবং কোম্পানীর হাত থেকে ব্রিটিশ সরকারের হাতে ভারতের শাসনভার হস্তান্তরিত হচ্ছে---বড়লাট ক্যানিং স্বয়ং বুঝতে পেরেছেন মহাবিপ্লবের পর তিনি আর একটি (নীলকর আন্দোলন) সংকটের মুখোমুখি এবং সরকারের সামান্য উদারতার অভাবে বাংলার নীলচাষীরা জীবনমরণ সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়বে। বাংলার গভর্ণর গ্রাণ্ট নীলকর ব্যবসায়ীদের অত্যাচার সম্পর্কে ব্রিটিশ সরকারকে যতখানি সম্ভব বাস্তব সংবাদ প্রেরণে ন্যায়নিষ্ঠ ছিলেন।

কিন্তু নীলচাষের প্রাথমিক অবস্থা (১৭৭৯ সাল) থেকে ১৮৬০ সালের নীলচাষের মধ্যবর্তীকালে বিভিন্ন আইনের সুযোগে প্রায় কপর্দকশূন্য নীলকরদের অবিশ্বাস্য রকম অর্থ উপার্জনের সমস্ত কৌশল, শঠতা ও নৃশংসতার হদিশ জানা সত্ত্বেও এবং নীলচাষীদের প্রতি কিছুটা সহানুভূতিশীল মনোভাব হওয়া সত্ত্বেও ব্রিটিশ সরকার নীলকরদের বিরুদ্ধে সরাসরি কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। কেননা ১৮৬০ সালের নীলকমিশনের কিছুটা সহানুভূতিশীল সুপারিশগুলো যখন নীলকররা অবজ্ঞা করলো তখনও ব্রিটিশ সরকার একদিকে নীলকরদের তোষণ করেছে, অন্যদিকে নিপীড়িত নীলচাষীদের পিঠে মাত্র সান্ত্বনার হাত বুলিয়ে নিজেকে সাধু শাসক বলে প্রমাণ করবার ছলনা করেছে।

নীলকররা ইংরেজ সরকারের এ দুর্বলতা সম্পর্কে বিলক্ষণ সচেতন ছিল। কেননা ইংরেজ সরকারের ঔপনিবেশিক চক্রান্তের অন্যতম সহায় নীলকররা একথা ভাল করেই বুঝেছিল সামান্যমাত্র কয়েকজন মানবতাবাদী সিভিলিয়ন যদিও নীল-জমিদারী-ব্যবসার বিরুদ্ধে ইংলণ্ডেশ্বরীকে ওয়াকেফহাল করছে, কিন্তু ইংলণ্ডের ধনপতি বা শিল্পপতিরা তাদের বিপক্ষে কোনদিনই যাবে না। এবং মহাবিপ্লবের সময় নীলকর কুঠিয়ালদের প্রত্যক্ষ সহায়তা না পেলে বাংলা দেশে বিপ্লবের আকার যে ভয়াবহ হতো সেকথা ভারতের ইংরেজ সরকার সম্যক উপলব্ধি করেছিল। কেননা বাংলার গ্রামীন জনসাধারণকে দুর্ধর্ষ লাঠিয়াল দিয়ে জব্দ করে, আমীন-দেওয়ান নামক মূর্খ অসাধু মধ্যবিত্তদের সহায়তায় সংগ্রাম-সচেতন মানুষের সর্বনাশ করে এবং নীলদাদনের অপরিশোধনীয় ঋণে বাংলার গ্রামীন অর্থ স্বচ্ছলতাকে পঙ্গু করে সেসময় নীলকর ব্যবসায়ী জমিদাররা কোম্পানীর তথা ব্রিটিশ সরকারের সুদূরপ্রসারী উপকার সাধন করেছিল। কলিকাতার বাঙালী বাবুভেয়েরা গ্রামীন বাংলার এ মর্মান্তিক অর্থনৈতিক বিপর্যয়কে বিশ্লেষণ করবার মত সচেতন ছিল না, উঠতি-শহর-কলিকাতার বিলাসমত্ততার মধ্যে তারা শুধু ব্রিটিশ সরকারের মহিমা কীর্তন করেছে। সচেতন

বুদ্ধিজীবী কয়েকজন বাঙালীর অঙ্গুলি নির্দেশকে বাবুভেয়েরা হয় উপেক্ষা করেছে না হয় সেসব সংবাদ ও সাহিত্যের মধ্যে ওরা শুধু 'মতিলালের মাতলামি' বা 'বক্রেশ্বরের বোকামী' পেয়ে হাসি মস্করা করে দিন কাটিয়েছে।

হুতোম প্যাঁচার নকসায় সে সময়ের একটি চমৎকার বিবরণ পাওয়া যায়: "পেয়াদারা পর্যন্ত ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হয়ে মফস্বলে চল্লেন। তুমুল কাণ্ড বেধে উঠলে বাদাবুনে বাঘ... (প্ল্যাণ্টারস-এসোশিয়েশন) বেগতিক দেখে নাম বদলে (ল্যাণ্ডহোল্ডারস এ্যাসোশিয়েশন) তুলসীবনে ঢুকলেন। হরিশ মলেন, লং-এর মেয়াদ হলো। ওয়েলস্ ধমক খেলেন। গ্রাণ্ট রিজাইন দিলেন, তবু হুজুক মিটল না।"

হুতোমের এই কলিকাতা চিত্রটি প্রতি বর্ণে সত্য। যদিও নীলদর্পণের বিরুদ্ধে মানহানির মামলায় লং সাজাপ্রাপ্ত হলেন; এবং বিচারপতি ওয়েলস্ নিন্দিত হলেন কিন্তু নগর কলিকাতার উঠতি বাবুরা তাতে কিছুটা হুজুগের গন্ধ পেয়ে কিছুটা হৈ চৈ করলো বটে—গ্রামবাংলার ধ্বংসোন্মুখ অর্থনীতি তথা বাংলার বিধ্বস্ত অর্থনীতির দিকে তাদের নজর পড়লোনা। এবং কলিকাতা-কেন্দ্রিক নীলদর্পণ-কেন্দ্রিক বাবুভেয়েদের তথাকথিত শক্তি ব্রিটিশ সরকার ভাল করেই বুঝেছিল বলেই নীলদর্পণ নাটকটিকে বাজেয়াপ্ত করার জন্য বা মঞ্চস্থ না হতে দেওয়ার জন্য উদগ্রীব হয়নি। ১৮৭২ সালে নীলদর্পণের মঞ্চরূপ দেখে অমৃতবাজার পত্রিকা লিখেছিল—

"নীলদর্পণের অভিনয়ের প্রকৃত স্থান কলিকাতা নহে। মফস্বলে যে কাণ্ড হইতেছে তাহা কলিকাতার লোকেরা প্রায় জানিতে পারেন না। যখন নীলকর সাহেবের পদাঘাতে গরিব রাইয়ত ধূল্যবলুণ্ঠিত হইয়া উচ্চস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিল তখন কলিকাতাবাসী দর্শকমণ্ডলী মধ্যে উচ্চস্বরে হাস্যধ্বনি উঠিল"।

তবে একথা ঠিক যে নীলদর্পণ নাটকখানি ভারতে অবস্থানকারী ইংরেজদের দুটি বিশিষ্ট পরিচয়ে চিহ্নিত করতে সাহায্য করেছে। এরপর আর নির্দ্বিধায় কেউ মেনে নেয়নি যে "ইংরেজ রাজত্বের নয় প্রকার উপকার ও পাঁচ প্রকার অপকার" (রামমোহনের মত) এবং স্বদেশবাসী বুঝতে পারলো এদেশের শিল্পোন্নয়ন ও শিক্ষিত মধ্যবিত্ত গড়ে তোলার জন্য সকল ইংরেজই ডেভিড হেয়ার সদৃশ উদার মানবতাবাদী নয়। বরং একথা এখন স্পষ্টতঃ বিবেচিত হতে লাগলো যে ইংলণ্ডের শিল্পপতি বুর্জোয়াদের কলোনাইজেশন উদ্দেশ্যের এবং তথাকথিত ফ্রি-ট্রেড নীতির ছদ্মবেশে এদেশকে কাঁচামাল সরবরাহের ও পণ্যবিক্রির বাজারে অধঃপতিত করবার নির্ভরশীল হাতিয়ার হচ্ছে এইসব নীলকর ব্যবসায়ীরা। এবং ফরাসী বিপ্লবের সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার মন্ত্রমুগ্ধ ব্রিটিশকর্মচারীরা নীতিগত ভাবে নীলকর বিরোধী হলেও

চাকুরীর মোহে বা ভয়ে নীলকর সমর্থক হতে বাধ্য। হয় বেতনভুক এসব কর্মচারীরা পরোক্ষভাবে ইংলণ্ডের শিল্পপতিদের স্বার্থসিদ্ধির যন্ত্রে পরিণত হবে না হয় চাকুরী ছেড়ে স্বদেশে ফিরে যেতে বাধ্য হবে।

১৮৫৪ সালে ৫ই জুন বড়লাট ডালহৌসী তাঁরই অধীন স্বজাতি ম্যাজিষ্ট্রেট স্কোন্সকে তিরস্কার করেছিলেন। স্কোন্স নীলকরদের অত্যাচার রহিত করবার জন্য সুপারিশ করেছিলেন এই তার অন্যায়:

"তুমি শুধু নেটিভদের ( নীলচাষী ) কথাই শুনেছ। সম্ভ্রান্ত নীলকরদের কথা শোননি। শুধু কি নীলকররাই একমাত্র অত্যাচারী। এদেশের জমিদার মহাজনরাও কি অত্যাচারী নয়? একি সম্ভব, এও কি আমাদের চিন্তা করবার বিষয় যে, যে জেলায় ব্রিটিশ শাসন চলছে সেখানে কোন আইন নেই, কোন বিচার নেই!"

১৮৬০ সালে বড়লাট ক্যানিং-এর সময় অবস্থার কিছু পরিবর্তনে এবং মহাবিপ্লবের ফলে ব্রিটিশ সরকার বাহ্যতঃ সহানুভূতিশীলতার অভিনয় করছিল বলে নীলকরদের আপত্তি ও ক্রোধ সত্ত্বেও নাটক নীলদর্পণ বা নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রের বিরুদ্ধে চরম কোন বিধান দিতে সরকার গড়িমসি করেছে। কিন্তু নাটক ও নাট্যকারের শাস্তি না হলেও নীলদর্পণের ইংরেজী অনুবাদের যাঁরা সত্যিকারের পৃষ্ঠপোষক সেই তিনজনকে (ছোটলাট গ্রাণ্ট, সেক্রেটারী সিটনকার এবং পাদ্রী লং) নীলচাষীর প্রতি সহানুভূতিশীল ভূমিকা থেকে বিদায় নিতে হয়েছিল। ইংরেজ সরকারের এ মনোভাবের বর্ণনা দিয়েছেন হুতোম:

"শ্যামচাঁদের অসহ্য টর্‌চরে ভূত পালায়, প্রজারা ক্ষেপে উঠবে কোন কথা! মিউটিনি ও ব্ল্যাক আক্টের সভাতে তো 'শ্রীবৃদ্ধিকারীরা' চটেই ছিলেন, নীলবানুরে হাঙ্গামে সেইটি বদ্ধমূল হয়ে পড়লো। বড় ঘরে সতীন হলে, বড় বৌ ও ছোট বৌকে তুষ্ট করতে কর্তা ও গিন্নীর যেমন হাড় ভাজাভাজা হয়ে যায়, 'শ্রীবৃদ্ধিকারী' স্থইপিং ক্লাশ ও নেটিভ কমিউনিটিকে তুষ্ট করতে গিয়ে ইণ্ডিয়া ও বেঙ্গল গভর্ণেমেণ্টও সেইরকম অবস্থায় পড়লেন।"

অত্যন্ত পরিশ্রমী, সৎ এবং প্রশংসিত ডাকবিভাগীয় কর্মচারী হওয়া সত্ত্বেও দীনবন্ধুর যথাযোগ্য বেতনবৃদ্ধি বা পদোন্নতি হয়নি, মাত্র ৪২ বৎসর ৮ মাস বয়সে তাঁর অকাল মৃত্যুর জন্য অমৃতবাজার পত্রিকা একটি সরকারী তদন্ত দাবী করেছিল —"রায়বাহাদুর খেতাবে ভূষিত দীনবন্ধুমিত্রের প্রতি এহেন অবিচারের জন্য নীলকরদের গোপন হাত ছিল কিনা বিবেচনা করা প্রয়োজন।"

নীলদর্পণ নাটকের ভূমিকায় এবং সংলাপে দীনবন্ধু বারবার ইংরেজ চরিত্রের দুটি রূপের কথা উল্লেখ করেছেন। এদের একটি রূপের মধ্যে আছে উড, রোগ, এবং উড়ের স্যাম্পেন সংগী ইন্দ্রাবাদের ম্যাজিস্ট্রেট। ---বাংলার নীলচাষীরা এ জাতের ইংরেজ (শিল্পপতিদের সর্বকালের নির্ভরশীল যন্ত্র) দ্বারাই ধূল্যবলুণ্ঠিত হয়েছে। আর একদলে আছে অমরনগর এবং ইন্দ্রাবাদের প্রাক্তন ম্যাজিস্ট্রেট---যাঁরা সজ্জন রাজকর্মচারী হিসাবে নীলচাষীদের দুর্ভোগ নিরসনের জন্য সরকারের কাছে সুপারিশ করেছে।

গ্রাম বাঙলার লোকচরিত্রের মধ্যেও দুটি দল। আমীন-দেওয়ানজী আর লাঠিয়াল—যারা নীলকরদের আশ্রয়পুষ্ট এবং নগর কলিকাতার মূর্খ বাবুভেয়ের পূর্বসূরী (দ্বারকানাথ ঠাকুর যাঁদের মধ্যে শিক্ষিত মধ্যবিত্তের স্বপ্ন দেখেছিলেন) আর একদল ভীত সন্ত্রস্ত রায়ত বা প্রতিবাদমুখর অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছল গ্রাম্য মধ্যবিত্ত।

দীনবন্ধুর প্রত্যক্ষ জীবনবোধের ফলে উক্ত দলগুলির পরিচয়রেখা নীলদর্পণে ফুটে উঠেছে সত্য কিন্তু নীলচাষীর গোষ্ঠিবদ্ধ সংগ্রামের প্রস্তুতিকে সংহত শিল্পমহিমা দিতে সক্ষম হননি বলে একটি পারিবারিক শোচনীয় পরিণতিতে নাটকটি মূর্চ্ছাহত হয়েছে। বিষয়বস্তুর ঐতিহাসিক বিস্তৃতি ও রাজনৈতিক ভাববিপ্লবের এক দুরূহ আখ্যানকে নিয়ে শিল্পসৌধ নির্মাণ করার নাট্য প্রস্তুতি তখন পর্যন্ত বাংলা নাট্যসাহিত্যের বা দীনবন্ধুর ছিল না বলেই নীলদর্পণ বিষয় গৌরবে যতই স্মরণীয় হোক না কেন নির্মাণ সৌকর্যে নাট্যকার যথার্থ সফল হননি।

নীলদর্পণের গ্রামজীবন এবং ভদ্রেতর চরিত্রগুলির উপর মধুসূদনের 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' প্রহসনখানির প্রভাব সম্পর্কে সমালোচকরা নির্দেশ করেন। বিশেষতঃ পুঁটির সংগে পদীর এবং হানিফের সংগে তোরাপের চরিত্র ও সংলাপ সামঞ্জস্যের জন্য এমন মনে হওয়াতে অসুবিধা নেই। পুঁটি ভক্তপ্রসাদ বাবুর কামাচার সিদ্ধির জন্য গ্রাম্যবালিকা সংগ্রহ করে, পদীময়রাণীও নীলকরদের কামনার আগুনের জন্য ক্ষেত্রমণির সন্ধান আনে। রায়ত তোরাপ গোঁয়ার, সাহসী এবং যশোহরে আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলে। হানিফও কৃষক, স্বভাবে গোঁয়ার, তার সংলাপও যশোহরে আঞ্চলিক ভাষা।

মধুসূদন দত্ত জন্মভূমি ও বাল্যজীবন অভিজ্ঞতার ফসল যশোহর গ্রাম্যসংলাপ ও প্রাকৃত জনকে তাঁর প্রহসনে সদ্ব্যবহার করেছেন। দীনবন্ধু চাকুরী জীবনের অভিজ্ঞতা ও আঞ্চলিকভাষা সহজে রপ্ত করার দক্ষতাকে (তিনি ওড়িয়া ভাষা ও নিখুঁত ভাবে বলতে পারতেন) তাঁর নাটকে সদ্ব্যবহার করেছেন।

কিন্তু নীলদর্পণ রচনা কালে দীনবন্ধু মধুসূদনের প্রহসনখানি পড়ার সুযোগ পেয়েছিলেন বলে মনে হয় না। যদিও প্রহসন দুখানি ১৮৫৯ এর শেষদিকে লেখা হয়েছিল (সে সময় দীনবন্ধুর সংগে কলিকাতার যোগাযোগ খুব স্বল্প) কিন্তু মুদ্রিত হয়েছিল ১৮৬০ সালে। বেলগাছিয়া রঙ্গমঞ্চে কিছুদিন মহলা চলা সত্ত্বেও প্রহসন দুখানি যথাসময়ে মঞ্চস্থ হতে পারেনি। দীনবন্ধুর সংগে সে সময় মধুসূদনের ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল না---অতএব পাণ্ডুলিপি আকারে অমুদ্রিত প্রহসন দুখানি ১৮৬০ সালের শেষদিকের পূর্বাহ্ণেই পড়বার সুযোগও দীনবন্ধু পাননি। ১৮৬০ সালের সেপ্টেম্বরে প্রকাশিত নীলদর্পণ নাটকখানির রচনাকাল আরও কয়েকমাস আগে। এজন্য সংগত কারণেই মনে হয় প্রহসন ও নাটকখানির মধ্যে একটি দুটি চরিত্রের মিল একান্তই আকস্মিক ব্যাপার। তবে উপাখ্যানের প্রয়োজনে দুটি রচনাতেই এ জাতের চরিত্র যেমন অপরিহার্য তেমনিই বাস্তব। মধুসূদন বা দীনবন্ধু বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকেই এ চরিত্র ও সংলাপ আহরণ করেছিলেন, কেননা তৎকালীন গ্রাম্য সমাজজীবনে এজাতীয় চরিত্র দুষ্প্রাপ্যও ছিল না। ---দুজনেই নিজ নিজ প্রয়োজনে পদী/পুঁটি, তোরাপ/হানিফ চরিত্র ও চরিত্র-সংলাপ সৃজন করেছেন নিজস্ব অভিজ্ঞতা ও প্রত্যক্ষ জীবনানুভূতি থেকে। দীনবন্ধু জামাইবারিক প্রহসনেও পদীর পরিবর্তে ভবিময়রানী নামটি ব্যবহার করেছেন নায়িকা কামিনীর পাড়াসুবাদে দিদিমা চরিত্রের জন্য।

নীলদর্পণ শুধু নীলকর উৎপীড়নের সমসাময়িকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বাংলার দুঃখময় প্রাত্যহিক পল্লীজীবনের করুণচিত্রটি, গ্রামবাংলার ঘনিয়ে আসা অন্ধকার সন্ধ্যার ছবিটি, স্বরপুরগ্রামখানি, গোলকবসুর একান্নবর্তী ভক্তিস্নেহমাখা পরিবারটি, সাধুচরণের নিকোনো উঠানটি, গ্রামখানির আশেপাশের বেত্রাবতী-চন্দনবিল-সাঁপোল-তলার এক সময়ের শস্যশ্যামল মাঠগুলি---শ্যামল বাংলার নীরব দুপুরে স্বাভাবিক রস রসিকতার মধ্যে গৃহবধূদের সিকা গাঁথা আর চুল বিনুনীর গৃহগত মাধুর্যের ছবিখানি সনাতন জীবন-সত্যের মত ফুটে উঠেছে।

শ্যামল মনোলোভা প্রসন্ন প্রকৃতির মধ্যে তখন মাঝে মধ্যে সংঘর্ষের দূরবর্তী একখণ্ড মেঘ শুধু দেখা দিচ্ছে আভাষে ইংগিতে। বিন্দুমাধব গেছে শহরে কৌশলী হয়ে ফিরবে, বধূ তার বেতাল পঞ্চবিংশতি পড়া সরলতা---স্বামীর আবেগ বহন চিঠিগুলি ভালবাসার শাঁখা শোভন হাতে বারবার উল্টেপাল্টে দেখছে; ক্ষেত্রমণি এসেছে পিতৃগৃহে--সিঁথিতে তার টকটকে উজ্জ্বল সিঁদুর। আসন্ন প্রথম সন্তানসম্ভবা ক্ষেত্রমণির লাজরক্তিম মুখখানি যেন কচিধানের মাধুর্য্য; রাইচরণ শ্বশুরালয়ে যাবে বৌকে আনতে---জীবনকে তাদের আকাঙ্খার মধ্যে আনতে; মাঠকে তার পূর্ণতার মধ্যে দেখতে সকলেই

উন্মুখ। কিন্তু সে মাঠ, সে জীবন, সে সম্ভাবনাগুলো আর চরিতার্থতা পেল না। যেমন চন্দনবিলে পদ্মফুল ফুটে থাকার মত মোড়লদের আউশ ধানের পালা, দশখান হাল, চল্লিশটা দামড়া গরু সব এক এক করে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে—সেই মোড়লগৃহের দিকে এখন আর তাকানো যায় না—তেমনি স্বরপুর গ্রামখানি, গোলোকবসুর মান্য পরিবারটি দেখতে দেখতে নীলকর বিষদংশনে ছারখার হয়ে গেল। গোলকবসু মর্মান্তিক লজ্জায় আত্মহত্যা করলেন, নীবনমাধবের জীবন অকালে ঝরে গেল, বিন্দুমাধবের উচ্চশিক্ষা হলোনা ;—সন্তানসম্ভবা ক্ষেত্রমণিকে ধর্ষণ নিপীড়নে হত্যা করে নীলকররূপী অমোঘ নিয়তি গ্রামবাংলার ভাগ্যে সুদূর প্রসারী অর্থনৈতিক বিপর্যয়কে অনিবার্য করে তুললো। পরিণতিতে ভীতবিহ্বল বিন্দুমাধব মৃত্যু-অন্ধকার আবর্তের মধ্যে দুঃখের পাঁচালী গাইছে :

> কে হরিল সরোরুহ হইয়া নির্দ্দয়
> শোভাহীন সরোবর অন্ধকারময়
> হেরি সব শব ময় শ্মশান সংসার
> পিতামাতা ভ্রাতা দারা মরেছে আমার।

সর্বনাশের ধ্বংসলীলায় দাঁড়িয়ে বিন্দুমাধবের সে বিলাপ যত অনাটকোচিত ও অনাকাঙ্খিতই হোক—বিপর্যয়ের অন্তিম গর্ভে নিমগ্ন হওয়ার পূর্বে নাট্যকার বোধ করি এছাড়া বিকল্প উজ্জ্বল কোন আচরণকেই বিশ্বাস্য বলে কল্পনা করতে পারেননি। নাটকখানির পাঁচ অংকের আঠারোটি দৃশ্যের প্রায় অর্ধশত চরিত্রের ব্যাপ্তির মধ্যে নাট্যকার ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক ভাবনাকে সমসাময়িক আলোড়িত নিপীড়িত সেণ্টিমেণ্টের মধ্যে বিমুগ্ধ হয়ে ধরবার চেষ্টা করেছেন, তাঁর এই বিমুগ্ধতার মধ্যে প্রত্যক্ষতা, উত্তেজনায় অকৃত্রিম ঋজুতা আছে, গভীর স্থির প্রজ্ঞা দ্বারা এ জীবন বিপন্নতা নির্মাণ, বিশ্লেষ করার অপেক্ষা তিনি করেননি—কিন্তু বাংলার গ্রাম বাংলার মানুষ, বাংলার সনাতন জীবন-সত্যটি আন্তরিক স্বাভাবিক স্রোতের মত বয়ে এসে নীলদর্পণকে ভবিষ্যতে স্মরণীয় সৃষ্টি হয়ে বেঁচে থাকবার জন্য পলিমাটি দান করেছে।

"দীনবন্ধু চোখ দিয়া যেমন স্পষ্ট ও পরিষ্কার দেখিতেন চোখ বুজিয়া তেমন পারিতেন না"। খোলা চোখে সহৃদয় খোলাচোখের অবিরাম অভিজ্ঞতার মধ্যে যেখানে যা আছে তাকে আরও বাস্তব প্রত্যক্ষ করার ফলেই নীলদর্পনের বিপর্যয় অতিকরুণ হয়ে গেছে। রয়ে সয়ে যা প্রত্যক্ষ, প্রকৃত ও প্রাকৃত তাকে অস্ফুট অতীন্দ্রিয় ও আত্মগত কল্পনায় সুন্দর করার শিল্পবিশ্রাম তাঁর ছিল না। বাংলার গদ্য বাংলা নাট্য প্রচেষ্টার অস্থিরতা ও অপরিণতির যুগে, নব্য বাংলার সন্ধিক্ষণের আকাঁচা আকাঁড়া কৌতুক ও রসময়তার আকর্ষণের সময়, জীবনের ডিমভাঙ্গা সদ্যোজাত নব শাবকের দুর্বল স্বভাবের মধ্যে, নাগরিক-গ্রাম্যতার মধ্যে হাস্যকৌতুকের প্রকৃত নক্সা এঁকেছেন দীনবন্ধু ; মাত্র

তেরবছরের প্রকৃত সাহিত্য সাধনার সাতটি নাটক-প্রহসন রচনার মধ্যে প্রথমটি ব্যতীত বাকী ছয়টি তাঁর রসচিত্রের উপযুক্ত সংগী। শুধু নীলদর্পণখানি রস গাঢ়তায় সকলের ব্যতিক্রম হয়ে ফুটে উঠেছে। আদুরীর সরল স্বাভাবিকতার মধ্যে, রায়তদের সংবেদনশীলতার ফাঁকে যদিও কখন সখন রসের স্বভাবটুকু একচিলতে রৌদ্রের মত উঁকি মেরেছে তখনই নীলকরদের শ্যামচাঁদের নিষ্ঠুর শপাং শপাং আঘাতে সে রোদ বিষাদের কালোমেঘে অদৃশ্য হয়ে গেছে। এ মেঘময় অন্ধকার ভয়াবহতা, জীবনের প্রতি ধাপে বিপর্যয়ের তমসা দীনবন্ধুর সাহিত্যে একান্তই বিরল একান্তই ব্যতিক্রম। কলিকাতা সংস্পর্শের দূরে, বন্ধু সুহৃদ বৈঠকী আলাপাচার থেকে বিমুক্ত পাঁচবছরের গ্রামবাংলার অভিজ্ঞতালব্ধ জীবনসম্পদ সম্বল নীলদর্পণখানি তিনি রচনা করেছেন সুদূর ঢাকা প্রবাসে। অন্য ছয়খানি গ্রন্থ কৃষ্ণনগর ও কলিকাতায় রচনা। দ্বিতীয় গ্রন্থ নবীন তপস্বিনী নীলদর্পণের তিন বছর পরের রচনা। তখন নীলদর্পণ হাংগামা সরকারী ভাবে মিটে গেছে। সরকারী রোষ দৃষ্টি থেকে মুক্ত থাকার জন্যই হোক অথবা নগর কলিকাতার নব্যজীবন কৌতুক তাঁকে অধিকতর আকর্ষণ করার জন্যই হোক দীনবন্ধু আর নীলদর্পণ সম্পদকে বা অনুরূপ কোন জীবন বিপর্যয়মূলক আখ্যানকে অন্যভাবে ভিন্নপটভূমিতে ব্যবহার করেন নি।

দীনবন্ধু শিল্পসচেতন প্রকৌশলীর দক্ষতায় নীলদর্পণ রচনা করেননি। তাঁর শিল্পকর্মের হৃদয়দোসর হাস্যরসাকাঙ্ক্ষা বার বার তাঁকে গুরুগৃহে আহ্বান করেছে। ঈশ্বরগুপ্তের সমকালীন চিত্রচিত্রিত পদ্য তাঁকে প্রলুব্ধ করেছে। জলধর-জগদম্বা, নদেরচাঁদ-হেমচাঁদ, রাজীব, ডেপুটি, রতা, পদ্মলোচন, বিন্দুবাসিনীর তরল কৌতুকময় আকর্ষণ তাঁকে বার বার নির্দিষ্ট চোরাগলিতে ঘুরপাক খাইয়েছে—কিন্তু সচেতন দীনবন্ধু যতবারই সেই আবর্ত থেকে আয়াসের সংগে বেরুবার প্রচেষ্টায় লীলাবতী বা কমলেকামিনীর জন্য সিরিয়স হতে চেয়েছেন তখনই সংলাপ-চাতুর্যের অনাবশ্যক পাণ্ডিত্যে বা রোমান্সের ব্যর্থ প্রচেষ্টায় ম্লান হয়ে গেছেন। দীনবন্ধুর এ সচেতন আয়াসের সংগে যদি অনায়াস শিল্পগুণ মিশতে পারতো তবেই হয়তো তাঁর কাছে 'বাংলায় নিখুঁত নাটক' এমনকি 'মহৎ নাটক'ও পাওয়া যেত।

নীলদর্পণই তাঁর একমাত্র অনায়াস শিল্পকর্ম। (সধবার একাদশী নিমচাঁদ সৃষ্টির জন্য উজ্জ্বল)। অনবধানতার ফলে দীনবন্ধু নাট্যরচনার উন্মেষকালে জানতে পারেননি এমন একটি রক্তধূসর ঐতিহাসিকতাকে, এমন একটি অগ্নিময় জীবনবেদকে, এমন কতকগুলি নিয়তি কবলিত মানুষের বেদনাকে তিনি শিল্পপরীক্ষার জন্য গ্রহণ করেছেন যাদের ঐক্যসাধন করলে বাংলার স্মরণীয় ট্রাজেডী লেখা হবে। কিন্তু যুগ ও কালের

সেই অপরিণত অনুশীলণীর, সময় কোন সবল আশ্রয় দীনবন্ধুর বা বাংলা নাট্য দৃষ্টান্ত কাছে ছিল না বলেই তিনি দুর্জয় মানব শিবির গড়ে তুলতে অক্ষম হলেন। —তাঁর হাতে ভাগ্যের নিদারুণ আঘাতে যে কোন একটি মানুষের অস্তিত্বের প্রতিরোধ যদি শিলা বজ্রে কেঁপে কেঁপে উঠতো —কোন বিন্দুমাধব বা নবীনমাধবের কর্মশালায় গড়ে উঠা শিলীভূত অভেদ্যব্যূহ অকস্মাৎ চর্ণশিল দ্যোতনা হয়ে যেত—তাহলেও পরাভবেও বিজয়ের দ্যোতনা উজ্জ্বল হতো। মৃত্যুকে প্রতিদ্বন্দ্বী করে এরা কেউ মরেনি—মৃত্যুতে সমর্পিত হয়েছে মাত্র। কাদামাটির দুর্গ প্রতিরোধে সত্যিই যখন মৃত্যু এলো তখন বিলাপে, ক্রন্দনে ও মুর্চ্ছায় দুর্বল দুর্গটি আস্তে আস্তে গলে গলে বিলাপ সমুদ্রে মিশে গেল। একটি Disaster Drama-র সংখ্যাহীন মৃত্যুর কলরোলে Pathetic-রসের অতিরস ক্লান্তিতে নীলদর্পণের অতিনাটকীয়তা অগ্রাহ্য শিল্পস্মৃতি হিসাবে চিহ্নিত হয়ে গেল।

পরিশিষ্ট

## নীল চাষের ইতিহাস—

আকাশ-অরণ্য-সমুদ্র-মেঘ-রৌদ্র-ফুল প্রভৃতি শোভিত বিচিত্র বর্ণ প্রকৃতির প্রতি মানুষের মোহ সনাতন। আকাশের নীলের মত সাজতে, রৌদ্রের পীতাভের মত দেখতে মানুষের ইচ্ছা স্বভাব ধর্মের মত। প্রাচীনকালের ক্রীড়ামোদিরা অরণ্যকান্তারের অনায়াস-লভ্য বৃক্ষ-পত্র-পুষ্পের রঞ্জক পদার্থে গাত্র লেপন করে কিম্ভুতকিমাকার হতে আনন্দ পেত, সামরিক শ্রেণীর মানুষও বিচিত্রবর্ণে ভয়াবহ দেখাবার জন্য নানা রঙে রঞ্জিত হতো।

ক্রমেই পরিধেয় বস্ত্রের ব্যবহারের সংগে সংগে চিত্তাকর্ষক রঞ্জিত বস্ত্রে সুশোভন দেখাবার সৌন্দর্যস্পৃহা দেখা গেল মানুষের মধ্যে। পত্রপুষ্পের নির্যাসের রঙে নীল পীত লোহিত অলক্তক রঞ্জিত বেশভূষা উৎসবাদির ধর্মানুষ্ঠানের অংগীভূত হলো। এসব রঙকে স্থায়ী করবার জন্য আবিষ্কৃত হয়েছিল রাগবন্ধক ( Mordant )। ভারতের আবিষ্কার ফিটকিরির সাহায্যে রঙ আরো পাকা হয়েছে। জলের ধোয়ায় পত্রপুষ্পের রঙে ফিটকিরি মিশালে ম্লান হীনপ্রভ হয় না।

অরণ্যের পুষ্প, বৃক্ষকাষ্ঠ ও বল্কল, বৃক্ষমূল, বৃক্ষপত্র, বৃক্ষের সমস্ত অংশ—প্রত্যেকটি থেকে এক এক রকম রঙ উদ্ভাবনের প্রচেষ্টা হয়েছে। পুষ্পজাত রঞ্জকের জন্য

পলাশ, কুসুম, শেফালিকা, কুমকুম, মান্দার, গাঁদা, পটোয়া ফুলের ব্যবহার হাল আমলেও চালু।

মঞ্জিষ্ঠা এবং হরিদ্রার মত 'নীল' হলো উদ্ভিজ রঙ। পৃথিবীতে নীলগাছ জন্মায় প্রায় তিনশো রকম। ভারতের নানান জায়গায় চল্লিশ রকম নীলগাছ হতো। নীলের জাতিগত ল্যাটিন নাম হলো 'ইণ্ডিগো-ফেরা'। সম্ভবত প্রাচীনকাল থেকেই ভারত থেকে (ইণ্ডিয়া) নীল দেশবিদেশে চালান হতো বলে এরকম নাম হয়েছে। গ্রীসে ও রোমে নীলের নাম ছিল ইণ্ডিগো, পারসীতে বলে 'তুখ্‌মেনীন', আরবীতে নাভুননীল। 'ইণ্ডিগো টিঙ্কটোরিয়া' জাতের নীলগাছ থেকে সর্বোৎকৃষ্ট নীল রঙ পাওয়া যেত, এজাতের গাছ একমাত্র ভারতবর্ষেই জন্মাতো। গাছগুলোর দৈর্ঘ্য চার থেকে ছয় ফুট।

রাসায়নিক পরীক্ষায় দেখা গেছে নীলবৃক্ষের রঞ্জক পদার্থের মূলীভূত বস্তু ইণ্ডিকান। ইণ্ডিকানের অনু বৃক্ষস্থ এনজাইম (enzyme) প্রক্রিয়ায় ভেঙে ইণ্ডক্সিল (indoxcyl) এ পরিণত হয়। ইণ্ডক্সিল বাতাসের অক্সিজেনের যোগাযোগে নীল রঙের সৃষ্টি করে। ফুল ফুটবার সময় (বাংলা দেশে আগষ্ট মাসে) নীলগাছ কেটে আনা হয় আর তার ডগা সমেত পাতাগুলোকে জলের চৌবাচ্চার মধ্যে নয় থেকে পনের ঘণ্টা পর্যন্ত ডুবিয়ে রাখা হয়। দুতিন ঘণ্টার মধ্যেই পচন শুরু হয়। পচনের জন্য গ্যাস নির্গত হয়। গ্যাসের মধ্যে থাকে নাইট্রোজেন, কার্বনডাইঅক্সাইড, শেষের দিকে হাইড্রোজেন ও মার্শগ্যাসও প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। শেষে বুদবুদ আর যখন উঠবেনা তখন বুঝতে হবে পচন বা গাঁজানো শেষ হয়েছে।

গাঁজানোর পরে পরেই জল হলুদবর্ণ হলে তখন অন্যপাত্রে ঢেলে খুব করে গরম জলে সেদ্ধ করতে হবে আর নাড়তে হবে। দুতিন ঘণ্টার মধ্যেই নির্যাসের নানা বর্ণ পরিবর্তন দেখা যাবে। ম্লান হরিৎ থেকে সবুজ, সবুজ থেকে গাঢ় নীল। এই নীল অবশেষে দানা বেঁধে জলের নিচে টুকরো টুকরো ভাবে পড়ে যাবে। সেই টুকরো নীলগুলো উপরের ম্লান পীত বর্ণ জল থেকে তুলে নিয়ে শুকিয়ে নিলেই বাজারে বিক্রির জন্য বা কাপড় রঙ করবার জন্য নীল পাওয়া গেল।

ইউরোপে নীলের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল ওড (woad)। কিন্তু ওড ভারতীয় নীলের মত গাঢ় ও স্থায়ী রং নয়। সেকালে হলাও ছিল ইউরোপে বস্ত্রশিল্পের প্রধান কেন্দ্র। সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত ইউরোপের নানা দেশের কাপড় রঙ করবার জন্য হলাণ্ডে পাঠানো হতো।

ওলন্দাজরা যখন থেকে ভারতবর্ষের নীল ইউরোপে আমদানী শুরু করলো তখন অন্যান্য দেশের সংগে এদের স্বার্থ সংঘাত শুরু হয়ে গেল। কেননা নীলের সংগে প্রতিযোগিতায় ওডচাষী—ওড রঙ প্রস্তুতকারীদের পরাজয় আসন্ন হলো। নীলের কাছে ওডের পরাভবের জন্য ১৫৯৮ সালে ফরাসী রাজা নীল আমদানী বা ব্যবহার বেআইনী ঘোষণা করলেন, এমন কি ১৬০৯ এ নীল ব্যবহারকারীদের মৃত্যুদণ্ডের নির্দেশ দেওয়া হলো। জার্মানীতে নীল ব্যবহার নিষিদ্ধ হলো। ইংলণ্ডের জনৈক ব্যবসায়ী হলাণ্ড থেকে নীলরঙ প্রক্রিয়া শিখে এসে নীল ব্যবহার চালু করলেন। ইংলণ্ডেও নীলব্যবহার নিষিদ্ধ হয়ে গেল। এমনকি নীল 'বিষাক্ত পদার্থ' ফতোয়া জারী করতে হলো বিচারপতিকে। কিন্তু এতসব আইন বিধান করেও ওড ব্যবসায়ীরা 'নীল রঙ ব্যবহার' বন্ধ করতে পারলোনা। নীল-এর রঙ ব্যবহার করে হলাণ্ড বেলজিয়মের বস্ত্র ব্যবসায়ীরা ফুলে ফেঁপে উঠলো। স্বভাবতই উৎকৃষ্ট নীলের দেশ ভারতের দিকে ইউরোপীয় বস্ত্র ব্যবসায়ীদের শ্যেণ দৃষ্টি পড়লো।

ভারতবর্ষে বিশেষত বাংলা দেশে নীলচাষ অগ্রগতির আর একটি বিশেষ কারণ—অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত ইংলণ্ডে কার্পাস শিল্প একরকম ছিল না বললেই চলে। বস্ত্রশিল্পের মধ্যে প্রধান ছিল পশম শিল্প। শিল্প বিপ্লবের ফলে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কার্পাস শিল্পের অগ্রগতি ঘটে। ভারতের ঐশ্বর্য লুণ্ঠন ও বস্ত্রশিল্প ধংস করে গড়ে উঠেছে ইংলণ্ডের শিল্পের অগ্রগতি। স্বভাবতই পৃথিবীর সেরা নীলচাষের জন্য ইংলণ্ডীয় বণিক ও শিল্পপতিদের দুর্বার লোভ জেগেছে। কাঁচামাল সরবরাহের জন্য ভারতবর্ষ তথা বাংলাদেশ তাদের সেই লাভ ও লোভের উপযুক্ত কর্ষণভূমিতে পরিণত হলো। সে সময়ের কোম্পানীর ডিরেক্টররা লিখেছিল: নীলের অর্থনৈতিক দিক ছাড়াও রাজনৈতিক দিক আছে। নীলের জন্য ইংলণ্ডের ধনিক-বণিককে প্রচুর টাকা দিতে হচ্ছে ওলন্দাজ ও অন্যান্য ইউরোপীয় দেশকে। তার চেয়ে যদি বাংলা দেশের জমিতে নেটিভদের পরিশ্রমে নীলের মত মূল্যবান ও ইংলণ্ডের বস্ত্রশিল্পের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় রপ্তানীযোগ্য দ্রব্যটি প্রস্তুত করা হয় তাহলে কোম্পানীর রাজস্বের অনেক মূল্য বেড়ে যাবে। অতএব কোম্পানীর কর্মচারীরা যদি টাকার পরিবর্তে 'নীল' পাঠায় তবে টাকা পাঠানোরই সামিল (অধিক) হবে।

বাংলা দেশে নীলচাষ প্রবর্তনের আগে নীল ব্যবসায়ী ইংরেজরা আগ্রা, দিল্লী, পাঞ্জাব থেকে নীল খরিদ করতো। এসব অঞ্চল তখনও স্বাধীন ছিল। উত্তরভারত জয় করবার ব্যাপারে নীলকররা ইংরেজ সরকারকে প্রভূত সাহায্য করেছে। নীলের ব্যবসার লভ্যাংশেই গড়ে তোলা বিরাট সৈন্যবাহিনী এসব প্রদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে

এসব অঞ্চলকে পরাভূত করেছে। এ সৈন্যরাও এদেশেরই মানুষ কিন্তু এদেশেরই অর্থে পেশাদারী বাঁতাকলে পড়ে ইংরেজের পক্ষে যুদ্ধ করেছে।

১৭৭৯ সালে বাংলা দেশে নীল ব্যবসার অনুমতি পেল কোম্পানী কর্মচারীরা। ১৮১০ সালে লর্ড মিণ্টোর অনুমতিতে গ্রাম বাংলার অভ্যন্তরে কর্মচারীদের নীলচাষের ক্ষমতালাভ, ১৮২৩ সালের ষষ্ঠ আইনের বদৌলতে নীল দাদনের সুযোগ ও জমির উপর নীলকর-দের স্বত্ব ও অধিকার লাভ, ১৮৩০ সালে পঞ্চম আইনের সুযোগে দাদন নিয়ে নীল-চাষ না করলে রায়তদের ফৌজদারী আইনে দণ্ডিত করার বিধান, ১৮৩৩ এর নতুন সনদ ও ১৮৩৫ এ জমিদারী ক্রয় করবার অধিকার লাভের ফলে ( এবং মফস্বল আদালতে ইংরেজজাতি নীলকরদের বিচার করার অধিকার না থাকায় ) নীলকররা পর্যায়ক্রমে সুযোগগুলির অবাধ ব্যবহার করেছে এবং আইনের দণ্ড থেকে সব রকম ভাবে মুক্ত থাকার স্বর্ণ সুযোগে নিষ্ঠুর আচরণ, কৌশল, নির্যাতন ও উৎপীড়ন দ্বারা বাংলা দেশের চব্বিশপরগণা, নদীয়া, যশোহর, পাবনা, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি জেলায় নীল ব্যবসা ও জমিদারী গড়ে তুলেছে। তাদের ব্যক্তিগত অর্থ লিপ্সা ও আনুসঙ্গিক মত্ততার শিকার হয়েছে নিম্ন মধ্য বর্গের বাঙালী কৃষকরা। নীলকরদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সাহায্য করেছে ইংরেজ রাজকর্মচারী---কিন্তু বাংলার কৃষককে সাহায্য করবার জন্য বাঙালী জমিদাররাও কম সহানুভূতি বা উদারতা দেখায়নি। সে সময় ধনলক্ষ্মীর মহিমা হিসাবে ইংলণ্ডের শিল্পগুলি গড়ে উঠছে উদ্ধত শির হয়ে, দিবারাত্র সূর্যালোকিত ব্রিটিশ রাজত্বের মহামহিম বৈভব দেখে সমগ্র পৃথিবী যখন স্তম্ভিত তখন ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পরে অন্ততঃ আটবার ছোটখাটো মন্বন্তরের কবলে পতিত মৃত্যুপথযাত্রী ১৮৬০ সালে মৃত্যু শপথ, সংগ্রামে ঐক্যবদ্ধ পঞ্চাশ লক্ষ গ্রাম বাঙালীরা মরিয়া হয়ে উঠেছে। নীলদর্পণ নাটকখানি সেই সংগ্রাম সচেতনতার একটি ঐতিহাসিক দলিল।

নীলকররা নীলচাষী ( রায়ত )-দের দিন মজুরীতে নীল চাষ করাতোনা। হিসাব করে নীলকররা দেখেছিল দিন মজুরীতে নীলচাষ করালে প্রতি এক হাজার বিঘার খরচা হবে পঁচিশ হাজার টাকা। অথচ জোর করে দাদন দিয়ে কৃষকের সেরা জমিতে কৃষকের পরিশ্রম ও খরচে নীলচাষ করালে প্রতি হাজার বিঘায় খরচ হবে মাত্র দুহাজার টাকা। অর্থাৎ দুহাজার টাকা দাদন দিলে একহাজার বিঘা জমিতে নীলচাষ করানো যাবে। খৃষ্টীয় তৃতীয় চতুর্থ শতাব্দীর রোমান সম্রাটদের মত দাসপ্রথা রহিত করে ভূমিদাস প্রথার উত্তম-পন্থার মত নীলকর বণিকেরাও ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী কৃষকদের ভূমিদাসে পরিণত করেছিল। এ দাসকে কিনতে হয় না, পাহারা দিতে হয় না, একবেলাও খেতে দিতে হয় না, জমি কিনতে হয় না---শুধু বিঘা প্রতি দুটাকা

হারে দাদন দিলেই নীলচাষ করাতে বাধ্য করা যায়। আর সরকারী আইন, সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা ও সরকারী কর্মচারীর সহযোগিতা তো নীলকরদের পক্ষেই ছিল।

১৮৬০ সালের নীলচাষী বিদ্রোহের ভয়াবহতা উপলব্ধি করে ছোট লাট জে. পি. গ্রাণ্টের নির্দেশে বাংলা সরকারের সেক্রেটারী সিটনকারের নেতৃত্বে একটি নীল চাষ কমিশন নিযুক্ত হয়। কমিশন না হলে গণ বিদ্রোহ ভয়ংকর আকার ধারণ করতে পারতো। বড়লাট লর্ড ক্যানিং আতংকিত হয়ে সে সময় বিলেতে লিখেছিলেন: "গত এক সপ্তাহ ধরে এমন দুশ্চিন্তার মধ্যে কাটিয়েছি যে এমন দুশ্চিন্তা দিল্লী ঘটনার (১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহ) সময়ও হয়নি। যদি এসময় কোন নির্বোধ নীলকর আতংকে বা ক্রোধে একটিও বন্দুকের গুলি খরচ করতো তাহলে বাংলার প্রতিটি নীলকুঠি (নীলচাষীদের) আগুনে ভস্মীভূত হয়ে যেত।"

নীলকমিশনের তথ্য ও রিপোর্ট থেকেই সে সময়ের বাংলার নীলচাষীদের ক্ষতির পরিমাণের একটি নমুনা নিচে উল্লেখ করা যাচ্ছে:—

॥ ১৮৫৮ সালে ॥

| যদি একবিঘা জমিতে তামাক চাষ হতো | | যদি একবিঘা জমিতে নীল চাষ হতো | |
|---|---|---|---|
| তবে খরচ হতো:— | ২৪·০০ টা: | তবে খরচ হতো:— | ৬·১৯ |
| খাজনা, লাঙ্গল, নিড়ান, সার ও অন্যান্য বাবদ | | খাজনা, লাঙ্গল, সার, বীজ, নিড়ান, গাছকাটা বাবদ | |
| তামাক উৎপন্ন হতো— | ৩½ মণ | নীল উৎপন্ন হতো | ১০ বাণ্ডিল |
| দাম ১৮·০০ × ৩½ = ৬৩·০০ টাকা | | ১·০০ টাকা ৪/৫ বাণ্ডিল হিসাবে দাম— | ২·৫০ |
| চাষীর লাভ হতো— | ৩৯·০০ টাকা | চাষীর ক্ষতি হতো | ৩·৬৯ |

তাহলে দেখা যাচ্ছে প্রতি বিঘায় প্রায় পৌনে চারটাকা ক্ষতি দিয়ে সে সময় বাধ্যতামূলকভাবে চাষীকে নীল চাষ করতে হতো।

হিসাবে দেখা গেছে প্রতি ত্রিশটাকার নীল বিক্রয়ে চাষী পেত মাত্র পাঁচ টাকা আর নীলকর পেত পঁচিশ টাকা। বিনা অর্থে বিনা পরিশ্রমে নীলকররা পাঁচগুণ বেশী

টাকা নিয়ে নিজেরাও যেমন দিনদিন ফুলে-ফেঁপে উঠেছে সে সংগে জমির আসল মালিক নীলচাষী দিনকেদিন দরিদ্র হয়েছে। এ হিসাবের ব্যতিক্রম হলেই নীলচাষীদের 'লারমুর' উদ্ভাবিত শ্যামচাঁদে ( চামড়ায় তৈরী চাবুক ) দোরস্ত করা হতো। চাষীদের বাড়ীঘরে আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া হতো, অন্ধকার কুঠিতে অনাহারে হত্যা করা হতো।

জনৈক ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট বলেছেন : এমন একটা বাক্স নীল বাংলা থেকে ইংলণ্ডে পৌঁছায়না যা মানুষের রক্তে রঞ্জিত নয়।

এক সময়ের দুর্বৃত্ত ও ভাগ্যান্বেষী কপর্দকশূন্য ফরলং, লারমুর, আর্চিবল্ড হিলস প্রমুখের যশোহর জেলার ইছামতী তীরের মোল্লাহাটি ( মুলনাথ ) নীলকুঠি কালক্রমে এমনই ঐশ্বর্যশালী ও পরাক্রমশালী হয়ে উঠেছিল যে একে ব্রিটিশ সরকারের রাজত্বে আর একটি রাজ্য হিসাবে বর্ণনা করা যেতে পারতো :---

> কুঠির প্রাচীর ঘেরা প্রকাণ্ড বাগানে হরিণ চরত ; ৫৯৫ টি গ্রামের জমিদারী ছিল মোল্লাহাটি নীলকরদের। কুঠির ঘরবাড়ির মূল্যই ছিল সে যুগে পঞ্চাশলক্ষ টাকা। মূল কুঠির অধীনে যশোহর, চব্বিশ পরগণা নদীয়াতে সতেরটি কুঠি ছিল। এতে প্রায় দুইলক্ষ লোক কাজ করতো। এরা সরকারকে শুধু খাজনাই দিত তিনলক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা।

এর থেকে সহজেই অনুমান করা যায় কোম্পানীর কর্মচারীরা নীলচাষীদের বিরুদ্ধে এত নিষ্ঠুর এবং নীলচাষীদের প্রতি সামান্য সহানুভূতিশীল সরকারী কর্মচারীদের বিরুদ্ধে এত উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল কেন।

নীলকরদের-অত্যাচার দর্পণ হিসাবে নীলদর্পণই একমাত্র সাহিত্য দলিল নয়। ইতিপূর্বে ও পরে নীলচাষের দুর্দশার চিত্র এঁকেছে উনবিংশ শতাব্দীর পত্রিকাগুলি :

(ক) সমাচার দর্পণ---জে. সি. মার্শম্যান (১৮১৮) সম্পাদিত
(খ) বঙ্গদূত--- নীলরত্ন হালদার (১৮২৯) সম্পাদিত
(গ) তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা---অক্ষয়কুমার দত্ত (১৮৪০) সম্পাদিত
(ঘ) হিন্দু পেট্রিয়ট---হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১৮৫৫) সম্পাদিত
(ঙ) সংবাদ কৌমুদী---রাম মোহন রায় (১৮২১) সম্পাদিত

নীলচাষীদের দুর্ভোগের চিত্র তুলে ধরেছে :--

(ক) বাপরে বাপ নীলকরের কি অত্যাচার — উমাচরণ দে (১৮৫৬)
(খ) আলালের ঘরের দুলাল--- — প্যারীচাঁদ মিত্র (১৮৫৭)

(গ) হুতোম প্যাঁচার নক্সা-- কালীপ্রসন্ন সিংহ (১৮৬২)
(ঘ) উদাসীন পথিকের মনের কথা— মীর মশাররফ হোসেন (১৮৯০)
(ঙ) যশোহর খুলনার ইতিহাস সতীশচন্দ্র মিত্র
(চ) রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ শিবনাথ শাস্ত্রী (১৮৯৭)
(ছ) ইছামতী-- বিভূতিভূষণ বন্দোপাধ্যায়

তাছাড়া সে সময় শিশিরকুমারঘোষ গ্রামাঞ্চলে নীলকর অত্যাচার বিষয়ক তথ্য সংগ্রহ করে হিন্দু পেট্রিয়টে পাঠাতেন। কাঙাল হরিনাথ এবং ঈশ্বরগুপ্ত নীলকর অত্যাচার বর্ণনা করে গান ও কবিতা রচনা করেছেন। হিন্দু পেট্রিয়টের সম্পাদক হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় নীলকর অত্যাচার নিরোধে জীবনপণ সংগ্রামে প্রাণ উৎসর্গ করেছেন। তাঁর পত্রিকাটিই সে সময় নীল আন্দোলনের শ্রেষ্ঠ মুখপত্র ছিল। আর্চিবল্ড হিলসের হরমণি অপহরণ ঘটনাটি তাঁর পত্রিকাতে প্রকাশিত হয়। নীলকররা তাঁর বিরুদ্ধে দশ হাজার টাকার মানহানি মামলা করেছিল। মামলা চলাকালীন হরিশের মৃত্যু হলে তাঁর বিধবাপত্নীকে সে মামলার জন্য ভিটেমাটি বিক্রি করে জরিমানার টাকা দিতে হয়।

১৮৬০ সালের পর থেকেই এবং সরাসরি ব্রিটিশ রাজত্বের অন্তর্ভুক্তির ফলে বাংলার নীলচাষীদের ভাগ্য সামান্য উন্নত হয়েছিল মাত্র। এরপর থেকে বিহার ও মাদ্রাজেও নীলচাষ শুরু হওয়ার ফলে বাংলার চাষীদের উপরে দুর্ভোগ কিছুটা হ্রাস পেয়েছে।

১৮৮০ সালে জার্মান রাসায়নিক আডল্ফ ফন্ বেইয়ার আলকাতরা থেকে রাসায়নিক উপায়ে কৃত্রিম নীল প্রস্তুত করতে সক্ষম হন। ১৯০৫ সালে রাসায়নিক বেইয়ার এবং যক্ষ্মারোগ বীজানু আবিষ্কারক চিকিৎসাবিজ্ঞানী রবার্ট কখ্ যুগ্মভাবে নোবেল পুরস্কারও পেয়েছিলেন। তাঁর আবিষ্কৃত কৃত্রিম নীল ১৮৯২ সালে বাজারে সস্তাদরে চালু হলো। স্বভাবতই বাংলার কৃষিজাত নীলের চাহিদা ক্রমেই কমে গেল।

ইংলণ্ডীয় বণিক ও শিল্পপতিদের হাত থেকে অন্ততঃ নীলচাষের নিপীড়ন থেকে রক্ষা পেল বাংলার চাষী।

## সহায়ক গ্রন্থ


| | | |
|---|---|---|
| ১। | দীনবন্ধু গ্রন্থাবলী (১ম খণ্ড) | সম্পাদনা শ্রী ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রী সজনীকান্ত দাস |
| ২। | দীনবন্ধু রচনা সংগ্রহ | সম্পাদনা মুহম্মদ আব্দুল হাই, ডঃ আনিসুজ্জামান |
| ৩। | দীনবন্ধু মিত্র | শ্রী সুশীল কুমার দে |
| ৪। | বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস | শ্রী ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় |
| ৫। | বঙ্কিম রচনাবলী (২য় খণ্ড) | সাহিত্য সংসদ |
| ৬। | সাহিত্য সাধক চরিতমালা (২য় খণ্ড) | শ্রী ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় |
| ৭। | এরিস্টটলের পোয়েটিকস ও সাহিত্যতত্ত্ব | শ্রী সাধন কুমার ভট্টাচার্য |
| ৮। | সাজঘর | ইন্দ্রজিৎ |
| ৯। | বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (২য় খণ্ড) | ডঃ সুকুমার সেন |
| ১০। | বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত | মুহম্মদ আব্দুল হাই, সৈয়দ আলী আহসান |
| ১১। | বাংলা নাটকের ইতিহাস | অজিতকুমার ঘোষ |
| ১২। | বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস (১ম খণ্ড) | ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য |
| ১৩। | ১৮৫৭ ও বাংলা দেশ | সুকুমার মিত্র |
| ১৪। | নীলবিদ্রোহ ও বাঙালী সমাজ | প্রমোদ সেনগুপ্ত |
| ১৫। | আলালের ঘরের দুলাল | প্যারীচাঁদ মিত্র |
| ১৬। | হুতোম প্যাঁচার নক্সা | কালীপ্রসন্ন সিংহ |
| ১৭। | বাঙলা একাডেমী পত্রিকা | ৮ম বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা, ১৩৭১ সাল |
| ১৮। | মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত | যোগীন্দ্রনাথ বসু |
| ১৯। | রামনারায়ণ তর্করত্ন | শ্রী ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় |
| ২০। | বিশ্বকোষ (অষ্টম ভাগ) | নগেন্দ্রবসু সংকলিত |
| ২১। | রত্নন দ্রব্য | শ্রী দুঃখহরণ চক্রবর্তী |
| ২২। | নূতন বাঙালা অভিধান | আশুতোষ দেব |
| ২৩। | ইছামতী | বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় |
| ২৪। | Plays unpleasant | Bernard Shaw |
| ২৫। | Perspectives on Drama | Edited by James L. Calderwood & Harold E. Toliver |
| ২৬। | The Indian stage (Vol II) | Hamendranath Das Gupta. |

# সুধীন্দ্রনাথ দত্ত-পাঠ

আবুল কাসেম সন্দীপ

'সুধীন্দ্রনাথ ছিলেন বহু ভাষাবিদ্ পণ্ডিত ও মনস্বী, তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণী বুদ্ধির অধিকারী, তথ্যে ও তত্ত্বে আসক্ত, দর্শনে ও সংলগ্ন শাস্ত্রসমূহে বিদ্বান ; তাঁর পঠনের পরিধি ছিলো বিরাট, ও বোধের ক্ষিপ্রতা ছিল অসামান্য। সেই সঙ্গে যাকে বলে কাণ্ডজ্ঞান, সাংসারিক ও সামাজিক সুবুদ্ধি, তাও পূর্ণমাত্রায় ছিল তাঁর, কোনো কর্তব্যে অবহেলা করতেন না, গার্হস্থ্য ধর্ম পালনে অনিন্দনীয় ছিলেন, ছিলেন আলাপদক্ষ রসিক, প্রখর ব্যক্তিত্বশালী, আচরণের পুঙ্খানুপুঙ্খে সচেতন, এবং সর্ববিষয়ে উৎসুক ও মনোযোগী।' ---বুদ্ধদেব বসুর এ মন্তব্য নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে যে সুধীনদত্ত সচেতন, সুপরিকল্পিত প্রয়াস ও উদ্দেশ্যের কবি। নেহাৎ ভাবাবেগে উৎফুল্ল হয়ে তিনি কবিতা লেখেননি। কবিতাকে যাঁরা ঐশ্বরিক দান বলে অনুশীলনমুক্ত হতে চান তাঁদের কাছে সুধীন দত্ত রীতিমত বিদ্রোহ। কারণ 'মাতৃভাষাকে স্ববশে আনবার জন্য ও নিজের কবিত্বশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য, দিনে-দিনে অনলসভাবে অনবরত তিনি 'উদ্যমের ব্যথা' সহ্য করেছিলেন।'

'কবিতা যে শিল্প এবং সে-ক্ষেত্রে অনুশীলনের প্রয়োজন যে আছে' তা তিনি নিজের কবিতার ক্ষেত্রে দেখিয়ে গেলেন যা পরবর্তীদের জন্য একটা আদর্শ হিসাবে বিবেচিত হবে।

শব্দকে তিনি কবিতার মুখ্য উপাদান রূপে গ্রহণ করেছিলেন---ফরাসী প্রতীকী কবি মালার্মের প্রবর্তিত কাব্যাদর্শই ছিল তাঁর অন্বিষ্ট। ফলে তাঁর কবিতার একটা দিক আমাদের কাছে শব্দ প্রয়োগের কারখানার মতো মনে হতে পারে---মনে হতে পারে যে একজন স্বভাব-কবি স্বাভাবিকতাকে পরিহার করে শব্দের ক্রীড়ানুশীলন করছেন। আসলে তিনি ঔৎসুক্যের বশে 'আত্মসমর্পণের নম্রতা নিয়ে' কাব্যানুশীলন করেছেন।

'বুদ্ধির আদেশ শিরোধার্য ক'রে অতি ধীরে সাহিত্যের পথে তিনি অগ্রসর হলেন, অতি সুচিন্তিতভাবে, গভীরতম শ্রদ্ধা ও বিনয়ের সঙ্গে।' কবির সুচিন্তা, শ্রদ্ধা ও বিনয়ের ফসল :

ক, তন্বী : প্রথম সংস্করণ — ১৩৩৭
খ, অর্কেস্ট্রা : প্রথম সংস্করণ — ১৯৩৫
গ, ক্রন্দসী : প্রথম সংস্করণ — ১৩৪৪
ঘ, উত্তরফাল্গুনী : প্রথম সংস্করণ — ১৩৪৭
ঙ, সংবর্ত : প্রথম সংস্করণ — ১৩৬০
চ, প্রতিধ্বনি : প্রথম সংস্করণ — ১৩৬১
ছ, দশমী : প্রথম সংস্করণ — ১৩৬৩

তন্বী গ্রন্থের 'কবি' শীর্ষক কবিতায় তিনি কবির সংজ্ঞা নির্ণয় করেছেন এভাবে :

কেন আমি কাব্য লিখি, জানতে চাহো সেই কথাটাই ?
অতকিছু বলা-কওয়ার আজকে, সখা, সময় যে নাই।
তবু যদি নেহাৎ শুধাও, এইটুকু নয় ব'লে রাখি :
জীবনে যে কাব্য লেখে, জীবন তারে দিল ফাঁকি।

... ... ...

সেই তো বাসী পুষ্প তুলে, চোখের জলে জীইয়ে রাখে ;
স্ববুদ্ধিরে সেই তো বাঁধায় কত্র কথার লক্ষ পাকে।
পাথেয় যার স্মৃতি কেবল, পন্থা যাহার অনাদ্যন্ত,
কবি ব'লে আখ্যা পাবার যোগ্য তো সেই ভাগ্যবন্ত।।

বাংলা কবিতায় আবেগোচ্ছলতার স্থলে আধুনিক মননশীলতা, বুদ্ধির দীপ্তি, মনীষার প্রাখর্য ও যুক্তির দর্শন উপস্থাপনায় সুধীন দত্ত সেই ভাগ্যবন্ত কবি। এ সম্পর্কে শ্রদ্ধেয় সৈয়দ আলী আহসানের বক্তব্য স্মর্তব্য : 'কাব্য রচনায় গভীর নিষ্ঠাবান সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ছিলেন বহু ভাষাবিদ পণ্ডিত, দার্শনিক, তত্ত্বানুসন্ধানী এবং বক্তব্য বিশ্লেষণে অসাধারণ বুদ্ধিমান। অত্যন্ত মনোযোগী শিল্পী হিসেবে, সচেতন অনুভূতির বিবেচনায় তিনি বাংলা কবিতাকে আবেগের উচ্ছলতা থেকে আধুনিক মননশীলতা ও যুক্তির রাজ্যে উপস্থিত করেছিলেন। তিনি তাঁর পাণ্ডিত্য, বুদ্ধি ও ঔৎসুক্য কাব্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছিলেন।'

কবির এই বুদ্ধি, ঔৎসুক ও বিশেষ পাণ্ডিত্য সর্বক্ষেত্রে সমভাবে উচ্চকিত না হলেও 'জগতের অন্যান্য উত্তম কবিদের মতো সুধীন্দ্রনাথও ছিলেন---স্বভাব কবি নন, স্বাভাবিক কবি।' ফলে, 'অধীত জ্ঞান, মনীষিতা, আলাপনৈপুণ্য, অসামান্য

প্রফুল্লতা ও সামাজিক বৈদগ্ধ্য, সম্পাদক ও গোষ্ঠীনায়ক হিসেবে স্মরণীয় কৃতিত্ব তাঁর—এই সবই তাঁর কবিত্বের অনুষঙ্গ, তাঁর কবিতার পক্ষে অনুকূল।'

কবিতায় ধ্বনির বৈচিত্র্য সৃষ্টি ও শব্দের সুশৃঙ্খল বিন্যাসকল্পে তিনি অচলিত সংস্কৃত শব্দের ব্যবহার করে স্বাদ গ্রহণের ক্ষেত্রে কবিতাকে দুরূহ করে তুললেও তাঁর কাব্য দুর্বোধ্য নয়। বরং কুতূহলী পাঠকের কাছে তা অনুসন্ধিৎসার স্পৃহা উদ্দীপক। 'আধুনিক কবিতা এমন কোনো পদার্থ নয় যাকে কোনো একটা চিহ্ন দ্বারা অবিকলভাবে শনাক্ত করা যায়। একে বলা যেতে পারে বিদ্রোহের, প্রতিবাদের কবিতা, সংশয়ের, ক্লান্তির, সন্ধানের, আবার এরই মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে বিস্ময়ের জাগরণ, জীবনের আনন্দ, বিশ্ববিধানে আস্থাবান চিত্তবৃত্তি।' সুধীনদত্তের কবিতাও সর্বত্র এই বক্তব্যান্তর্গতই থেকেছে। এরই মধ্যে থেকেই তা দিয়েছে নতুন স্বাদের আনন্দ—নতুন সৃষ্টির প্রেরণা।

অমিয় চক্রবর্তী, জীবনানন্দ দাশ, সুভাষ মুখোপাধ্যায় ও বিষ্ণু দে প্রমুখ 'কবিরা নতুন সুর এনেছেন আমাদের কাব্যে, রবীন্দ্রনাথের পরে নতুন সুর, রবীন্দ্রনাথের পরে প্রথম নতুন সুর। এঁরা প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র, এবং স্বতন্ত্রভাবে নতুন।' এক্ষেত্রে বহুদর্শী কবি ও বহু প্রস্তুতির কবি সুধীন দত্ত দিয়েছেন আরো নতুন প্রসারতা—নতুন গতিশীলতার অনাবিল আস্বাদ।

সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কাব্য পাঠ ও আলোচনা করলে এ বিষয়টি সুস্পষ্ট হয় যে তাঁর একেকটি কাব্য স্বতন্ত্র কিন্তু সমধর্মী, প্রতিটি কবিতার স্বর আলাদা কিন্তু সুর এক, ভঙ্গী বিচিত্র কিন্তু লক্ষ্য অভিন্ন। নীতি ধর্মের প্রতি অপরিসীম অবহেলায়, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের মহিমায় উচ্চারিত কবিতা আত্মকেন্দ্রিকতায় অন্ধ, বিচ্ছেদের যন্ত্রণায়, মিলন-স্মৃতির বেদনায় কখনো উচ্চকণ্ঠ, কখনো হতাশায় মগ্ন কবির জীবন—তাঁর ভাবনার স্বপ্ন। অসম্ভব শূন্যতাবোধ ও অসহায়তার মধ্যে কবি বলছেন :

> অসম্ভব প্রিয়তমে, অসম্ভব শাশ্বত স্মরণ
> অসংগত চিরপ্রেম, সংবরণ অসাধ্য অন্যায় ;
> বদ্ধদ্বার অন্ধকারে প্রেমের সন্তপ্ত সঞ্চরণ
> সাঙ্গ করে ভাগীরথী অকস্মাৎ বসন্ত বন্যায় ।।

অনির্দেশ্যের অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দিহান কবি নিঃসঙ্কোচে ব্যক্ত করছেন :

> মোদের ক্ষণিক প্রেম স্থান পাবে ক্ষণিকের গানে,
> স্থান পাবে, হে ক্ষণিকা, শ্লথনীবি যৌবন তোমার :
> বক্ষের যুগল স্বর্গে ক্ষণতরে দিলে অধিকার ;
> আজি আর ফিরিব না শাশ্বতের নিষ্ফল সন্ধানে ।।

অবক্ষয়, দ্বন্দ্ব, সংশয় মানুষের মনে ও চিত্তে যে হাহাকার সৃষ্টি করে 'উটপাখী' কবিতায় তারই স্বীকৃতি :

আমি জানি এই ধ্বংসের দায়ভাগে
আমরা দুজনে সমান অংশীদার ;
অপরে পাওনা আদায় করেছে আগে,
আমাদের 'পরে দেনা শোধবার ভার।

'সংবর্তের' 'কাস্তে' কবিতায় কবির বক্তব্য আরো সুস্পষ্ট :

আকাশে উঠেছে কাস্তের মতো চাঁদ,
এ-যুগের চাঁদ কাস্তে।
বিপ্রলব্ধ প্রেতের আর্তনাদ
মানা করে ভালোবাসতে।
সংগমে মিছে খুঁজে মরি নিরাপত্তা ;
ক্রমাগত ঋণে ন্যস্ত আমার সত্তা ;
আসে সে-বেতাল, তুমি যার বাগ্‌দত্তা,
দন্তিল হাসি হাসতে।
চৈতী ফসলে পতিত শস্যের স্বাদ ;
এ-যুগের চাঁদ কাস্তে ॥

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনারীতিকে সচেতনভাবে গ্রহণ করে তাকে অতিক্রম করেছেন, এবং বক্তব্য উপস্থাপনায় সম্পূর্ণ নতুন সুরের প্রতিষ্ঠা করেছেন।

শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে অন্বিষ্ট, অভিধা, ঐতিহ্য, প্রমা, প্রতিভাস, অবৈকল্য, ব্যক্তিস্বরূপ, বহিরাশ্রয়, কলাকৈবল্য ও ধ্রুপদী প্রভৃতি শব্দের প্রচলন ও উদ্ভাবনার কৃতিত্ব তাঁরই। তাঁর কবিতার গঠন সুঠাম, সুসংবদ্ধ ও যুক্তিনিষ্ঠ, তাঁর বাক্যবিন্যাস সুমিত, পংক্তিসমূহের পারম্পর্য নির্বিকার এবং শব্দ প্রয়োগ যথার্থ। বুদ্ধদেব বসু বলেছেন '...শব্দ-রচনার দ্বারা, বাংলা ভাষার সম্পদ ও সম্ভাবনাকে তিনি কতদূর বাড়িয়ে দিয়েছেন, তা হয়তো না-বললেও চলে'। পরিশেষে তাঁর সম্পর্কে এইরূপ মন্তব্য করা যায় যে 'আধুনিক বাংলার ও আধুনিক যুগের একজন শ্রেষ্ঠ কবি তিনি।'

---


প্রসঙ্গ-গ্রন্থ :

১। সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কাব্য সংগ্রহ (প্রথম সংস্করণ)

২। আধুনিক বাংলা কবিতা (বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত, ৪র্থ সংস্করণ)

৩। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত---আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান।

| পৃষ্ঠা | লাইন | যা আছে | যা হবে |
|---|---|---|---|
| ৫ | ২২ | ছুটিতে | ছুটিছে |
| ৬ | ১৮ | বর্ণিত যাত্রার | বর্ণিত জীবন যাত্রার |
| ১৫ | ৬ | ১৯১২ | ১৯২২ |
| ২০ | ১৪ | sosostrics | Sosostris |
| ২১ | ১ | দয়বুম, | দয়াস্থ্যাম, |
| ২১ | ১৫ | নিরালবতার | নিরালম্বতার |
| ২২ | ২৬ | কবিকীতি | কবিকীতি। |
| ২৩ | ১৫ | কপার | কথার |
| ২৪ | ১১ | ধমিষ্ট | ধমিষ্ঠ |
| ২৫ | ১৬ | সত্য | সত্যই |
| ২৬ | ৬ | পুর্ণ, তৃষ্ণার | পুর্ণতৃষ্ণার |
| ৩০ | ৬ | ধরা পড়ে | ধরা পড়ে। |
| ৩০ | ৯ | বিবাদমান | বিবদমান |
| ৩১ | ৫ | চতুস্পার্শ | চতুষ্পার্শ |
| ৩৩ | ১০ | নীরিক্ষণ | নিরীক্ষণ |
| ৩৪ | ১২ | লাইফ | নাটক |
| ৩৪ | ১৩ | লাইফ | নাটক |
| ৪০ | ২১ | ১৯৮৯ | ১৮৮৯ |
| ৫১ | ১৮ | কিছু | কিছুতেই |
| ৫৬ | ১৪ | BLACK IS WHITE | BLACK IS WHITE |
| ৫৭ | ৮ | নিশ্চিয়তা | নিশ্চয়তা |
| ৫৯ | ২৩ | প্রচেষ্টা | প্রচেষ্টা। |
| ৭২ | ৫ | আমার | আমরা |
| ৭৮ | ১৩ | অস্বিত্ব | অস্তিত্ব |
| ৭৯ | ৪ | সক্ষিপ্ত | সংক্ষিপ্ত |
| ৮১ | ২১ | সংস্কৃতি, | সংস্কৃত, |
| ৮৮ | ৭ | বাধ্যর্কের | বার্ধক্যের |
| ১১০ | ২০ | ১৮৭৩ | ১৮৩৭ |
| ১১৬ | ২৭ | প্রশ্যস্তি | প্রশস্তি |
| ১২২ | ১৮ | ভদ্রেতর | ভদ্রতর |
| ১২৩ | ২৯ | ম খখানি | মুখখানিতে |

সালাম, রফিকউদ্দিন, জব্বার
কি বিষণ্ণ থোকা থোকা নাম;
এই এক সারি নাম বর্শার তীক্ষ্ণ ফলার মতো
এখন হৃদয়কে হানে।

যাঁরা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দিতে শহীদ হয়েছেন
এবং যাঁরা এখনও বাংলাভাষা ও সাহিত্যকে অগ্রবর্তী
করবার জন্য দিবারাত্রি সাধনা করছেন তাঁদের প্রতি
আমাদের সশ্রদ্ধ অভিনন্দন।

*PRODUCING*

**WINDOW,**
**SHEET & PLATE GLASS**
**ICE FIOWERED GLASS**
**MUSSALIN GLASS**
**TAKING UP PRODUCTION OF "MIROR" GLASS**

# USMANIA GLASS SHEET FACTORY LTD.

*Head Office :*
27, Sadarghat Road,
CHITTAGONG
Phone : 86831 & 86832

*Factory :*
Kalurghat Industrial Area
CHITTAGONG
Phone : 84551 & 86109

---

*With best compliment*

*from*

# Babu Oil Mills Ltd.

**365, Strand Road,**
**CHITTAGONG**

ফোন : ঢাকা: ১৫১৪২৮ ॥ চট্টগ্রাম: ৮৮৫৭৩৪৮১৫৮
এডভারটাইজার্স

বেবিটোন
শিশুদের পেটের পীড়ায়
সেরা ঔষধ

মায়ের দেওয়া মুখের ভাষাকে প্রতিষ্ঠিত করতে যারা বুকের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত করলো একুশের সেই মহান শহীদদের স্মরণ করছি।



---

মায়ের দেওয়া যে মুখের ভাষায় আমরা আমাদের আনন্দ-বেদনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে থাকি জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সেই ভাষারই প্রতিষ্ঠার জন্য অনলস সংগ্রাম মুখর যে তরুণ সমাজ তাদেরই জানাচ্ছি আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন।

## প্রকাশিত এবং প্রকাশের পথে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বই

### আবদার রশীদ
লঘুমেঘ
নানান রঙ্গ
ত্রিধা
দরবেশ
তেরেসা
বিশ্বনাগরিক
এক নায়ে তিনজন

### হাসনা বেগম
মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্যে মুসলমান

### মমতাজউদ্দীন আহমেদ
কপালকুণ্ডলা (সম্পাদিত)
নীলদর্পণ ( ,, )
জানালায় দ্বিচারিনী
রীতিমত নবাব
আন্তন চেখভের পাঁচটি একাংকিকা
কোকিল প্রভৃতি অন্যান্য
রহমান মাষ্টার কতিপয় শেয়াল

### চৌধুরী জহুরুল হক
চোঙ্গাগল্প

### আলাউদ্দীন আল আজাদ
শিল্পীর সাধনা
ক্ষুধা ও আশা
শীতের শেষ রাত বসন্তের প্রথম দিন
মায়াবী প্রহর
মরক্কোর যাদুকর
ধন্যবাদ
যখন সৈকত
ধানকন্যা
মৃগনাভি
কর্ণফুলী
তেইশ নম্বর তৈল চিত্র
অন্ধকার সিঁড়ি
মানচিত্র
সূর্য জ্বালার সোপান
ভোরের নদীর মোহনায় জাগরণ

### মনিরুজ্জামান
ভাষা সাহিত্য ও অন্যান্য প্রসঙ্গ
নূরজাহান ও সা'জাহান (সম্পাদিত)
পরম্পরা

### আ. ফ. ম. সিরাজউদ্দউলা চৌধুরী
কখনো কান্না
রূপরঙ্গ (সম্পাদিত)

'মোদের গরব মোদের আশা
আ'মরি বাংলা ভাষা'